বুদ্ধদেব গুহ

কিশোর সাহিত্য

বুদ্ধদেব গুহ

কিশোর সাহিত্য

বুদ্ধদেব গুহ

কিশোর সাহিত্য

সম্পাদনা

অশোককুমার মিত্র

শিশু সাহিত্য সংসদ

Buddhadev Guha : Kishor Sahitya
(Selected Works of Buddhadev Guha)
ed. Ashokekumar Mitra

ISBN : 978-81-7955-142-4

©পাঠ্যবস্তু : লেখক
পুস্তকসজ্জা ও অলংকরণ : প্রকাশক

পপ্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

অলংকরণ : চন্দন বসু

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নটরাজ অফসেট
১, নিরঞ্জন পল্লি, তেঁতুল তলা
কলকাতা-৭০০ ১৩৬

সূচি

প্রকাশকের কথা
সম্পাদকের কথা

গল্প
ঋজুদার সঙ্গে অচানক মার-এ
ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গিবনে
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলমহলে
ঋজুদার সঙ্গে সিমলিপালে
ডিমেংকারি
লাওয়ালঙের বাঘ
করণপুরার টাঁড়
সাধের গাডোয়াল
গিদাইয়া
অশান্ডিমারুর দূত
যব খলিল খাঁ ফাকতা উড়াতে থে
ম্যাথস
আমি

উপন্যাস
গুগুনোগুম্বারের দেশে

প্রকাশকের কথা

শিশু সাহিত্য সংসদের বয়স হল তিন কুড়ি। ছড়ায়-পড়ায়, গদ্যে-পদ্যে, জ্ঞানে-মনোরঞ্জনে এতখানি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুনির্মল বসু, সুখলতা রাও সেই থেকে আজও আছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যের সে ভাঁড়ারে আজও জোগান দিচ্ছেন। এ ছাড়া এখন যাঁরা দিয়ে চলেছেন : ছোটোদের জন্য গৌরী ধর্মপাল, শৈলেন ঘোষ ও বলরাম বসাক, ছড়া-কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শঙ্খ ঘোষ, কিশোর সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেবসেন এবং সদ্যপ্রয়াত মতি নন্দী। শিশু সাহিত্য সংসদের হীরকজয়ন্তী উদযাপন এঁদের নিয়েই, যাঁরা দিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই স্ব-নির্বাচিত লেখার সংকলন নিয়ে। জয়ন্তী উদযাপনের এর চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে!

এ প্রসঙ্গে শ্রীঅশোককুমার মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ। তিনিই অক্লান্ত পরিশ্রমে লেখা জোগাড় থেকে সম্মতি সংগ্রহ পর্যন্ত সব কাজ করে সংকলনগুলিকে সম্ভব করে তুলেছেন। তাঁর উৎসাহের তুলনা নেই। সর্বোপরি তাঁর যোগ্য সম্পাদনাতে সংকলনগুলি আশা করি পাঠকদের মনের মতো হয়ে উঠতে পেরেছে।

গুগুনোগুম্বারের দেশে লেখাটি প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য আনন্দ পাবলিশার্স-এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কলকাতা দেবজ্যোতি দত্ত

ডিসেম্বর ২০১০

সম্পাদকের কথা

ইংরেজিতে ছোটোদের জন্য রংচঙে কত বাহারি বই, বিদেশি ভাষাতেও। বাংলায় তো তেমন একখানি বই-ও নেই। কেন? বাংলায় কি তেমন লেখক নেই, তেমন ছবি-আঁকিয়ে নেই? এমনই ভাবনা জেগেছিল এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর মনে। এতদিন তো জীবন কেটেছে বিদেশি নাগপাশ ছেঁড়ার লড়াইয়ে। সদ্যস্বাধীন দেশে ছোটোদের জন্য আনন্দ আর শিক্ষাদানের বই প্রকাশে উদ্যোগী স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশ করলেন ছড়ার ছবি-১। পুরোনো দিনের ছড়ায় ছবি আঁকলেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৯ সালে বেরোল চার রঙে ছাপা ছোটোদের মন-কাড়া বড়ো মাপের সেই বই, যা এতকাল তিনি চেয়ে এসেছিলেন। পরের বছরে বেরোল ছড়ার ছবি-২ আর ছড়া-ছবিতে অ আ ক খ। আর তখনই ঠিক হল স্থায়ী প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা। ১৯৫১-র ১ আগস্ট জন্ম নিল নতুন ধারার প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান, ছোটোদের সাহিত্যের জন্য 'শিশু সাহিত্য সংসদ' আর বড়োদের বইয়ের জন্য 'সাহিত্য সংসদ'। এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য শুধু মুদ্রণ সৌকর্যেই নয়, বিষয় নির্বাচনেও। প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থের পিছনে থাকে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, নিখুঁত সম্পাদনা ও অনুপম প্রকাশনা। শুরু থেকে প্রকাশনা মানের যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ, তাকে আজ এই হীরকজয়ন্তী বর্ষেও ধরে রেখে উন্নত করার সাধনায় ব্রতী রয়েছেন তাঁর উত্তরসূরীগণ। এখন বিষয় নির্বাচনে তারা অতি সতর্ক, নিত্য উদ্ভাবক। প্রকাশন সৌষ্ঠবে দরদি ও নিপুণ।

বন, বন্যপ্রকৃতি, বুনো জানোয়ার, বনের মানুষ এবং শিকার নিয়ে সাহিত্য রচনায় বুদ্ধদেব গুহ নিশ্চয়ই বাংলায় প্রথম কলম হাতে তুলে নেননি, তবু বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এই আঙিনায় নিঃসন্দেহে তিনিই প্রধান। বড়োদের সাহিত্যে যেমন, ছোটোদের সাহিত্যে তেমনি। শুধুমাত্র সংখ্যার বিচারেই নয়, গুণগত মানেও। ঋজুদা, রুদ্র, ভটকাই-কিশোর পাঠকদের কাছে বড়ো পরিচিত নাম।

বুদ্ধদেবের কলমের বিশেষ গুণ যে, তা শুধু বন-পাহাড়ের নিখুঁত ছবি-ই আঁকে না, তাঁর কলমে বন্যপ্রকৃতি, জন্তুজানোয়ার, মানুষ, গাছপালা সম্পর্কে গভীর দরদ ঝরে পড়ে। তা, সে দেশের বনাঞ্চল হোক বা বিদেশের বন-পাহাড়। সতেরো বছর বয়সে শিশুসাথীতে যে শিকার-কাহিনি লিখেছিলেন বনকে চেনাবার সঙ্গে মানুষকে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

যেমন আফ্রিকায় গুগনোগুম্বারের দেশে এসে সাভানা ঘাসের জঙ্গলে পথ হারাল ঋজুদার দল। যদিও গাড়িতে হাজার মাইল চলার মতো তেল রয়েছে, তবু তেরো হাজার বর্গমাইলের সেই ঘাসবনে ওই রসদ অপ্রতুল। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটির ডাকে ঋজুদা গিয়েছিলেন সেরেঙ্গেটির ঘাসবন ও গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে যেসব চোরাশিকারি আছে সে সম্পর্কে তদন্ত করে একটি রিপোর্ট তৈরি করার কাজে। এ সফরে ঋজুদার সঙ্গে শুধুই রুদ্র। ব্যবস্থাপনা ঠিকই ছিল, তবু গোলমালটা শুরু হল প্রায় প্রথম পর্বেই। ক-দিনে ঘাসবনে আড়াই হাজার মাইল গাড়ি চালিয়ে এসে হঠাৎই বোঝা গেল-'আমরা। পথ। হারিয়েছি।' পথ হারানোর জন্য দায়ী গাইড ভুষুণ্ডা, যে পায়ে হেঁটে মাসের পর মাস ঘাসবনে কাটিয়েছে। নিজের হাতের রেখার মতো এ অঞ্চল তার চেনা। তবু সে পথ হারাল, তারপরে কত কাণ্ড। লোভ-হিংসার চক্রান্তে প্রতি পদক্ষেপে রোমাঞ্চ, প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা।

ঋজুদা, বুদ্ধদেব গুহের প্রিয় চরিত্র বলে তার কাহিনিই এই সংকলনের অনেকখানি বটে, কিন্তু সব নয়। বুদ্ধদেব চমৎকার সামাজিক গল্প-লেখেন, কৌতুক রসের গল্প- লেখেন-অবশ্য ঋজুদার কাহিনিতে তার অজস্র পরিচয় রয়েছে। যব খলিল খাঁ ফাকতা উড়াতে থে একেবারে অন্য জাতের গল্প-যেখানে রাইফেল নেই, জিপের ঝনাৎকার নেই, বনের শিরশিরানি নেই। এমনি আরও কিছু গল্পও রইল। তবে বনজঙ্গল শিকার আর বনের মানুষই লেখকের মনের মানুষ-তাদের ভাগটাই বেশি রইল। বুদ্ধদেব গুহের কিশোর সাহিত্য নিশ্চয়ই ছোটোদের হাতে একটি প্রিয় উপহার।

কলকাতা ৭০০ ১০৬ অশোককুমার মিত্র

ডিসেম্বর ২০১০

সমাপ্ত

ঋজুদার সঙ্গে অচানক মার-এ

১

বেলা যদিও হয়েছে, আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার পুবে একটি পাহাড় ছিল। সেটি ডিঙিয়ে আসতে সূর্যের সময় লাগল প্রায় ঘণ্টা খানেক। আমরা বাংলো থেকে অনেকক্ষণ হলই বেরিয়েছি। সূর্যটা সবে উঠছে পাহাড়ের ওপাশে। তখনও এই অচানক মার-এ শীত শীত ভাব আছে এই মার্চ মাসের মাঝামাঝিতেও।

কলকাতার মানুষমাত্রই শীতকাতুরে। শীত বলতেও সেখানে মাত্র দেড়-দু-মাস। তাও তাকে শীত বললে উত্তর ও মধ্যভারতের এমনকী বিহার, ওড়িশা, অসমের মানুষেরাও হাসেন।

কাল সন্ধ্যে বেলাতেই আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি।

আমরা মানে, ঋজুদা, আমি আর ভটকাই। তিন জনে দাঁড়িয়েছিলাম একটা টিলার উপরে, অচানক মার বনবাংলো থেকে মাইল দুয়েক উত্তরে। সামনে দিয়ে দুধলি সাপের মতন এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটি পাহাড়ি নদী। তার বুকের নুড়িময় সাদা বুকে অতি ধীরে ধীরে পাহাড় টপকানো সূর্যর কমলারঙা আভা লাগছে, যেমন করে স্থলপদ্মর পাপড়িতে সকালে লালের ছোপ লাগে। এমন ধীরে, যে বোঝা পর্যন্ত যায় না।

রোদ আরও জোর হলে সেই কমলা ভাবটি কেটে যাবে। দুধলি অস্পষ্টতা মুছে গিয়ে নদীর জল সাদা হবে, বালির রং গেরুয়া, পাথরের কালো। তখনও রাতের শিশিরে বনজঙ্গল, দূরের ঝিকারপানির পাহাড় সব ভিজে আছে। এই বসন্তের ভোরের বন পাহাড় নদীর এক আশ্চর্য গন্ধ ও মোহ আছে, মুগ্ধতাও।

তিতির, বাটর ও ছাতারে ডাকছে চারধার থেকে। টিয়া আর চন্দনার ঝাঁক শন শন করে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক সবুজ তিরের মতন। মাথার উপর দিয়ে। এমনই ব্যস্তসমস্ত হয়ে, যেন কোনো খুবই জরুরি খবর তাদের পৌঁছে দিতে হবে এখুনি কারও কাছে।

রাতের সব পাখিরা এখন চুপ। একেবারেই চুপ। ধীরে ধীরে পাহাড়শ্রেণির পেছনে পুবের আকাশ লাল হচ্ছে। আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কতকিছু ঘটবার সম্ভাবনাও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। অন্ধকার রাত পোয়ালে, সবকিছু স্পষ্ট, আলোকময় করে, রাতের সব ভয় ও অনিশ্চিতি দূর করে একটি দিন আসছে অনেক আশা নিয়ে।

আমরা মানে, আমি, ভটকাই আর ঋজুদার দাঁড়িয়েছিলাম কতকগুলো কালো পাথরের স্তূপের পাশে। এইরকম স্তূপকেই পূর্ব আফ্রিকার ঘাসের দিগন্তলীন সমুদ্র সেরেঙ্গেটিতে বলে 'কোপি'। বানান অবশ্য Kopje।

আফ্রিকার সোয়াহিলি ভাষার ব্যাপারই আলাদা। ডাক্তারি শাস্ত্রে যেমন অনেক শব্দেরই আগে একটি করে 'p' যোগ করে দিতে হয়; যেমন নিউমোনিয়া, থাইসিসের (টি.বি.) বানান আরম্ভ হয় 'p' দিয়ে, তেমনই সেখানেও অনেক শব্দের আগে 'N' বসে। অদ্ভুতভাবে উচ্চারণ করে তারা শব্দগুলো। যেমন Ngorongoro, Ndutu, অথচ উচ্চারণ গোরোংগোরো, এবং ডুটু।

এসব কথা আমি, ঋজুদা, আর তিতির জানি। ভটকাইচন্দ্র তো মাত্র সেদিন ঢুকেছে আমাদের দলে। তাও আমারই লাগাতার সুপারিশে। আফ্রিকাতে তো ও যায়নি। 'গুগুনোগুম্বারের দেশে'-তে অবশ্য শুধুই আমি আর ঋজুদাই গেছিলাম। তারপর ভুষুন্ডার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে পরে আবারও যখন 'রুআহা'-তে গেছিলাম তখন তিতির গেছিল আমাদের সঙ্গে। তাই ভাবছিলাম, ভটকাইকে আফ্রিকার কথা বলে লাভ নেই। এমনিতেই তো ওর আগবাড়ানো মাতব্বরি আর ডেঁপোমিতে আমি একেবারেই বিরক্ত। ঋজুদার যে ওকে শাসন কেন করে না জানি না। তিতির এখন দিল্লিতে পড়াশোনা করছে, তাই কিছুদিন হল আমাদের সঙ্গ দিতে পারবে না।

'এটা কী নদী? ঋজুদা?'

'মানে?'

'মানে, নদীর নামটা কী? তুমি তো এর আগে অনেক বারই এসেছ।'

ফাটা শুরু হল সাতসকালেই। ভটকাইয়ের লাগাতার কথার ধানিপটকা। এই চুপ করে দাঁড়িয়ে আমরা মধ্যপ্রদেশের এই অচানক মার-এর আশ্চর্য সুন্দর এক

চৈত্রসকালের শান্তিতে যে বুঁদ হয়েছিলাম, সেই শান্তি ছিঁড়েখুঁড়ে গেল।

ঋজুদার পাইপের ইংলিশ গোল্ডব্লক তামাকের গন্ধে এই মিশ্রগন্ধী সকাল আরও সুগন্ধি হয়ে উঠেছিল।

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে ঋজুদার বলল, 'মনিয়ারী কৈরাহা।'

'বাঃ।'

আমি বললাম অজানিতেই, 'কী সুন্দর নাম! নদীর নাম মনিয়ারী কৈরাহা?'

'হ্যাঁ।'

'আর সামনে ওই যে পাহাড়টা দেখছিস ওটার নাম ঝিকারপানি।'

'তুমি না বললে বিন্ধ্যপর্বতমালা।' ভটকাই ফুট কাটল।

'তাই তো। পবর্তমালা মানেই তো অনেক পর্বতের সমষ্টি। পর্বতের মধ্যে কত শত পাহাড় থাকে। তাদের নামও থাকে। এই ঝিকারপানিরই মতো অসংখ্য নামও দেয় স্থানীয় মানুষেরা তাদের। একেকটি পাহাড়ের নামে, নদীর নাম। আর শুধু বিন্ধ্যই তো নয়। মাইকাল পর্বতমালাও আছে ডান দিকে।'

তারপর পাইপে একটা টান লাগিয়ে বলল, 'অমরকণ্টকের নাম শুনেছিস?'

'হ্যাঁ।' ভটকাই বলল।

তারপর বলল, 'জ্যাঠাইমা পটলাদাদের সঙ্গে সেখানে তীর্থ করতে গেছিলেন একবার। আমি যখন ছোটো ছিলাম।'

'তুই এখনও ছোটোই আছিস।' ঋজুদার বলল।

'যদিও পেকে ঝুনো হয়ে গেছিস।' আমি বললাম।

ঋজুদার বলল, 'তুই ভুল বললি রুদ্র। বল, এঁচড়ে-পেকে গেছে।'

'ঠিক তাই।'

'ফুঃ! সব এঁচড়ই আজকাল পাকা। কলকাতার কোনো বাজারে জেনুইন এঁচড় কি আর পাওয়া যায়? কারবাইডে পাকানো কাঁঠালই চলে এঁচড় হিসেবে।'

'তাও ভালো। আমার তো মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় যে তোকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাই।'

'তার মানে?'

ভটকাই তার খরগোশের মতন বড়ো বড়ো কান দু-টি তুলে আমাকে আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করল।

'মানে আবার কী? কারবাইডে না পাকিয়ে কিল মেরে মেরেও যে এঁচড়কে কাঁঠাল করা যায় তা কি জানিস?'

ভটকাই আমার দিকে একটি জ্বলন্ত চাউনি ছুড়ে দিয়ে বলল, 'ঋজুদা, সকালেই আরম্ভ করেছে কিন্তু তোমার অরিজিনাল চেলা। আসল ব্যাপারটা কী জান তো?'

'কী?'

'সেই নিনিকুমারীর মানুষখেকো বাঘ মারতে যাওয়ার সময়ে আমার সাহস এবং এলেম দেখার পর থেকেই ও জে।'

'জে মানে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জে মানে জান না? জে-জেলাসি। ঈর্ষা। পিওর অ্যান্ড সিম্পল ঈর্ষা। আরে ঈর্ষা করেই তো বাঙালি জাতটা গোল্লায় গেল। আমাকে ঈর্ষা না করে কী করে আমার মতো ঈর্ষণীয় হতে পারিস তার চেষ্টা কর, ভালো কাজে সময় ব্যয় কর, উন্নতি হবে।'

ঋজুদার বলল, 'চল। এদিকটা মোটামুটি দেখা হল তবে ব্রেকফাস্ট-এর পরে সারাদিনের মতো বেরোতে হবে চারধার ভালো করে দেখার জন্যে।'

ভটকাই বলল, 'একেই তো বলে scouting। তাই নয়?'

ঋজুদার কথা না বলে, মাথা নাড়ল।

আমরা অচানক মার বনবাংলোর দিকে ফিরে চললাম।

'এতক্ষণে হয়তো শিকারি ছখু বাইগা এসে বসে আছে।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ।' ঋজুদার বলল।

তারপর বলল, 'ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ওসমানসাহেব ব্রেকফাস্ট করবেন আমাদের সঙ্গে। অচানক মার-এর ম্যান-ইটিং টাইগার সম্বন্ধে পুরো ব্রিফিং করে যাবেন আমাদের। যদিও গত মাসে যখন কলিয়ারির কাজে এখানে এসেছিলাম, কনসার্ভেটরসাহেব মোটামুটি জানিয়েছেন, যা জানানোর। মাত্র তিন মাসে পনেরোটি মানুষ খেয়েছে বাঘটা। অনেক মানুষখেকো বাঘ ও লেপার্ড দেখেছি, মেরেওছি কম নয়। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে এত মানুষ আর কোনো মানুষখেকো মেরেছে বলে জানি না। আমার অভিজ্ঞতাতে অন্তত নেই।'

'বাঘটার কোনো wound আছে নিশ্চয়ই, যে কারণে মানুষের মতন প্রতিরোধহীন প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী শিকার করারই ক্ষমতা তার নেই।' আমি বললাম।

ঋজুদার পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, ' Could be !'

আমরা টিলা থেকে নেমে আস্তে আস্তে অচানক মার বাংলোর দিকে ফিরে যেতে লাগলাম। আমরা নিরস্ত্র। শুধু ভটকাইয়ের কাঁধে বারো বোরের দোনলা বন্দুক। ঋজুদার পারমিশনে আমাদের খাওয়ার জন্যে একটা মাত্র মুরগি অথবা খরগোশ মারার অলিখিত পারমিট সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে।

বন্দুকটা কিন্তু দারুণ। ইটালিয়ান বন্দুক। ব্যারেটা। ওভার-আন্ডার। মানে বন্দুকের নল দু-টি পাশাপাশি নয়। উপরে-নীচে। ইটালির ব্যারেটা কোম্পানিতে নিজের হাতের ও কনুইয়ের দৈর্ঘ্য, কবজি থেকে তর্জনীর দূরত্ব, নিজের মুখের মাপ সব পাঠিয়ে custom built করিয়েছিল ঋজুদার এটিকে বহুদিন আগে। পয়সা অবশ্য ঋজুদার দেয়নি। আমরা হাজারিবাগের মুলিমালোঁয়ার অ্যালবিনো রহস্য ভেদ করার পরে বিষেনদেওবাবু ঋজুদাকে জোর করে প্রেজেন্ট করেছিলেন। তখনকার দিনেই আমাদের দেশের টাকাতে লাখ খানেক টাকা দাম পড়েছিল। ওঁদের অভ্র রপ্তানির পয়সা ছিল অঢেল। বিদেশি মুদ্রাতে দিতে কোনো অসুবিধেও হয়নি।

'সকালে এক কাপ চা না খেয়ে ভদ্রলোকের পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। ঘুম পাচ্ছে এখনও আমার।' ভটকাই বলল, ব্যাজার মুখে।

আমি হাসলাম।

'হাসির কী হল এতে? তুমিও কি সকালে চা খাও না? নাকি রবীন্দ্রনাথের মতন নিমপাতার রস খাও?' ভটকাই বলল।

'না। সেজন্যে নয়। নিজেকে ভদ্রলোক বললি তো! তাই। তা ছাড়া, সারাটা জীবনই তো তুই ঘুমোলিই। ঘুম থেকে উঠলি আর কখন? কুম্ভকর্ণ incarnated, তোকে মাধবস্যার বলতেন না স্কুলে? মনে নেই?-এই যে বৎস ভটকাই, ঘুম কি ভাঙল? তারপরই মাধবস্যার আমাদের বলতেন, ওরে, তোরা ওকে একটু চটকে দিয়ে দেখ তো মটকা মেরে আছে, না সত্যিই ঘুমোচ্ছে? মাধবস্যারের সেই কথা থেকেই তো, ওরে ওরে ভটকাই আয় তোরে চটকাই এই স্লোগানের উদ্ভব।'

ঋজুদার বলল, 'তাই? স্লোগানটা শুনেছিলাম কিন্তু প্রেক্ষাপট জানতাম না।'

তারপর বলল, 'চল ফিরে বাংলোতে। গরম গরম পরোটা, ডিমের ভুজিয়া, বেগুন ভাজা লাল করে, সঙ্গে শেওতারাই-এর কালাহামুন।'

ভটকাই বলল, 'আর বিলাসপুরের বেঙ্গল সুইটস-এর সন্দেশের কথাটাই ভুলে গেলে। এস.ই.সি.এল.-এর সুভাষ চৌধুরীসাহেব আনিয়ে দিলেন না?'

ঋজুদার বলল, 'ঠিক।'

আমি বললাম, 'ভারি গুণীমানুষ কিন্তু ভদ্রলোক। কী দারুণ ওড়িয়া এবং হিন্দি বলেন।'

ঋজুদার বলল, 'চৌধুরীসাহেব আবার মামুলি হিন্দি নয়, একেবারে দূরদর্শনের আগমার্কা হিন্দি বলেন।'

'কীরকম?'

'গতবারে আমাকে স্টেশানে তুলে দিতে এসে একজন চেকারকে বিলাসপুর স্টেশানে শুধিয়েছিলেন, বম্বে-হাওড়া মেইলকি স্থিতি ক্যা হ্যায়?'

'মানে?' ভটকাই বলল।

'মানে, ট্রেনটার অবস্থিতি আর কী! কত লেট আছে? আদৌ লেট আছে কি না এবং দুর্গ থেকে ছেড়ে এসেছে কি না।'

'দুর্গ! কোথাকার দুর্গ?' ভটকাই বলল।

সকাল সকাল বাগে পেয়েই একটু কড়কে দিলাম ওকে। যাকে বলে 'nipped in the bud'। বললাম, 'ওরে মূর্খ! সাহিত্য বা বিজ্ঞান এসব তো কিছু পড়িসইনি, ভূগোলটাও কি পড়িসনি? মধ্যপ্রদেশে যে দুর্গ (দুরগ) বলে একটি বড়ো জায়গা আছে তাও জানিস না? জায়গাটার নাম দুর্গ, পালামৌর বেতলার দুর্গ নয়।'

২

অচানক মার বাংলোর কাছাকাছি আসতেই-আমরা বাংলোটির বাঁ-পাশ দিয়ে আসছিলাম, দেখা গেল একটি জলপাই-সবুজ জিপ দাঁড়িয়ে আছে বাংলোর সামনে।

ঋজুদার বলল, 'কী হল! ডি.এফ.ও. ওসমানসাহেবের তো আসার কথা সাড়ে আটটাতে। বিলাসপুর থেকে আসবেন। এত আগে এলেন যে!'

ভটকাই বলল, 'নিশ্চয়ই কোনো গড়বড়-সড়বর, কোনো গুবলেট, হয়েছে।

ভটকাইয়ের বাগবাজারি ভাষাই ওরকম।

যখন আমরা বাংলোতে গিয়ে পৌঁছোলাম, তখন কিন্তু দেখা গেল ভটকাই ঠিকই ধরেছিল।

দূর থেকে আমাদের দেখেই ডি.এফ.ও. ওসমানসাহেব এগিয়ে এসে বললেন, ওয়্যারলেসে খবর পেয়ে আসছি, লমনির পেছনে গণিয়া বস্তির একটি যুবতীকে বাঘে নিয়েছে আজই খুব ভোরে। চার-পাঁচ জনের একটি দল মহুয়া কুড়োতে গেছিল। তার মধ্যে থেকে এক জনকে নিয়েছে। এখুনি গেলে হয়তো আপনাদের পরিশ্রমের লাঘব হবে। আজই মানুষখেকো নিধন হবে।'

ভটকাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ঋজুদার বলল, 'মানুষখেকো কি অত সহজে মারা যাবে? সন্দেহ আছে।'

ভটকাইয়ের মুখটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল। ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'ব্রেকফাস্ট?'

'কিন্তু স্যার চেষ্টা তো করতে হবে। আপনিই তো ভরসা। কনসার্ভেটরসাহেব তো তাই বলেছেন আমাদের। আপনি পারবেনই। অন্যেরা বিফল হলেও।' ওসমানসাহেব

বললেন।

'চলুন তাহলে বেরিয়েই পড়া যাক। আতারিয়া বনবাংলাতে ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ দুইয়েরই বন্দোবস্ত করতে বলেছি ওয়্যারলেসে!' ডি.এফ.ও. বললেন।

'আতারিয়া কেন? লমনিতে থাকা নয় কেন?' ভটকাই বলল।

সাহস কম নয়! ঋজুদার থাকতে এমন মাতব্বরি! ভাবা যায় না!

'লমনি বাংলোটা কেঁওচির দিকে যাওয়ার বড়ো রাস্তার ওপরে। এপথ দিয়েই তো পেন্ড্রা রোড, অমরকণ্টক, সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর সুহাগপুরের সব কলিয়ারিতে যাওয়ার পথ। ঋজু বোসের মতন সেলিব্রিটিকে ওই বাংলোতে রাখলে জানাজানি হয়ে গেলে মি. বোসেরই অসুবিধে হবে। মধ্যপ্রদেশ তো এখন বাঙালি টুরিস্টদের স্বর্গরাজ্য হয়ে গেছে। শিক্ষিত বাঙালিরা যদি জানতে পারে যে ঋজু বোস লমনি বাংলোতে আছেন, তবে ভিড় সামলাতে পুলিশ ডাকতে হবে।'

ঋজুদার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই সবই রুদ্রর কাণ্ড। যত্ত বাজে সব।'

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'বানিয়ে বানিয়ে আরও গল্প লেখো। 'ঋজুদা কাহিনি।' জীবনে যে কারণে সিনেমাতেই নামলাম না, তুই আমাকে নিয়ে গল্প লিখে সেই বিপদেই ফেললি শেষে। সেলিব্রিটি হয় মানুষের সাতজন্মের পাপ থাকলে। নিজের পার্সোনাল লাইফ বলে কিছু থাকবার জো আছে! ল্যাংড়া পাহান বাঘেরই মতন সকলেই আঙুল তুলে দেখিয়ে বলবে, ওই যায়! ওই যায়!'

ইতিমধ্যে অচানক মার বাংলোর চৌকিদার সন্তুরাম চা নিয়ে এল ট্রেতে করে। আমরা বারান্দাতে বসে এক কাপ করে চা খেয়েই আপাতত এক দিনের মতন জামা-কাপড়, রাইফেল-বন্দুক-গুলি-দূরবিন সব নিয়ে তাড়াতাড়ি জিপে উঠলাম।

ঋজুদাই বলল, 'এখানে সময় নষ্ট করার মানে হয় না।'

অন্য সবকিছু অচানক মার-এই পড়ে রইল। কনসার্ভেটরসাহেব চৌকিদার সন্তুরামকে বললেন, 'সব ঠিকঠাক করে দেখে রেখো সন্তুরাম। সাহেবরা কখন ফিরবেন তা ওয়্যারলেসে জানিয়ে দেব।'

'জি সাব।'

আটেনশনে দাঁড়িয়ে বলল সন্তুরাম, মধ্যপ্রদেশের বন বিভাগেও পুলিশ বিভাগের মতন নিয়মানুবর্তিতা আছে দেখে খুশি হলাম। নিয়মানুবর্তিতা, অথবা নিয়মানুবর্তিতার ভান, যাই হোক।

পৌঁছে দেখলাম, লমনি বনবাংলোটি বেশ বড়ো। বাইরে থেকেই দেখা গেল একটি মস্ত গামহার গাছ বাংলোর হাতাতে এবং দু-টি সুপ্রাচীন বটল-ব্রাশের গাছ। এত বড়ো বটল-ব্রাশ গাছ আগে কখনো দেখিনি। আমরা বাংলোর পাশ দিয়ে গিয়ে মাট্টিনালার উপরের কংক্রিটের সাঁকো পেরিয়ে আরও কিছুটা গভীর গাঢ় জঙ্গলের

মধ্যে আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে ডান দিকের কাঁচা রাস্তাতে ঢুকে পড়লাম। লাল মাটির পথ। হাওয়াতে তখনও মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধ ভাসেনি। নানা রঙা মরাপাতার রাশ গালচে পাতেনি প্রতি গাছের নীচে। তবে বাংলোর হাতার মধ্যে যেন আমের বোল আর কাঁঠালের মুচির গন্ধ পেলাম। পেটভরে নিশ্বাস নিলাম। ঃআ।

ভাবছিলাম, আমাদের এই সুন্দর ভারতবর্ষ দেশ হিসেবে কতই বড়ো ও বিচিত্র যে, একেক জায়গাতে একেক সময়ে পলাশ আর শিমুল ফোটে, মাদার, পারুল, জারুল, মহুয়া, করৌঞ্জ থেকে আম-কাঁঠালও। কোথাও ফেব্রুয়ারিতেই আমের বোল আর কাঁঠালের মুচি এসে যায়, কোথাও-বা আবার মার্চের একেবারে শেষে। এত বিচিত্র আবহাওয়া, জমি, গাছগাছালি বলেই আমার দেশকে এত ভালোবাসি আমি। অবশ্য এই ভালোবাসা শিখেছি পুরোপুরি ঋজুদারই কাছ থেকে। জানি না, ঋজুদার যখন থাকবে না, তখন কী করব। কী করে এই ভালোবাসার দায় বইব। কেউই তো চিরদিন থাকে না। ঋজুদাও থাকবে না। তবে আমি কোনোদিনই চাইনি ঋজুদার বিছানাতে শুয়ে মারা যাক। অমন সাধারণ ছা-পোষা মানুষের মৃত্যু ঋজুদাকে আদৌ মানায় না।

আতারিয়া বাংলোতে পৌঁছেই দেখলাম, পাশ দিয়ে একটি সরু ছোটো নদী বয়ে গেছে। গত কয়েকদিন বিন্ধ্য আর মাইকাল পর্বতশ্রেণিতে বেশ ভালো বৃষ্টি হয়েছে। তাই জল চলেছে ঢল নামিয়ে।

ঋজুদার আসবে বলে কয়েকজন মানুষ অপেক্ষা করছিল সেখানে। ওসমানসাহেব একজনকে ডাকলেন। ঋজুদাকে বললেন, 'এর নাম চৈতুরাম পোর্তে। এ হল লমনির মুখিয়া।'

লোকটার চেহারা আমার মোটেই ভালো লাগল না। অত্যন্ত ধূর্ত বলে মনে হল। কয়েকজন মেয়েও ছিল সেখানে। যারা সকালে গেছিল মহুয়া কুড়োতে। ওরা বলল, অঘটনের জায়গাটা নাকি কাছেই আতারিয়া বাংলো থেকে।

ঋজুদার বলল, 'তোমরা থাক কোথায়? কোন গ্রামে?'

'গণিয়া।'

'সেই গ্রামের আশেপাশে মহুয়া গাছ নেই?'

'একটা মাত্র আছে। এদিকে মহুয়া গাছ কম।'

কথাটা ঠিকই। বিহারের মতন মহুয়া গাছ সম্ভবত অন্য কোনো রাজ্যেই নেই। বড়ো হতে সময়ও নেয় খুব তারা।

বাবুর্চিখানা থেকে ফার্স্ট ক্লাস খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা পরোটার গন্ধ ছাড়ছিল। ভটকাইয়ের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঋজুদার লক্ষ করে একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'ভটকাই তুই বাংলোতেই থাক। ভালো করে ব্রেকফাস্ট কর। বারান্দাতে বসে নদীর শোভা দেখ।'

বলেই, আমাকে বলল, 'চল রুদ্র।'

সাধে কী আর বলে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!

কিন্তু ঋজু বোসের মুখ দিয়ে একবার কথা বেরিয়ে গেলে তা রাইফেলের নল থেকে বেরিয়ে যাওয়া গুলিরই মতন আর ফিরে আসে না। ভটকাই রীতিমতন কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, 'আ...আ...আমি!'

ঋজুদার বলল, 'যা বললাম, তাই কর ভটকাই।'

তারপর বলল, 'চলো, চৈতুরাম।'

মেয়েদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি বয়সি, তার বয়স, এই উনিশ-কুড়ি হবে, তাকে ডেকে নিল ঋজুদার চৈতুরামের সঙ্গে। বিষেন সিংসাহেবকে বলল, 'আপনি চলে যান বিলাসপুরে।'

'চলে যাব? আপনার যদি কোনো দরকার...'

'কোনো দরকার হবে না। একটি ওয়্যারলেস টেলিফোন লাগানো জিপ তো রেখেই যাচ্ছেন আপনি। তবে আর অসুবিধে কী? তবে আপনি যাওয়ার আগে প্লিজ নাস্তা করে যান। মিস্টার ভটকাই আপনাকে কম্পানি দেবে। ও খেতে খুব ভালোবাসে। বলতে গেলে, ভালো-মন্দ খেতেই এসেছে ও এখানে। আমারই চেলা তো!'

আমি বললাম, 'চেলা তো আমি! ও হল, চামুণ্ডা।'

ঋজুদার হেসে বলল, 'ঠিক।'

বলেই বলল, 'তুই ব্যারেটা শটগানটা নে। যা যা গুলি নেবার সব নিয়েছিস তো?'

বললাম, 'নিয়ে নিচ্ছি।'

কাঁদো-কাঁদো মুখে ভটকাই বন্দুক আর গুলির বেল্ট আমাকে দিল। আমি তার থেকে বেছে দুটো লেথাল বল আর চারটে এল.জি. নিয়ে আমার বুশ-শার্টের দু-পকেটে রাখলাম।

ঋজুদার নিয়েছে থার্টি ও সিক্স ম্যানলিকার শুনার রাইফেলটি। আর পাঁচটি গুলি। তাঁর বুশ-শার্টের বুকের বাঁ-দিকের পকেটের খাঁজে গোঁজা। সব গুলিই সফট-নোজড বুলেট।

'দূরবিনটাও নিয়ে নে রুদ্র।'

ভটকাইয়ের গলাতে জার্মানির তৈরি জাইস-এর দূরবিনটা তখনও ঝোলানো ছিল মালার মতন, খুলে নিলাম আমি সেটাকে। ভটকাইয়ের মুখের ভাবটা এমনই হল যেন আমি শুভদৃষ্টির সময়েই ওর গলার মালাটাই খুলে নিলাম।

যাক বহু বহু বছর পর ভটকাইকে বেশ মঃনকষ্ট দিয়ে হেভি আনন্দ পেলাম আমি। কে জানে! মানুষকে সুখী করে যেরকম আনন্দ পাওয়া যায়, দুখি করে হয়তো তার চেয়েও অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। পাজি মানুষেরা তাই পায় অন্তত।

তারপরই ভাবলাম, আমি কি পাজি?

ঋজুদার বলল, 'মড়ি নিয়ে আসা হয়েছে দাহ করার জন্যে? মেয়েটির বাড়ির লোকেরা কেউ আসেনি?'

যে মেয়েটি আমাদের সঙ্গে চলল, সে বলল, 'তার কেউই ছিল না সাহাব। বাবা মারা গেছিল সাপের কামড়ে, তার যখন তিন বছর বয়স তখন। আর মা মারা গেছিল চীচক রোগে, ওর যখন সাত বছর বয়স তখন। তখন থেকে সে একা।'

'থাকে কাদের সঙ্গে তাহলে? একা থাকত বস্তিতে?'

'না।'

'তবে?' ঋজুদার আবার প্রশ্ন করল।

মেয়েটি একবার মুখিয়া চৈতুরামের মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'থাকত মুখিয়ার বাড়িতে। নানা কাজকর্ম করত আর তার বদলে খেতে-পরতে পেত।'

'ও।' ঋজুদার বলল।

আমরা আতারিয়া বাংলোর পেছন দিয়ে একটু এসে একটি পায়ে চলা পথে ঢুকে পড়লাম। যাকে বলে game track অর্থাৎ জানোয়ারদের চলাচল করার পথ। যে-পথে মানুষেরাও যাতায়াত করে। সাবধানে পায়ের দাগ দেখতে দেখতে এগোলাম আমি। শুয়োর, শম্বর, কোটরা, চিতল হরিণ, শজারু, একটি মাদি চিতা এবং বাইসনের দলের দাগও দেখলাম। সম্ভবত এই পথটির একটি মুখ নদীতে আর অন্য মুখ কোনো নুনিতে আছে। নুনি অর্থাৎ salt lick, প্রাকৃতিক। বনের মধ্যে কোনো কোনো জায়গাতে লবণাক্ত পাথর অথবা মাটি থাকে। তৃণভোজী জানোয়ারেরা সেই নুন চাটতে আসে। আর তাদের পেছনে পেছনে আসে মাংসাশী জানোয়ারেরা।

কিছুদিন পরেই খরা পড়বে। নদী আর এমন কলরোলে বইবে না। কী আতারিয়া নদী, কী মনিয়ারী কৈরাহা, আর কী মাট্টিনালা। তখন জানোয়ারেরা নদীর দিকেই আসবে বেশি করে। খরার সময়ে জঙ্গলে জল থাকবে না। এখন যায় শোভাযাত্রা করে নুনিতে। আসলে কি আর শোভাযাত্রা করে যায়! একেক প্রাণী যায় তার সময়সুবিধে মতো, রাতের নানা প্রহরে। সন্ধ্যে থেকে শেষরাত অবধি।

আরও কিছুটা যাওয়ার পরে প্রায় কুড়ি মিনিট মতন, একটি টিলা দেখা গেল। তার চারদিকে, পায়ের কাছে, আঁচলে, নানা হরজাই জঙ্গল। শিশু, বিজা, সাহাজ,

কুর্চি, গামহার, আরও নানা গাছ অথচ টিলাটাতে কেবলই মহুয়া। খুবই প্রাচীন সব মহুয়া।

'নাম কী? এই টিলার?'

'মহুয়া টিলা।' মুখিয়া বলল।

'এই টিলার উপরেই ধরেছিল বাঘে মেয়েটিকে?'

'তা ওই মেয়েটিই বলতে পারবে।'

'নাম কী তোমার?' ঋজুদার শুধোল।

'রূপকুমারী।'

'তোমার বন্ধুকে বাঘে কোথায় ধরল?'

'তা দেখিনি।'

'মানে?'

'মানে, আমরা সকলেই মহুয়া কুড়োচ্ছিলাম। আলো তো ফুটে ছিলই, সূর্যও উঠে গেছিল।'

'যে-অঞ্চলে মানুষখেকো বাঘ এত মানুষ ধরেছে সেখানে তোমরা অন্ধকার থাকতে গ্রাম থেকে বেরোলে কোন সাহসে?'

'এই বাঘটা তো দিনের বেলাতেই মানুষ ধরে। রাতে তো এক জনকেও ধরেনি। চিতা যদি মানুষখেকো হয়, তবে রাতে ধরে। একবার গামহারগাঁও-এ এক চিতা...'

'ঃআ। বড়ো বেশি কথা বলিস তুই রূপকুমারী। সাহাব কত বড়ো মানুষ জানিস? দেখলি না ডি.এফ.ও.সাহাব পর্যন্ত কীরকম খাতির করলেন সাহাবকে। তার সঙ্গে এত বেশি কথা কীসের? যা প্রশ্ন করবেন তারই ঠিকঠাক জবাব দিবি। তোর গেঁহু-বাজরার গাই-বলদের কিসসা শোনার সময় সাহাবের নেই।'

ঋজুদার মুখিয়াকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না বললে সব জানব কী করে! ওকে থামাবার দরকার নেই!'

মুখিয়া একটু দমে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে সাহাব।'

'বলো রূপকুমারী।'

'আমরা যখন সকলে মহুয়া কুড়োচ্ছি ও...'

'ওর নাম কী ছিল?'

'প্রাণকুমারী।'

'তারপর?'

'ও ওর ঝুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, আমি একটু আসছি। বলে মহুয়া টিলার ওই পাশে একটু নেমে গেল। একটু নামতেই আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল সে। উতরাই ছিল তো!'

'কী করতে গেছিল?'

'তা বলতে পারব না। জানি না।'

'তারপর?'

'তারপর আমাদের যখন ফেরার সময় হল, তখনও এল না দেখে আমরা সকলে একসঙ্গে এগিয়ে নেমে গিয়েও যখন ওকে দেখতে পেলাম না, তখন হঠাৎ ঝুমকি বলল, ওকে নিশ্চয়ই বাঘে ধরেছে। সেকথা শোনামাত্রই আমরা পড়ি কি মরি করে দৌড়ে সোজা গ্রামে। তারপর মুখিয়াকে খবর দিতে সে অচানক মার-এর রেঞ্জারসাহেবকে লমনি থেকে একটি ট্রাক ধরে গিয়ে খবর দিল।'

বলেই, চোখ নামিয়ে নিল রূপকুমারী নীচে। লজ্জাতে।

আমি বুঝলাম, বাথরুম-টাথরুম করতে গেছিল নিশ্চয়ই।

তারপর ঋজুদার বলল, 'টিলাটা চড়তে চড়তে, বাঘকে কি কেউ দেখেছিল তোমাদের মধ্যে? এক জনও?'

'না হুজৌর।'

'কোনোরকম আওয়াজ শুনেছিলে কেউ? ধস্তাধস্তির শব্দ।'

'না হুজৌর।'

চৈতুরাম পোর্তে একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলল ঋজুদাকে, 'লোকমুখে শুনলাম আপনি নাকি পৃথিবীর সব জঙ্গলেই শিকার করেছেন কিন্তু মানুষখেকো বাঘে বা চিতাতে যখন মানুষ ধরে তখন তার পাশের মানুষও যে টের পায় না তাও কি সাহাব জানেন না? বেড়ালে পায়রা ধরলে, পায়রা তবু ডানা ঝটপট করে কিন্তু মানুষখেকো বাঘ কি চিতা যমের চেয়েও নিঃশব্দ।'

ঋজুদার পূর্ণদৃষ্টিতে চৈতুরামের মুখের দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'তাই বুঝি? তা, তোমরা বনজঙ্গলেই চিরটা কাল থাক, তোমরা আমার মতন শহুরে মানুষের চেয়ে বেশি জানবে বই কী! আমার জ্ঞান তোমাদের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়।'

আমি ভাবছিলাম, কথাটা তো ঠিকই। একটি ছাগলেরও শিং আছে, পায়ে খুর আছে। সেও আক্রান্ত হলে শিং নাড়ে, পা ছোড়ে। সেই তুলনাতে মানুষেরই কিছু করার নেই, মানুষই সবচেয়ে অবল।

ঋজুদার বলল, 'মেয়েটির মড়িকে দেখেছে কেউ? মানে, লাশ?'

'সদ্য সদ্য মানুষখেকো বাঘে-নেওয়া মানুষের লাশ দেখতে গিয়ে কে শখ করে নিজেই লাশ বনতে যাবে বলুন সাহাব? তাও যদি, যাকে নিল তার আপনজন কেউ থাকত তো অন্য কথা। মানে, মা, বাবা, দাদা, বোন। ওর তো কেউই ছিল না।'

'কেন? তুমি তো ছিলে মুখিয়া। তোমার আশ্রয়েই তো থাকত প্রাণকুমারী।'

'হ্যাঃ।' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল মুখিয়া চৈতুরাম পোর্তে।

তারপর বলল, 'ওই ছোটো জাতের মেয়ের জন্যে নিজের জীবন বরবাদ করব এমন পাগল তো আমি নই। আমার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম এই ঢের। আমি না থাকলে তো ও এই এত বড়োটি হয়েই উঠতে পারত না। ওর হাতে আমরা খেতামও না কখনো। ভুলুয়া কুকুর আর ওর জন্যে দু-টি আলাদা থালা ছিল। জাম গাছের গোড়াতে ওদের দু-জনকে একই সঙ্গে খাবার দিত আমার বউ। তার জন্যে অত দরদ তো আমার ছিল না। থাকার কথাও ছিল না। তা ছাড়া, বড়ো হয়েই মেয়েটা ভারি পাজিও হয়ে গেছিল।'

'পাজি?' বলেই, ঋজুদার চুপ করে গেল।

ততক্ষণে আমরা মহুয়া টিলার ওই প্রান্তে পৌঁছে গেছি।

ঋজুদার বলল, 'তোমরা কেউ প্রাণকুমারীকে বাঘে নিতে দেখনি, তার লাশের খোঁজও করনি। বাঘের পায়ের দাগ কি ছিল? মানে কেউ দেখেছিল? তোমাদের গাঁয়ের আর সব মানুষই-বা গেল কোথায়?'

'তাদের সকলকেই খেটে খেতে হয় সাহাব। তাদের কি আপনাদের মতন ভালো অবস্থা যে বসে থাকলেও পেট চলবে। যে যার কাজে গেছে। আমিই বলেছি যেতে।'

'সে কী? মেয়েটার একটা হদিশ না করেই? তাকে বাঘের উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিয়ে চলে গেল তারা!'

মুখিয়া প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'বাঘের পায়ের দাগ ওই ঘাসের মধ্যে কী করে দেখা যাবে?'

'পায়ের দাগ না হলেও ঘাসের মধ্যে চিহ্ন তো থাকবে কিছু। অত বড়ো ভারী বিরাট একটা জানোয়ার চলাফেরা করলে পায়ের ছাপ নাও পড়তে পারে পুরু নরম ঘাসের উপরে, শব্দও না হতে পারে কিন্তু কোনোরকম চিহ্নই পাওয়া যাবে না? এ তো আশ্চর্য কথা!'

'আপনারা অনেক পড়ে-লিখে বড়ো শিকারি সাহাব। আপনারা পেলেও পেতে পারেন। আমরা পাইনি।'

'হুঁ।' ঋজুদার বলল, চিন্তান্বিত মুখে।

তারপর বলল, 'পাব কি না জানি না। চেষ্টা তো করতে হবে। মধ্যপ্রদেশ সরকার এত খরচপত্র করে আমাদের নিয়ে এসেছেন, মেয়েটাকে বাঘে নিয়ে গেল, আর আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব তা তো হয় না।'

তারপরই কী ভেবে, রূপকুমারীর দিকে ফিরে তার দু-চোখে নিজের দু-চোখ রেখে বলল, 'তোমার কী মনে হয়? রূপকুমারী?'

রূপকুমারী যেন ভয় পেয়ে গেল।

বলল, 'কীসের কী মনে হয় হুজৌর?'

'না...। মানে...।'

ঋজুদার চৈতুরাম পোর্তের দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক আছে। তোমরা সকলেই এবারে যেতে পার। তোমাদের গ্রামে তো একজনও নিষ্কর্মা লোক নেই দেখছি। এমন কাজ-পাগল গ্রাম ভারতের কোনে কোনে হোক। তাহলে দেশের সব দুর্গতিই মোচন হবে।'

মুখিয়ার সঙ্গে যে আরও দু-জন লোক ছিল তারা বলল, 'আপনারা এ অঞ্চলে নতুন। জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে যেতে পারেন, তা ছাড়া মানুষখেকো বাঘ রয়েছে এ জঙ্গলে। আপনাদের ছেড়ে যাই কী করে?'

ঋজুদার বলল, 'মানুষখেকো বাঘ মারবার জন্যেই তো এসেছি আমরা। মানে, আমাদের আনানো হয়েছে। বাঘকে ভয় করলে কি আসতাম! প্রাণকুমারীকে বাঘেই খেল না ঘোগে খেল তা আবিষ্কার করে তারপরেই ফিরব। আমাদের জন্যে তোমাদের কোনোই চিন্তা নেই। তোমরা যাও।'

তারপর শক্ত গলায়, হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'যাও।'

ওরা বেজার মুখে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরল।

ঋজুদার মুখিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রাণকুমারী যে ছোটো জাতের বললে, কী জাত ছিল ওর?'

'পানকা।' মুখিয়া বলল।

ঋজুদার বলল, 'ও, তাই?'

তারপর ওরা যতক্ষণ না দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, ততক্ষণ ওই একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে রইল ঋজুদা।

ওরা চলে গেলে বলল, 'জানিস রুদ্র, এই পানকাদের ছোটো জাত বলল মুখিয়া, অথচ এই জাতের কোনো পুরুষের সঙ্গে যদি পথে কোনো অনাত্মীয়া নারীর দেখা হয়, সে বিরাশি বছরেরই হোক কি তিন বছরের তারা প্রত্যেককেই, হাঁটু গেড়ে বসে দু-হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে। এই ওদের সংস্কৃতি। এই পানকাদের যারা ছোটো জাত বলে, তারা নিজেরাই অমানুষ।'

আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মধ্যপ্রদেশের এই সব অঞ্চলে কোন কোন আদিবাসী থাকে?'

'থাকে তো অনেকই রকম কিন্তু তাদের আর তাদের মতন থাকতে দিলাম কোথায় আমরা এই শহুরেরা! আমাদের ভালো যে ওদের ভালো নয়, ওদের নিজেদের ভালোত্ব নিয়েই যে ওরা এত হাজার বছর বেঁচে এল হেসে-খেলে, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা সুখে, সে-কথা আমরা মানলাম কই? মনের সুখের সঙ্গে যে

বড়োলোকির কোনো সম্পর্কই নেই এই কথাটা আমরা নিজেরা তো বুঝলামই না, ওদেরও কলুষিত করলাম, আমাদের চাই চাই খাই খাই সংস্কৃতি দিয়ে। আমাদের সংস্পর্শে এসেই এই সরল, ভালো, আদিবাসীরা এই চৈতুরাম পোর্তেরই মতন ধূর্ত-ধাউর হয়ে গেছে। লোকটার চোখ দুটো দেখলি? শেয়ালের মতো।'

'দেখেছি।' আমি বললাম। 'প্রথমদর্শনেই তাই মনে হয়েছে আমারও।'

'এবারে চল। কাজে নামা যাক। বাঘ তো অনেকই শিকার করেছি আমরা, কিন্তু প্রাণকুমারীকে অচানক মার-এর বাঘে মেরেছে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

অবাক হয়ে আমি বললাম, 'তবে কীসে মেরেছে?'

'মেরেছে যে আদৌ সেকথাও এখুনি বলতে পারছি না। তবে তুই তোর বন্দুকের দুই ব্যারেলেই গুলি পুরে রাখ। একটা বাঘ, সে মানুষখেকো হলেও তার মোকাবিলা করা সহজ। আমাদের হয়তো একই সঙ্গে একাধিক বাঘের মোকাবিলা করতে হবে। ভটকাইটাকে শাস্তি দেবার জন্যে বাংলোতে রেখে এলাম। এখন দেখছি, ও থাকলে ভালোই হত। তৃতীয় gun থাকত। কোনো lead-ই তো নেই।'

'পেটুক হওয়া এত বড়ো অপরাধ নয় যে, ঋজুদার তুমি বেচারিকে কলকাতা থেকে এতদূরে নিয়ে আসার পরেও সে মেক-আপ টেক-আপ নেওয়ার পরও তাকে স্টেজে নামতে দিলে না। তা ছাড়া পেটুক বদনাম হয় ওর একারই, খাই তো আমি-তুমিও কম নয়।'

'সেটা ঠিক। অন্যায় হয়েছে আমার। তবে নাটকের এই দৃশ্যে নামেনি তো কী হয়েছে? এই মঞ্চ revolving। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই নতুন নতুন দৃশ্য, নতুন নতুন অঙ্ক আসবে। ওর দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। আর ভটকাই তো রীতিমতো ওস্তাদ হয়ে উঠেছে আজকাল। ওস্তাদের মার শেষরাত্রেই তো দেখানো ভালো। তাই না? দেখবি, মানুষখেকোটাকে শেষপর্যন্ত ওই হয়তো মারবে।'

মহুয়া টিলার যেদিকে আঙুল দিয়ে রূপকুমারী দেখিয়েছিল, প্রাণকুমারী নেমে গেছে বলে, ঋজুদার সেদিকে না গিয়ে তার ডান দিকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেল আর আমাকে বলল, 'তুই বাঁ-দিকে নেমে যা। খুব ভালো করে খুঁজতে হবে। বাঘের কোনো চিহ্ন, মড়ির কোনো চিহ্ন, একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ের কোনো চিহ্ন, কোনোরকম চিহ্ন, কানের দুল, জামা বা শাড়ির টুকরো, মাথার চুল কিছু পাওয়া যায় কি না। আর সেই সঙ্গে সবসময়ে সজাগ থাকবি। কান খাড়া রাখবি। যে-কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে।'

'মানুষখেকোর কাছ থেকে?'

'না।'

'মানুষখেকো এ জঙ্গলে নেই।'

'মানে?'

'মানে, অচানক মার-এ অবশ্যই আছে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে বড়ো রাস্তার, মানে শেওতারাই থেকে অচানক মার এবং লমনি হয়ে যে পথটি কেঁওচি চলে গেছে তার ডান দিকে ওই বাঘ কখনো আসে না। কনসার্ভেটরের ঘরে বসে আমি ম্যাপ দেখে এসেছি। যতগুলো kill এই মানুষখেকো করেছে তার একটিও এই বড়ো রাস্তার ডান দিকের কোনো গ্রামেই হয়নি আজ অবধি।'

'কেন?'

'কেন তা বলা মুশকিল। তবে কারণ অবশ্যই আছে। আমার মনে হয়, বাঘটা এই পথের ডান দিকের কোনো জঙ্গলে গুলি খেয়ে থাকবে। যারা বাঘটাকে দেখেছে তারা সকলেই বলেছে বাঘটা কেমন ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে চলে। চোট না পেলে, তার শরীরে আঘাত ও অস্বস্তি না থাকলে সে ক্রমান্বয়ে এবং এত ঘন ঘন মানুষই-বা মেরে চলবে কেন? বাঘটা বুড়োও নয়।'

'কী করে বুঝলে?'

'বুড়ো হলে তার এত রাক্ষসের মতন খিদে থাকত না। বাঘটা জোয়ান বাঘ। পায়ের দাগ যারাই দেখেছে তারা সকলেই বলেছে নাকি।'

'এরকম কি হয় কখনো? মানুষ মারছে ধড়াধড় আর রাস্তার ডান দিকে তার No Entry। ডান দিকটা out of bounds। আশ্চর্য তো!'

'কিমাশ্চর্যমঃতপরম। বৎস, পারক্কালাম। পারক্কালাম। টিক্কে থই ধরো, সব্ব বুঝি পারিবে।'

একই সঙ্গে ঋজুদার সংস্কৃত, তামিল এবং ওড়িয়া বাণী শুনে তো আমার অবস্থা কাহিল। অতএব ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায়ও নেই।

ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার আগে ঋজুদার মহুয়া টিলার পাশে, মানে আতারিয়া বনবাংলোর দিকে একটি প্রকাণ্ড বড়ো কুসুম গাছ দেখিয়ে বলল, 'আমি বারোটার সময়ে ওই গাছটার নীচে তোর জন্যে অপেক্ষা করব। আগেও আসতে পারি। তুইও আগে আসতে পারিস তোর তদন্ত সেরে। আশা করি কুসুম গাছটা চিনতে তোর অসুবিধে হবে না কোনো।'

আমি বললাম, 'বসন্তবনের কুসুম গাছ চেনা আবার কঠিন কী? নতুন ফিনফিনে ফিকে মেরুনরঙা পাতাতে তো ভরে রয়েছে গাছ। যারা জানে না, তারা মনে করে ফুলই ফুটেছে বুঝি। চলে আসব আমি ঠিক। নো প্রবলেম।'

তারপরে ঋজুদার বলল, 'তবে একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, প্রাণকুমারীকে বাঘে নেয়নি। ওই চৈতুরাম পোর্তের খারাপ ব্যবহারের হাত থেকে বাঁচতেই হয়তো সে পালিয়ে গেছে। নয়তো তার অন্য কিছু হয়েছে।'

'মানুষখেকো বাঘ মারতেই তো আমাদের এনেছেন ওঁরা। নিরুদ্দিষ্টর তদন্ত করতে তো আনেননি।'

'নিমকহারামি করিস না তো! যাদের ঘাড়ে চড়ে মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ে এলি তাদের প্রতি কিছু তো কর্তব্যবোধ থাকবে! It's all in the game! তা ছাড়া, অচানক মার-এর মানুষখেকো যে আমরা মারতে পারবই এমন গ্যারান্টিই-বা দেব কী করে? ওড়িশার 'নিনিকুমারীর বাঘ'-এর কথা তোর মনে নেই? আমরা তো হতাশ হয়ে ফিরেই যাচ্ছিলাম না মারতে পেরে। হাজারিবাগের অ্যালবিনোর কথাও? সাদা বাঘ মারতে গিয়ে কী গোয়েন্দাগিরিই না করতে হয়েছিল। বাব্বাঃ।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

আমি নেমে গেলাম। খুব সাবধানে মাটির দিকে চোখ রেখে এগোতে লাগলাম।

ঋজুদার যখন বলেছে যে, বাঘ এদিকে আসে না, তখন তা বেদবাক্য বলেই মেনে নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু বনজঙ্গলের নিয়মকানুন আলাদা। সেকথা ঋজুদাও জানে। বেদবাক্যই হোক কি পিতৃবাক্যই হোক বনেজঙ্গলে এবং বিশেষ করে মানুষখেকো বাঘের বা চিতার ব্যাপারে আমি কারও কথাতেই চলতে রাজি নই। ঋজু বোস, ঋজু বোসই। কিন্তু আমার শিক্ষানবিশিও তো কম দিন হল না। এই শিক্ষা ঋজুদারই দেওয়া। ঋজুদার বলে, 'আমি ভগবান নই। ভুল সকলেরই হতে পারে। আমার মত বাধ্য ছেলের মতন সবসময়েই মেনে নিবি না। নিজের বিচারবুদ্ধিতে চলবি। এখন তো তুইও পাকা শিকারি।' ঋজুদার শাগির্দ হওয়া আরম্ভ হয়েছিল যখন আমার বয়স ছিল মাত্র দশ-এগারো। তারপর আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি ও রুআহা, বিহারের হাজারিবাগ, ওড়িশার লবঙ্গি, মধ্যপ্রদেশের সুফকর (অবশ্য সুফকর-এ শিকার করিনি, ঋজুদার মুখে সেখানের সেই মারাত্মক বাঘের গা-শিউরোনো গল্প শুনেছিলাম) আরও কত জায়গাতে কত অভিজ্ঞতাই হল। কথাতেই বলে, 'গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা মিলে এক।' যদি ঋজুদার মতন গুরু পেয়েও যোগ্য চেলা এতদিন না হয়ে উঠতে পারি তবে সে তো গুরুরই অসম্মান!

এই চৈত্রদিনের বনের সৌন্দর্য যে কীরকম তা বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তেমন ভাষা বা বিদ্যা আমার নেই। এখন চৈত্রর মাঝামাঝি। শোভা এখনও পুরো খোলেনি। যত দিন যাবে ততই খুলবে। রংবাহারি হবে বনভূমি। কাচপোকা উড়বে। নানারঙা প্রজাপতির ঝাঁক ঘুরবে। মনে হবে, 'বনময়, ওরা কার কথা

কয় রে!'

মুখ নীচু করে কোনোরকম চিহ্ন, বাঘের অথবা মেয়েটির, পাওয়া যায় কি না-তা দেখতে দেখতে চলেছি। অথচ মুখ নীচু করে জঙ্গলে চলা আদৌ উচিত নয়। বিপদ উপরেও থাকে। উপরে তাকিয়ে চলার অভ্যাস নেই বলেই বাঘের মতন মহাবলী প্রাণী এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিকারি, মানুষের মতন চামচিকের হাতে বেঘোরে মারা পড়ে, যেসব শিকারি মানুষ গাছের উপরে মাচা বেঁধে বসে থাকে, সেই সব মানুষের হাতে। তাই, মাঝে মাঝে উপরেও তাকাচ্ছি। বন্দুকের বাঁটটা ডান বগলের নীচে ধরে আর ডান হাতের আঙুলগুলি দিয়ে 'স্মল অফ দ্যা বাট'কে ধরে খুব আস্তে আস্তে এক-পা, এক-পা করে এগিয়েও এখন পর্যন্ত কিছুই চোখে পড়েনি সন্দেহজনক।

প্রায় আধ ঘণ্টাটাক হেঁটেছি। পাহাড় ছেড়ে সমতলে নেমে এসেছি। রোদ এখন পুরো জঙ্গলের আনাচকানাচেও পৌঁছে গেছে। অনেক পর্ণমোচী গাছের পাতা ঝরে গেছে। সেসব গাছে নতুন পাতা আসেনি এখনও। অনেক গাছে আবার এসেওছে। আবার কিছু গাছ আছে আমাদের বন-পাহাড়ে যেসব গাছের পাতা কখনোই ঝরে না। তারা চিরসবুজ।

জঙ্গলে একা একা এমন করে হাঁটতে হাঁটতে নেশা লেগে যায় আমার এমন যে, মনেই থাকে না, বন কেবল সৌন্দর্যরই নয়, সেখানে নানারকম বিপদও আছে। কিন্তু সব বিপদকেই তুচ্ছ করতে ইচ্ছে যায়। সামনেই একদল ছাতারে পাখি ছ্যা ছ্যা করছে, কতগুলো পুটুস ঝোপের নীচে। পুটুসে ফুল এসেছে। গাঢ় কমলারঙা। নানারঙা পুটুসের ফুল ফলে যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে। এমনকী একই অঞ্চলেও। এর ইংরেজি নাম lantana। ভারতের প্রায় সর্বত্রই এবং সমুদ্রের সমতা থেকে হাজার দেড় হাজার ফিট অবধি এই ঝাড় দেখা যায়। এই পুটুস বা lantana-র ঝাড় চিতা বাঘ আর তিতির-বাটরের, এবং খরগোশেরও খাসা আস্তানা।

ছাতারেদের ডান দিকে রেখে একটি ছোটো টিলামতো ছিল সামনে, সেটাতে উঠে ভালো করে নজর করব চারদিকে ভাবলাম, ঠিক তখনই আমার নজর পড়ল একটি পথের উপরে। পায়ে-চলা পথ নয়। তার চেয়ে চওড়া। জিপের চাকার দাগও আছে। তবে সম্ভবত ট্রাক যায় না। অনেকদিন আগে যখন এই শালের জঙ্গলে coppicing felling হয়েছিল সম্ভবত তখন ঠিকাদারদের ট্রাক যাওয়া-আসা করত। এখন অনেক বর্ষাতে নানা আগাছার চারা জন্মে গেছে। জঙ্গল পুর্নদখল নিয়েছে তার জমিদারির। তবে চারাগাছগুলো কোথাও হাঁটুর চেয়ে বেশি উঁচু নয়। তা ঠেলে সহজেই জিপ যেতে পারে এবং হয়তো যায়ও। হয়তো চোরা শিকারিদের জিপ। রাতের বেলা আসে তারা চেকনাকা এড়িয়ে, ঘোরা-পথে।

সেই পথে নেমে এলাম আমি আস্তে আস্তে এবং নেমে আসার সঙ্গেসঙ্গেই চমকে উঠলাম। একটা মস্ত দাঁতাল শুয়োর, ওজনে প্রায় এক থেকে সোয়া কুইন্টাল হবে সেই পথের উপরে শুয়ে আছে পাশ ফিরে। যেন অপেক্ষাতে আছে, কেউ তাকে জম্পেস করে ঘুমুবার জন্যে একটি কোলবালিশ এনে দেবে বলে। পথের সেই জায়গাটি গভীর ছায়াচ্ছন্ন। একটু স্যাঁৎসেঁতেও। তার মানে, জল আছে কাছেপিঠে। ভাবছিলাম, খুব বড়ো দাঁতাল বলেই কি একা ছিল? শুয়োর তো দলেরই জীব, মানুষের মধ্যেও অনেক শুয়োরেরা যেমন সবসময়েই দলবেঁধে থাকে।

বন্দুকটা দু-হাতে ধরে এগিয়ে যেতেই এক বীভৎস দৃশ্য দেখলাম। কারও রাইফেলের গুলি লেগেছিল তার পেটে। সে কতখানি পথ যে দৌড়ে এসে শেষে এখানে পড়েছে আর চলতে না পেরে, তা জানা নেই, তবে তার নাড়িভুঁড়ির অনেকটাই পথেই পড়ে গেছে। আর কিছু জড়িয়ে-মড়িয়ে আছে এই বনপথের আগাছাতে। জায়গাটার মাথার উপরে চাঁদোয়া আছে বলেই শকুনদের নজরে পড়েনি এখনও। তারা দেখতে পেলে এতক্ষণে এখানে কামড়াকামড়ি খেয়োখেয়ি শুরু হয়ে যেত। মানুষদের মধ্যে যেমন শুয়োর আছে তেমন শকুনও আছে। সবাই যূথবদ্ধ। যারা একলা থাকে তাদের অসাধারণত্বকে ছিন্নভিন্ন করবার জন্যে তারা সদাই উদগ্রীব। একলা মাথা উঁচু করে চলা মানুষ বা একলা জানোয়ারকে তারা সহ্য করতে পারে না। হীনমন্যতাতে ভোগে সবসময়।

মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল। যেকোনো মৃত্যুই আমার মন খারাপ করে দেয়। তা সে কাচপোকার মৃত্যুই হোক, কি শুয়োরের!

জানি না, এইসব শিকারিরা কী ধরনের শিকারি। অত বড়ো দাঁতাল শুয়োরটাকে মাটিতে পায়ে দাঁড়িয়ে মারার সাহস তাদের নেই। আহত জানোয়ারের যন্ত্রণা যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব তা লাঘব করা যে প্রত্যেক শিকারিই কর্তব্য তা এরা নিশ্চয়ই মানে না। এইসব শিকারিরা জানোয়ারদের চেয়েও অধম।

শুয়োরটার ওপরে এখুনি জঙ্গলের বড়ো বড়ো নীল মাছি পড়বে। শয়ে শয়ে। ক্ষতস্থানে বসবে আর উড়বে। তাদের সকলের ডানার শব্দ দূর থেকে শুনলে মনে হবে যেন কোনো মোনো-ইঞ্জিন প্লেন, টাইগারমথ বা বনাঞ্জা উড়ছে, যে প্লেন চালিয়ে ফ্লাইংক্লাব থেকে ঋজুদার পাইলটের লাইসেন্স পেয়েছিল বহুদিন আগে।

শুয়োরটা পেরিয়ে সেই রাস্তা ধরে, ঋজুদার যেদিকে নেমেছে সেদিকেই আর কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখলাম একটি ছোটো নালা সেই বনপথটিকে আড়াআড়ি পেরিয়ে গেছে। নালাটি সম্ভবত আতারিয়া নদী থেকেই বেরিয়েছে। কালো ও খয়েরি নুড়ি, পাথর, খয়েরি রঙা কতকগুলো ফুলের ঝোপ নালাটার বুকের মাঝে মাঝে।

নামেই নালা। পায়ের পাতা ভেজে না এমন জল তিরতির করে বইছে। আর মাস খানেকের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

কী মনে হওয়াতে ভাবলাম, নালাটার পাশে পাশে কিছুটা এগোই। চল্লিশ-পঞ্চাশ মিটার যেতেই দেখি নালাটা ডান দিকে ঘুরেছে। Right angle turn মানে, ঋজুদার যেদিকে বাঘ বা প্রাণকুমারীর চিহ্ন খোঁজার কথা সেদিকে। ভাবলাম, ভালোই হল, ঘড়িতেও ততক্ষণে সোয়া এগারোটা বাজে। জঙ্গলে কোনো কিছু tracking করতে বাঘেরও যেমন সময় লাগে শিকারিরও লাগে। এক-পা থেকে আরেক পা যেতে দু-তিন মিনিট কেটে যায়। একেবারে নিঃশব্দে আড়াল থেকে আড়ালে চলতে হয়। ভাবছিলাম, মহুয়া টিলা পেরিয়ে নবীন পাতাতে ভরে যাওয়া সেই প্রাচীন কুসুম গাছটির দিকে যাওয়ার আগেই হয়তো ঋজুদার সঙ্গে এই সমতল বনভূমিতেই দেখা হয়ে যাবে।

নালার বালিতে নানা জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখলাম। একটি প্রকাণ্ড ময়াল সাপ খুব ধীরে ধীরে নদী পেরোল আমারই সামনে। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমি। প্রায় চার থেকে ছ-মিনিট নিল সে ওই অল্প চওড়া নালাটি পেরোতে। এবারে সামনেই একটা বাঁক নিয়েছে নালাটা। সেই বাঁকের মুখে গিয়ে যখন পৌঁছেছি ঠিক সেই সময়ে আমাকে ভীষণই চমকে দিয়ে হঠাৎ একজোড়া red turtle dove সেই বাঁকের মুখ থেকে প্রচণ্ড ভয়ার্তস্বরে ডেকে উঠে নীচু দিয়ে, প্রায় জমির সমান্তরালে উড়ে এল আমার দিকে। পরক্ষণেই আমাকে দেখে আরও ভয় পেয়ে, আরেকবার ডেকে অদৃশ্য হয়ে গেল পেছনে। ওই জাতের ঘুঘুদের অমন ব্যবহার করতে দেখিনি কখনো আগে আমাদের দেশের কোনো জঙ্গলেই। হতবাক হয়ে গেলাম। বাঁ-পাশে একটি বাদামি-কালোতে মেশা লম্বা লেজওয়ালা crow-pheasant একা একাই এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে আমাকে বা অন্যকিছু দেখে হঠাৎই ভয় পেয়ে বাঁ-দিকের গভীর নলিবাঁশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। কেন? কে জানে। আমার গা ছমছম করে উঠল। হতবাক হবার আরও বাকি ছিল আমার, যখন দেখলাম যে বাঁকের ওপাশ থেকে নালাতে যে জল বয়ে আসছে তিরতির করে, তাতে রক্ত মিশে আসছে। ফিকে গোলাপিরঙা। তার মানে, রক্ত যেখানে আছে সে জায়গাটা সামান্য দূরে। খুব কাছে হলে, জলের রং গাঢ় লাল বা লাল দেখাত।

আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিজ করে গেলাম। শুধু নিঃশব্দে বন্দুকটাকে দু-হাতে তুলে ধরে বুড়ো আঙুলটা সেফটি-ক্যাচের উপরে রেখে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠিক সেই সময়েই খপ করে একটা শব্দ হল অথবা চপ করে। কিছু কি খাচ্ছে বাঘ? বাঘই কি? কিন্তু কী খাচ্ছে?

বুঝলাম, যদি বাঘই হয়, তবে সে এখন গভীর মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। যাই খাক। বাঘ নাও হতে পারে। হয়তো চিতা। কিন্তু স্বাভাবিক বাঘ বা চিতা কেউই বেলা পৌনে বারোটার সময়ে সচরাচর মড়িতে যাবে না। তবে এটাও ঠিক যে, কোনো বাঁধাধরা নিয়মই খাটে না বনেজঙ্গলে। সবসময়েই ব্যতিক্রমের জন্যে তৈরি থাকতে হয়। বিশেষ করে মানুষখেকোদের বেলাতে।

ভেবে দেখলাম যে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিক দিয়ে নালার বাঁকে পৌঁছোতে গেলে যে মুহূর্তে আমি বাঁকে পৌঁছোব, সেই মুহূর্তেই বাঘ বা অন্য জানোয়ার আমাকে দেখে ফেলবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষাৎ যমদূত হয়ে উড়ে আসবে আমার উপরে। উল্কারই মতন। যাদের তেমন পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানেন যে সেই অভিজ্ঞতা মোটেই মধুর নয়।

কিছুক্ষণ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বন্দুক রেডি পজিশানে ধরে আমি খুবই আস্তে আস্তে পিছু হটতে লাগলাম। কিছুটা পিছু হটে এসে তারপর ডান দিকের ঘন পুটুসের ও নলি বাঁশের ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে নিশ্বাস বন্ধ করে খুব সাবধানে এগিয়ে গেলাম এমন একটি জায়গাতে, যেখান থেকে শব্দ যেখানে হয়েছিল সেই জায়গাটার দেখা পাওয়া উচিত। পিছু হটে তারপর এতটুকু পথ এক-পা, এক-পা করে এগোতেই আমার প্রায় পনেরো মিনিট সময় লেগে গেল।

আমার আন্দাজমতন জায়গামতো পৌঁছে আরও মিনিট দু-তিন দম নিলাম। তারপর একটি মস্ত শাল গাছের আড়াল নিয়ে আবার শামুকের গতিতে এগোতে থাকলাম। তার আগে দেখে নিয়েছিলাম যে, রোদটা আমার উলটো দিক থেকে আসছে। আমার ছায়া যেন বাঘ দেখতে না পায়, তাই। এদিক দিয়ে এগোলে আমার ছায়া বাঘ দেখতে পাবে না। তারপর সেখানে পৌঁছে শাল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পুরো শরীরটা লুকিয়ে রেখে চোখ দু-টি বের করে যা দেখলাম, তাতে আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল।

একটি মেয়ে, সেই নালার ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। পুরোপুরি উদোম। পিঠময় তার চুল ছড়ানো। কিছু চুল ছিঁড়ে গেছে। ডান পা-টি হাঁটু থেকে কেটে নিয়ে বাঘ তা চিবোচ্ছে। কটাং করে শব্দ হল এক বার। দেখলাম মেয়েটির পেছনের বাঁ-দিকটাও পুরো খেয়ে ফেলেছে। সেখানে কোনোই মাংস নেই আর। দগদগে লাল ক্ষত।

কিন্তু পরক্ষণেই আরও ভয় পেয়ে গেলাম দেখে যে, বাঘ হঠাৎই খাওয়া থামিয়ে আমার ডান দিকে মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখতে লাগল। দেখলাম যে, খুব বড়ো না হলেও বেশ বড়ো বাঘ। তার মুখে, গোঁফে মেয়েটির শরীরের লাল রক্ত লেগে রয়েছে। মনে হচ্ছে, এই মাত্র হোলি খেলে উঠেছে সে-বাঘ। ওই দৃশ্য দেখে আমার

গা বমি-বমি করতে লাগল। তবে বাঁচোয়া এই যে, বাঘ আমার দিকে না তাকিয়ে, অন্যদিকে, অন্যকিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে অথবা কোনো ভয়ে ভীত হয়েছে। তাই তার সব মনোযোগ সেইদিকেই।

আমার দিকে পুরো ব্রডসাইডে দাঁড়িয়ে আছে এখন বাঘ। আলো এসে পড়েছে ঝরো ঝরো শাল পাতাদের ফাঁকফোঁকর দিয়ে। বুক, গলা, মাথা সবই দেখা যাচ্ছে এবং বড়োজোর বারো থেকে পনেরো মিটারের মধ্যে। বুঝলাম, এই মোক্ষম মুহূর্ত। তখন আমি বাঘের এতই কাছে চলে গেছি এবং পায়ে হেঁটে যে, হয় আমি বাঘকে মারব, নয় বাঘ আমাকে মারবে। এসপার নয় ওসপার। আর কালক্ষেপ না করে আস্তে আস্তে আমি বন্দুকটাকে তুললাম, তারপর ট্রিগারে তর্জনী ছুঁইয়ে যেই ট্রিগার টানতে যাব, অমনি দাঁড়ানো বাঘ বসে পড়ল। ইংরেজিতে যাকে বলে crouching position। বাঘ এবারে লাফাবে। মানে, আক্রমণ করবে আমার জায়গা থেকে অদৃশ্য কোনো লক্ষ্যর উপরে। এই মুহূর্তেই লাফাবে আগুনের হলকার মতন। তার ল্যাজটা পিছনে লম্বা সোজা শক্ত হয়ে গেছে। আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। তাই আর এক সেকেন্ডও দেরি না করে ঋজুদার ওভার-আন্ডারটার যে ব্যারেলে লেথাল বল পুরেছিলাম সেটির ট্রিগার আগে টানলাম বাঘের ঘাড়ের সঙ্গে শরীরের সংযোগ যেখানে হয়েছে সেখানে এবং সঙ্গেসঙ্গেই অন্য ব্যারেলের এল.জি.ও. ফায়ার করে দিলাম ব্যারেলটাকে সামান্য ডাইনে ঘুরিয়ে বাঘের কান লক্ষ্য করে, বিহারে যাকে বলে 'কানপাট্টিয়ামে'।

বাঘের লাফানো আর হল না। মনে হল, সেও যেন ফ্রিজ করে গেল।

সেই বাঘের মাথাটি তার সামনের দু-পায়ের মধ্যে নেমে এল। ধীরে ধীরে চোখ দু-টি বন্ধ হয়ে এল।

গলা দিয়ে কুলকুচি করার মতন আওয়াজ উঠল মনে হল একটা। অতি সংক্ষিপ্ত। তারপর স্থির হয়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে সেই red turtle ঘুঘু-জোড়া যেমন করে উড়ে এসেছিল আমার দিকে, তেমন করে খুব নীচ দিয়ে উড়ে ডানায় সাট সাট শব্দ তুলে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে গেল। পরপর, প্রায় একই সঙ্গে হওয়া বন্দুকের গুলির শব্দে সারা বন গমগম করে উঠল। হনুমানেরা হুপ-হুপ-হুপ করে বড়ো বড়ো গাছের পাতাতে ঝুপ ঝুপ শব্দ করে ঝাঁপাতে লাগল। বাদামিরঙা বড়ো বড়ো হিমালয়ান স্কুইরেল উঁচু এ-গাছ থেকে সে-গাছে পাতায় পাতায় ঝরঝরানি তুলে চঁক চঁক আওয়াজ করতে লাগল।

মিনিট দুয়েক পরে বাঘটা যেদিকে লাফাতে যাচ্ছিল সেদিক থেকে আমাকে প্রচণ্ড চমকে দিয়ে ঋজুদার বলল, 'তুই আমার প্রাণ বাঁচালি আজ রুদ্র। ওই ব্যারেটা ওভার

আন্ডারটা তোকেই দিয়ে দেব। বাঘটা তো আমাকে শেষই করে দিত আজ। আমি বোধ হয় বুড়ো হয়ে গেছি।'

'তুমি এতক্ষণ আওয়াজ দাওনি কেন?'

'হতবাক হয়ে একটা পাথরে বসে পড়েছিলাম। বাঘ প্রাণকুমারীকে কোথায় ধরেছিল তা চোখে পড়ার পরে সেই trail-এর পিছু পিছু আসাতে ভেবেছিলাম যে বাঘকে আমিই দেখতে পারব আগে, ও আমাকে দেখার চেয়ে। বাঘকে অথবা মড়িকে। তাই তোর বিপদের কোনোই আশঙ্কা করিনি। তোর তো এদিকে আসার কথাও ছিল না। আশ্চর্য! এত কাছে এসেও আমি বাঘটাকে দেখতে পেলাম না!'

'কটাং করে হাড় ভাঙার আওয়াজও পাওনি?'

'না তো!' ঋজুদার হতভম্ব গলাতে বলল।

'আশ্চর্য! তোমার কানটা একবার কোনো ভালো E.N.T.-কে দেখাও।'

'ওটা কানের জন্যে হয়নি। যখন মৃত্যুর সময় আসে, মানুষ তখন অন্ধ এবং বধির হয়ে যায়। আমার মৃত্যু ট্যাঙ্গো নাচছিল আজ আমার সঙ্গে। তুইই বাঁচালি। সত্যিরে! আমি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছি।'

'বুড়ো না ছাই।' আমি বললাম। 'এখনও বুড়ো-হাড়ে ভেলকি দেখাও যখন তখন!'

তারপরই বললাম, 'আচ্ছা মেয়েটিকে বাঘ ধরেছিল কোথায়?'

ঋজুদার বলল, 'মহুয়া ঘেরা টিলাটার অনেকেই নীচে। বেচারির হয়তো পেটের গোলমাল হয়েছিল। নইলে, নালার দিকে আসতে যাবে কেন অতখানি নেমে। এই নালাটা আর মহুয়া টিলার মাঝামাঝি জায়গাতে আমি ওর ব্লাউজের রক্তমাখা একটা ফালি পাই। আরও একটা ভুল করেছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, বাঘ নিশ্চয়ই মড়িতে নেই এই অবেলায়। দূরে কোথাও আছে। যেমন সব মানুষখেকো বা গোরুখেকো থাকে সচরাচর।'

'তাহলে তোমার কনসার্ভেটরের থিয়োরিটা ভুল বলে প্রমাণিত হল। বলো?'

'না। আমারই ভুল। কনসার্ভেটর তো বইপড়া শিকারি। আজকালকার আর্ম-চেয়ার কনসার্ভেশানিস্টদের মতন। তারা অভয়ারণ্যর প্রায় পোষা বাঘ দেখেই ভাবেন সব জেনে গেছেন বাঘ সম্বন্ধে। যেহেতু একটিও kill এপাশে হয়নি সেইহেতু যে কখনো হবে না এমন ভাবাটাই পরম মূর্খামি হয়ে ছিল আমার পক্ষে। ওঁর মানুষখেকো বাঘের অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে, আমার তো ছিল!'

আমরা দু-জনে মহুয়া টিলার দিকে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলাম। প্রথমদিনেই যে কার্যসিদ্ধি হবে এ অভাবনীয় ছিল। নামবার সময়ে এক-পা, এক-পা করে নেমেছিলাম। ওঠবার সময়ে কোনোরকম সাবধানতার প্রয়োজনই ছিল না তাই

তাড়াতাড়িই উঠছিলাম। তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, আমার নাকেও সকালের খাঁটি ঘিয়ে ভাজা পরোটার গন্ধটা যেন উড়ে এল। খিদেও পেয়েছিল জব্বর।

ঋজুদার বলল, 'দুটো চার নম্বর ছররা আকাশের দিকে মুখ করে ছুড়ে আওয়াজ কর। ভটকাই আর ওরা এ গুলির শব্দ শুনতে পাবে পাহাড়ের উপর থেকে। ওরা না এলে, বাঘটা কোথায় আছে তা তাদের জানাব কী করে! পাঁচ-দশ গ্রামের মানুষ দেখতে আসবে তাদের যমকে।'

পরীক্ষা যেদিন শেষ হয় সেদিন যেমন হালকা লাগে, আমার তেমন মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে, ভালো পরীক্ষা দেবার পর।

তাই করলাম, মানে ঋজুদার যেমন বলল। তারপর একটি মোটা শাল গাছে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। ঋজুদার পাইপে নতুন টোব্যাকো ভরে পাইপ ধরাল।

কতক্ষণ আমরা সেখানে বসেছিলাম জানি না। সংবিৎ ফিরল হঠাৎ বন্দুক-হাতে ভটকাই আর তার পেছনে পেছনে চৈতুরাম পোর্তে এবং আরও জনা দশেক মানুষকে দেখে। তারা দৌড়োতে দৌড়োতে, লাফাতে লাফাতে আসছিল। এমনকী রূপকুমারীও।

ঋজুদার কাছে সংক্ষেপে প্রাণকুমারীর কী হয়েছে তা শুনে মুখিয়া চৈতুরাম পোর্তে ডুকরে কেঁদে উঠল।

ঋজুদার রূপকুমারীকে বলল, 'তোমরা মেয়েরাই যাও ওখানে আগে, একটি শাড়ি নিয়ে। প্রাণকুমারীকে ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসো অথবা ওখানেই দাহ করার বন্দোবস্ত করো। ওর আপনজন তো তোমরাই! ছেলেরা পরে বাঘটা বয়ে আনবে।'

রূপকুমারী বলল, 'না না জঙ্গলে দাহ করব না। তা ছাড়া ওকে তো দাহ করা যাবেও না। অপঘাতে মৃত্যু। ওকে আমরা আমাদের কবরস্থানে কবর দেব।'

ভটকাই তক্ষুনি বাঘটা দেখতে পারছিল না বলে হাত কামড়াচ্ছিল। ঋজুদার বলল, 'আগে মেয়েরা যাক। মরে গেলেও কি লজ্জা যায় মানুষের। মেয়েটা ভারি লজ্জা পাবে। এখন যাস না। আমাদের নেহাত না গিয়ে উপায় ছিল না, তাই!'

চৈতুরাম তখনও হাউ হাউ করে কাঁদছিল।

আমি ভাবছিলাম, মানুষের বাইরের চেহারা দেখে কখনো কারওকে বিচার করাটা উচিত নয়। ও হয়তো মেয়েরই মতন ভালোবাসত প্রাণকুমারীকে। কিন্তু কী করবে? সমাজ। জাতপাত! ও যে আবার মুখিয়া!

এইজন্যেই আমি শুয়োরই হোক কি মানুষই হোক, কাউকেই পছন্দ তো করিই না, রীতিমতো ঘেন্না করি, যারা দলে থাকে তাদের। সমাজও একটি মস্ত দল। সমাজে যারা থাকে তারাও আস্তে আস্তে তাদের অজানিতে যূথবদ্ধ জানোয়ারের মতনই হয়ে যায়। বোধ হয়।

ঋজুদার বলল, 'ওরে ভটকাই। আতারিয়া বাংলোয় গিয়ে বল সব খাবারদাবার এখানেই নিয়ে আসতে। গরম করা তো প্রবলেম নয় কোনো। আজ এই মহুয়া টিলাতেই খাব। কাল তো অচানক মার থেকে চলেই যাব।'

'কালই চলে যাব? তাহলে জঙ্গল তো দেখাই হবে না। আমার কী হবে? অচানক মার-এর বাঘও তুমি মেরে দিলে। আমার কি কোনোই কনট্রিবিউশান থাকবে না?'

'থাকবে।'

'দাও তোমার পা-টা একটু টিপে দিই ঋজুদা।'

ঋজুদার দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, 'আমার নয়, আমার নয়। পা টেপ তোর জানি-দুশমন রুদ্র রায়ের।'

'কেন?'

'বাঘটা ওই মেরেছে। শুধু মারেইনি, আমার প্রাণও বাঁচিয়েছে ও আজ নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে।'

'নিনিকুমারীর বাঘের হাত থেকে যেমন বাঁচিয়েছিল?'

'ইয়েস! কিন্তু এখন তুই কী করবি?'

'যাই করি, বাজে লোকের পা আমি টিপব না। আমার ইনিংসও আসবে। এক মাঘে শীত যায় না!' ভটকাই বলল, ভটকাইসুলভ গলাতে।

নানা পাখি ডাকছিল চৈত্রর আগুয়ান সকালে, চারধার থেকে। নববর্ষের সময়ে এইসব বন-পাহাড়, কচি-কলাপাতারঙা জমির শাড়িতে সেজে উঠবে। নানারঙা পোলকা ডট থাকবে সে শাড়িতে।

যখন আমার খুবই আনন্দ হওয়ার কথা ছিল, গর্বিত হওয়ার কথা ছিল, ঠিক তখনই প্রাণকুমারীর জন্যে মনটা দুঃখে ভরে গেল।

ভাবছিলাম, ঋজুদা, আমি আর ভটকাই ক-টা মানুষখেকোই-বা মেরেছি বা মারতে পারব। এই জাতপাত-এর মানুষখেকোদের যতদিন না নির্মূল করা যাচ্ছে, ততদিন হাজার হাজার প্রাণকুমারীরা আমাদের অজানিতেই নিরুপায় হয়ে নিয়তই মারা যাবে। আর সেই সব মৃত্যুর কতই-বা রকম!

ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গিবনে

'বহুদিন পরে এলাম রে। ভারি ভালো লাগছে। জানিস।' ঋজুদার বলল।

আমি বললাম, 'কত বছর পর?'

'এই বাংলোতে? তা প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর হবে। যদিও এর আশেপাশে এসেছি পনেরো বছর আগেও।'

ভটকাই বলল, 'জায়গার কী নাম রে বাবা! বাঘ্যমুন্ডা। বাঘের মাথা নাকি?'

'দারুণ নাম। যাই বলিস। আরও দারুণ নাম আছে। বাঘ্যমুন্ডা। মানুষখেকো বাঘে-খেকো মানুষদের নাম, যারা ভূত হয়ে যায়। কালাহান্ডি জেলাতে।' ঋজুদার বলল।

আমরা শুনে হেসে উঠলাম সকলে।

'এই বাংলোতে আমি একবার শীতকালে ছিলাম। তার আগের বছরই আমাদের বিশেষ পরিচিত মানিক, মানিক দাস, সুধীররঞ্জন দাসমশায়ের ছোটো ছেলে, টেস্ট-পাইলট সুরঞ্জনদার ছোটো ভাই, এই বাংলোতে ছিলেন সপরিবারে। ঢেনকানল রাজ্যের নিনিকুমারও। মানিকবাবু এখানেই মারা যান।'

'বাঘের হাতে?' তিতির উৎকণ্ঠিত হয়ে শুধোল।

'না। যদিও সেই বছরই একটি বড়ো বাঘ মেরেছিলেন মানিকবাবু এবং এই বাংলোতেই। সামনের ওই গাছ দুটোতে টানা দিয়ে তার চামড়া ছাড়ানো হয়েছিল রাতের বেলা হ্যাজাকের আলোতে, কিন্তু বাঘের হাতে মারা যাননি।'

'তুমি জানলে কী করে কোন গাছটাতে টানা দিয়েছিল?' ভটকাই শুধোল।

'আমিও যে এসেছিলাম সে বছরে। তবে বাঘ্যমুন্ডাতে ছিলাম না। ছিলাম, অংগুল শহরে। কটকের সুরবাবুদের বাড়িতে। সম্বলপুরে যে পথ চলে গেছে অংগুল হয়ে,

সেই পথের উপরে তাঁদের বাড়ি।'

'তাহলে? জানলে কী করে বাঘ মারার খবর?'

'অংগুলের ফরেস্ট কনট্রাকটরদের মুখে খবর পেয়েই জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল সকলে মিলে মানিকবাবুকে কনগ্রাচুলেট করতে। গিয়ে দেখি ড্রেসিংগাউন পরে বাংলোর হাতায় বাঘের চামড়া ছাড়ানোর তদারকি করছেন মানিকবাবু আর নিনিকুমার। মানিকবাবুর স্ত্রী ও দুই মেয়েও ছিলেন। মানিকবাবুর স্ত্রী ছিলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের ইনস্পেকটর জেনারেল শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকারের কন্যা। সুরঞ্জনদা এবং সরকারসাহেব আমাদের প্রথম যৌবনে টালিগঞ্জের গলফ ক্লাব রোডের রাইফেল ক্লাবে আসতেন মাঝে মাঝেই। অনিল চ্যাটার্জি আসতেন। মহিষাদলের শক্তিপ্রসাদ গর্গ। জোর আড্ডা ছিল তখন।

'সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। বাংলোর সামনে একটু দূরে কুয়ো। বাঘ্যমুন্ডা। বস্তির মেয়েরা সন্ধ্যের আগে জল ভরে নিচ্ছিল রাতের মতো। ঘড়া-কলসির ধাতব আওয়াজ ভেসে আসছিল। এ অঞ্চলে অনেক গাছ আছে, যেগুলোকে দেখলে মনে হবে তাল বা ইংরেজি পাম গাছ, কিন্তু আসলে এগুলো অন্য গাছ। লেসার ইন্ডিয়ান হর্নবিলসরা জোড়ায় জোড়ায় ডানা না নাড়িয়ে গ্লাইডিং করে ভেসে যাচ্ছিল পশ্চিমের আকাশে। অস্তগামী সূর্যের লাল আলোতে মোহময় গা-ছমছমে দেখাচ্ছিল পাহাড়শ্রেণি আর গভীর জঙ্গলের রেখাকে। এই অঞ্চলে হাতি ও গাভর (ওড়িয়া নাম গন্ব) প্রচুর আছে। বাঘও আছে।'

ভটকাই আঙুল তুলে তাল গাছের মতো গাছগুলোকে দেখিয়ে বলল, 'কী গাছ ওগুলো ঋজুদা?'

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে অ্যাশট্রেতে রেখে ঋজুদার বলল, 'এগুলোকে বলে সলপ্য গাছ। এর ফল থেকে স্থানীয় লোকেরা তাড়ির মতো একরকম পানীয় তৈরি করে। তার ক্রিয়া একেবারে মারাত্মক। আমি একবার দশপাল্লার বিড়িগড়ে, খন্দদের বাসভূমিতে (খন্দমাল-এর অন্তর্গত) ক-জন খন্দকে দেখেছিলাম এই সলপ্য রস খেয়ে শাল পাতাদের তাস করে বড়ো একটা শাল গাছের তলায় বসে তাস খেলছে। খেলতে খেলতে হঠাৎ একজনের মনে হল অন্যজন জোচ্চুরি করছে। আর যায় কোথায়? সঙ্গেসঙ্গে টাঙ্গির এক কোপে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিল বেচারির। নিরুপায় সাক্ষী হিসেবে পরে থানা-পুলিশের ঝকমারিও কম পোয়াতে হয়নি।'

তিতির বলল, 'দুর্গা মহান্তি আর রাজেনদা কিন্তু এখনও ফিরল না।'

চিন্তিত গলায় ঋজুদার বলল, 'তাই তো দেখছি। তবে এতক্ষণে এবিকাকু আর ফুটুদাদেরও তো ফেরা উচিত ছিল। গাড়ি বা জিপ খারাপ হল নাকি?'

'ক-ঘণ্টা লাগবে কটক থেকে আসতে?' ভটকাই শুধোল।

'আজকাল এমন চমৎকার সব রাস্তা হয়ে গেছে। তখন অনেকক্ষণই লাগত। সময় লাগছে আসলে ফুটুদার জন্যে। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও যেমন ধান ভানে, ফুটুদাও তাই। ঠিকাদার মানুষ। ফেরার পথে চৌদুয়ার, হিন্দোল, ঢেনকানল, অংগুল সব জায়গাতেই একবার করে থামতে থামতে আসবে তো!'

তিতির বলল, 'ফেরার সময় পম্পাশরের মোড় থেকে দুর্গা মহান্তি আর রাজেনদাকে তুলে আনতে ভুলে যাবেন না তো!'

'ওরা ভুললে কী হবে, দুর্গা মহান্তিরা পথের উপরেই বসে থাকবে হয়তো। নইলে অন্ধকারে পুরুনাকোটের মুখ থেকে বাঘ্যমুন্ডা অবধি হেঁটে আসার সাহস পাবে না ওরা। এখানে হাতি খুব।'

ভটকাই বলল, 'ওদের এত সাহস আর এতেই ভয় পাবে?'

'জঙ্গলের মানুষেরা যতই সাহসী হোক, রাত নামার পর তারা ঘরের বাইরে বেরোয় না। অবশ্য শিকারে গেলে আলাদা কথা। কিন্তু শিকার তো এখন বন্ধই বলতে গেলে। খালি হাতে, বাতি ছাড়া অন্ধকারের পর কারও বনে-জঙ্গলে চলাফেরা করা উচিত নয়।'

'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো করতেন।' তিতির বলল।

'তিনি সাধকপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তা ছাড়া জঙ্গলের সমস্তরকম ভয় সম্বন্ধে উনি হয়তো সচেতন ছিলেন না। নয়তো সচেতন থেকেও হয়তো গ্রাহ্য করতেন না। ওঁর কথা আলাদা।'

'আর তুমি?'

ঋজুদার হেসে বলল, 'আমার কাছে তো মন্ত্রগুপ্তি আছে।'

'বাজে কথা।' ভটকাই বলল।

এই ভটকাইকে নিয়ে আমরা সকলেই মহা ঝামেলায় পড়েছি। ঋজুদাকে ও মোটেই মান্যগণ্য করছে না। ঋজুদার সঙ্গে নিনিকুমারীর বাঘ মারতে গিয়ে কাগা-বগা-না-মারা শিকারি বাঘিনি দিয়ে অ্যাকাউন্ট ওপেন করার পর থেকেই ভটকাইবাবাজির বোলচাল আরও তেজ হয়েছে। একে নিয়ে আমরা সমস্তক্ষণ টেনশনে ভুগি। ঋজুদার হাসিই দেখেছে। রাগ তো দেখেনি!

নকুল ভেতর থেকে চা নিয়ে এল আমাদের জন্যে, সঙ্গে মুচমুচে করে ভাজা বড়ো নিমকি, আলুর ঝাল তরকারি আর লেবুর আচার। তিতির চা খায় না। দুগ্ধপোষ্য শিশু। তার জন্যে গ্লাসে করে দুধ।

ঋজুদার বলল, 'যাই বলিস তিতির, পশুরাজ্যেও কিন্তু বড়ো হয়ে ওঠার পর দুধ খাওয়ার রেওয়াজ নেই। মানুষেরা কেন যে এই বদভ্যাস ছাড়ে না, ভেবে পাই না।'

ঋজুদার কথায় আমরা হেসে উঠলাম।

তিতিরও হাসল। তারপর বলল, 'কথাটা ভাববার মতো। কিন্তু পশুদের মায়েরাই যদি না দেয়, তাহলে বেচারিরা দুধ পাবে কোত্থেকে!'

'এটাও একটা ভাববার মতো কথা।' ঋজুদার বলল।

ঋজুদার কথা শেষ হতে-না-হতে বাংলোর চওড়া বারান্দায় যেখানে আমরা বসে ছিলাম, তার বাঁ-দিক থেকে হাতির বৃহংণ ভেসে এল। গরমের দিন। সূর্য ডোবার পরে হাওয়া যেন পাগল হয়ে উঠেছে। বনময় ঝরা পাতা, লাল ধুলো এবং ঝরা ফুল ঝাঁট দিয়ে বেড়াচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে। দুটো প্যাঁচা বাংলোর পেছনের মিটকুনিয়া গাছ থেকে প্রচণ্ড জোরে উড়ে উড়ে ঝগড়া করতে করতে ঘুরে ঘুরে দূরে চলে গেল কুয়োটার কাছে।

ভটকাই আধখানা নিমকি মুখে দিয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, 'টেনশান।'

'কেন? হাতি?'

'না রে। যদি প্যাঁচা দুটো কুয়োয় পড়ে যায় তা হলেই কেলো। বল?'

ভটকাইয়ের ভাবনাচিন্তার রকমটাই এরকম। আর যাই হোক, কেউই ওর অরিজিনালিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবে না।

এমন সময় দূর জঙ্গলের মধ্যে জিপের ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। পুরানাকোট আর টুল্বকা যাওয়ার মোড়ের কাছ থেকে এলে পুরানাকোট থেকে বাঘ্যমুন্ডায় আসার রাস্তাটা সমতল। বরং পুরানাকোটের নতুন ফরেস্ট বাংলো যেদিকে, সেদিকের পথে বোস্টম নালাকে পাশে রেখে এলে কিছু চড়াই-উতরাই পড়ে। তবু এ-রাস্তাটিতে অনেক বাঁক আছে। জিপ টপ গিয়ারে দিয়েই আবার থার্ড গিয়ারে দিচ্ছেন ফুটুদা। ইঞ্জিনের শব্দে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ঋজুদার গাড়ি চালাচ্ছে ফুটুদার ড্রাইভার।

'এল ওরা।' ভটকাই বলল।

'দেখা যাক, এখন গ্রেট দুর্গা মহান্তি কী সংবাদ নিয়ে আসে আমাদের জন্য।' ঋজুদার বলল। দুপুরের পর থেকেই আমরা ওদের পথ চেয়ে ছিলাম। সকাল আটটাতে লবঙ্গি থেকে আট-দশজন লোক পায়ে হেঁটে এসে পৌঁছেছিল হাতির খবর দিতে। ঋজুদার বলেছিল দুঃখ করে, 'আমার কপালে পৃথিবীর কোনো জঙ্গলেই অবিমিশ্র ছুটি কাটানো নেই। এসেছিলাম তোদের নিয়ে মহানদীর দু-পাশের জঙ্গলকে নতুন করে দেখতে, তোদের চেনাতে, তা না দেখ, মাত্র একদিন কাটতে-না-কাটতেই এই বিপত্তি!'

লবঙ্গির মানুষেরা অনেক কাকুতিমিনতি করল। হাতিটাকে 'রোগ' ডিক্লেয়ার করা হয়েছে জেলা কর্তৃপক্ষ থেকে। মারার চেষ্টাও করেছেন ভুবনেশ্বর ও কলকাতার দু-জন শিকারি। মরগুলের ডি.এফ.ও.-ও ঋজুদাকে অনুরোধ করেছেন। লবঙ্গির

লোকেদের সঙ্গে পম্পাশরের লোকও ছিল পাঁচ জন। হাতিটা নাকি পম্পাশরেও এসে ঝামেলা করেছে। মানুষ মেরেছে এ পর্যন্ত পাঁচ জন। তিন জন পুরুষ। দু-জন মেয়ে। বাড়িঘর ভেঙেছে অগুনতি। গোরু-মোষ আছড়ে মেরেছে কুড়িটা।

ওরা বড়ো গরিব যে, তা মনে হল ওদের জামাকাপড় আর চেহারাতেই। ঋজুদার এসেছে যে বেড়াতে, সে-খবর ডি.এফ.ও.সাহেবের অফিস থেকে ফরেস্ট গার্ডই এনে ওদের দিয়েছে কাল। বাস সার্ভিস আছে অংগুল থেকে পম্পাশর হয়ে, পুরানাকোট হয়ে। সেই বাস চলে যায় মহানদীর পারে টিকরপাড়াতে। তারপর টিকরপাড়াতে বাঁশের ভেলাতে মহানদী পেরিয়ে ওপারে নানান জায়গায়। বৌঠ, ফুলবানি, দশপাল্লা ইত্যাদি জায়গাতে।

'ঋজুদার উপরে সকলেরই যেমন ডিম্যান্ড দেখছি তাতে মনে হচ্ছে এ যাত্রা আমাদের ফ্যামিলিয়ারাইজেশান টুরের এখানেই ইতি।' তিতির সখেদে বলল।

ফুটুদারা এসেই বললেন, 'চান করতে ঢুকছি। সারাদিন গাড়িতে একেবারে ঝলসে গেছি।'

'সারাদিন মানে?'

'ওই হল। কটক থেকে বেরিয়েছিলাম খাওয়াদাওয়ার পর। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর গরম আরও বেশি লাগে।' এই কথা বলেই ফুটুদা বাথরুমে চলে গেলেন।

এবিকাকুও অন্য বাথরুমে।

ফুটুদার পাখির আহার। তবে এবিকাকু ঋজুদার সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে খেতে পারেন, যখন খান। আর পদেরই-বা কী রকমারি!

দুর্গাদা আর রাজেনদা মালপত্র সব নামিয়ে-টামিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিল কুয়োতলায়, তারপর বারান্দায় এল।

ঋজুদার বলল, 'চা-টা খেয়ে তারপরেই এসো। তারপরে শুনব। তোমাদের কাহিনি তো আর ছোটো হবে না।'

ওরা চলে গেলে ঋজুদার বলল, 'মুখ-চোখ দেখে মনে হল, এখানের ক্যাম্প তুলে আমাদের লবঙ্গিতেই যেতে হবে কাল-পরশু।'

'কী করে বুঝলে?'

'বুঝলাম। অনেক বছরের সঙ্গী এরা। কিছু তো বুঝব মুখ-চোখ দেখে।'

ভটকাই বলল, 'হাতি কী যে মারে লোকে! অত বড়ো জানোয়ার। তাকে মারতে আর বাহাদুরি কী? ওর চেয়ে তো স্নাইপ মারা সোজা।'

ঋজুদাকে এমন করে বলল ও, তাতে আমি বললাম, 'ফ্লুক-এ একটা বাঘ মেরে দিয়ে তোর বোলচাল খুব বেশি হয়েছে।'

ঋজুদার বলল, 'হাতি রোগ হয়ে গেলে তার মতো সাংঘাতিক জানোয়ার খুব কমই আছে। এ তো দলের হাতি নয় যে, ধীরেসুস্থে ভালো ট্রফি দেখে ভালো করে এইম নিয়ে নিজে অ্যাডভেনটেজাস পজিশন বেছে নিয়ে ভাইটাল জায়গা দেখে গুলি করলি আর পড়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গে অন্যান্যরা হুড়মুড় করে পালিয়ে গেল। রোগ হাতিকে তোর খুঁজতে হবে না, সেই তোকে খুঁজে বের করবে। অতবড়ো জানোয়ার চড়াই-উতরাই সব জায়গাতে যে কী, জোরে দৌড়োতে পারে আর কতখানি নিস্তব্ধ হয়ে নিঃসাড়ে জঙ্গলের মধ্যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তা যার অভিজ্ঞতা নেই সে বুঝতেও পারবে না। হাতি-শিকার সকলের পক্ষে সহজ নয়। হাতি সম্বন্ধে জ্ঞানও বেশি লোকের নেই।'

আমি বললাম, 'ঋজুদা লালজির কথা বলো। ওরা জানে না।'

'অসমের গৌরীপুরের ছোটোকুমার লালজির সমস্ত জীবনই কেটেছে হাতিদের সঙ্গে। ওঁর মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে একটি জ্ঞানভাণ্ডার মুছে গেল। অথচ আমাদের এমনই দেশ যে ওঁকে নিয়ে কোনো ডকুমেন্টারি ছবি অথবা একটি টেলি-ফিলমও হল না। ভাবলেও দুঃখ লাগে।'

'নাম কী ছিল ওঁর?'

'ভালো নাম প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া। ডাক নাম লালজি। হাতি মারতেন না উনি, হাতি ধরতেন, হাতি খেদিয়ে বেড়াতেন। বাংলা চলচ্চিত্রজগতের প্রথম দিকের (সাইলেন্ট পিকচারের সময় থেকেই) একজন দিকপাল প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার ছোটো ভাই হলেন লালজি। কলকাতায়ও কয়েকজন ভালো হাতি-শিকারি আছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ও আছে। যেমন, ধৃতিকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী, জর্জ টুন এবং চঞ্চল সরকার। চঞ্চলের সঙ্গে রোহিতও যায়। চঞ্চল যত রোগ হাতি মেরেছে, তত খুব কম শিকারিই মেরেছেন। ওর বাড়িতে একদিন নিয়ে যাব তোদের। এলিয়ট রোডে থাকে। হাতির দাঁত আর পায়ের কালেকশান দেখে অবাক হয়ে যাবি। ধৃতিকান্তবাবু অধ্যাপক, বরেন্দ্রভূমের নামি জমিদার বংশের ছেলে। চেহারাটিও চমৎকার। চঞ্চল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের বড়ো ঠিকাদার। আর জর্জ হল নামকরা ডেনটিস্ট। ওর বাবার পসার পেয়েছে ও। বাবা ছিলেন অসমের চা-বাগানগুলোর ডেনটিস্ট। এক বাগান থেকে অন্য বাগানে তখনকার দিনে মোষের গাড়িতে করে ঘুরে ঘুরে রোগী দেখতেন। জর্জ শিশুকাল থেকেই বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে শিকারি হয়েছিল।'

'ওঁদের মধ্যে ডাকবে নাকি কাউকে?'

'যদি তেমন দেখি, আমার দ্বারা যদি এই হাতি মারা না হয়, তবে ওঁদেরই কাউকে খবর পাঠাতে হবে শেষ পর্যন্ত।'

তিতির বলল, 'তুমি যদি হাতির পেছনেই ঘুরে বেড়াও তাহলে আমাদের তো এ যাত্রায় মহানদীর দু-পাশের জঙ্গল দেখাই হবে না। পনেরো দিনের জন্যে আসা, তার মধ্যে তো চার দিন চলেই গেল।'

'দেখি। তিন দিন সময় দেব। না পারলে আমরা চলে যাব, ওঁদেরই কাউকে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানাতে বলব অংগুলের ডি.এফ.ও.সাহেবকে, এবং ডিভিশনাল কমিশনারকেও।'

'রোগ হয়ে যাওয়া মানে কী ঋজুদা? এ কি কোনো রোগ?' ভটকাই শুধোল।

ঋজুদার হেসে উঠল ভটকাইয়ের কথা শুনে।

আমরাও হাসলাম।

তিতির বলল, 'না হে বোকামশায়। রোগ মানে গুন্ডা। শুধু হাতিই নয়, যে-সমস্ত জানোয়ার যূথবদ্ধ, মানে দলে থাকে, তাদের প্রত্যেক দলে একজন করে সর্দার থাকেই। হাতি, গাউর (ইন্ডিয়ান বাইসন), শম্বর, বারাশিঙা, চিতল ইত্যাদি জানোয়ারেরা দলে থাকে। যা বললাম, তাদের প্রত্যেক দলে একজন করে সর্দার থাকে। সর্দার সবসময়েই পুরুষ হয়। মানুষের মেয়েরাও হতে পারেন, যেমন ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন। সেকথা ভাবলে মনে হয়, জানোয়ার না হয়ে মানুষ হওয়াতে খুব বেঁচে গেছি। যাই হোক, দলে যখন কোনো উঠতি যুবক বলশালী হয়ে ওঠে, তখন দলের সর্দারি নিয়ে সর্দারের সঙ্গে তার খিটিমিটি লাগে। তারপর একদিন এক চূড়ান্ত লড়াই বা ডুয়েল হয় তাদের মধ্যে।'

'একদিন বলিস না তিতির।' ঋজুদার বলল।

'ঠিক বলেছ। ওই লড়াই একদিন আরম্ভ হয় ঠিকই, কিন্তু তা যে একদিনেই শেষ হয় এমন নয়। কখনো কখনো চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। কখনো সর্দার জেতে, কখনো-বা উঠতি-সর্দার। কখনো লড়াই শেষ হয় অন্য পক্ষের মৃত্যুতে। এক পক্ষ মরে গেলে ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু যখন এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাছে সেই সাংঘাতিক লড়াইয়ে হেরে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েও বেঁচে যায়, তখনই বিপদের সূত্রপাত হয়। সে শরীরের ক্ষত নিয়ে, মনের জ্বালা নিয়ে, জঙ্গলের গভীরে গিয়ে, প্রথমে বিশ্রাম নিয়ে তার ক্ষতগুলি সারিয়ে নিতে চায়। সুস্থ হয়ে গেলেও অনেক সময়ই সম্পূর্ণ সুস্থ হয় না। তবে কোনো কোনো সময় হয়ও। কিন্তু সে যে দল-তাড়িত, অপমানিত সেকথা সে ভুলতে পারে না। অনেক সময় ক্ষতবিক্ষত অবস্থাতেই মানুষের বা গোরু-মোষের বা যানবাহনের কাছাকাছি এলে সে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে। মানুষকে মেরে ফেলে।

'হাতির কবলে পড়ে যাদের মৃত্যু হয়, বাঘ বা ভাল্লুকের হাতে মৃত্যুর চেয়েও তা বীভৎস। মানুষকে তালগোল পাকিয়ে দেয়। মুখ ঢুকে যায়, হাত-পা ঢুকে যায় পেটের

মধ্যে। কখনো শুঁড়ে জড়িয়ে নিয়ে দূরে ছুড়ে দেয়। কখনো-বা আছাড় মারে। তারপরও পা দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে রাগ মেটায়। মানুষের বাসস্থান চালাঘর ভেঙে তছনছ করে দেয়। ছাদ-চাপা পড়ে মরে মানুষ। গোরু-মোষের অবস্থাও সেরকমই করে। জিপ গাড়ি বা গাড়ি ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে দেয় বা দুমড়ে-মুচড়ে তাদের, তোমার ভাষায় বলতে গেলে জিয়োগ্রাফিই পালটে দেয়। বাস বা ট্রাকও গুন্ডা হাতির সামনে পড়ে গেলে রেহাই পায় না। মানুষখেকো বাঘের হাত থেকে না হয় শক্তপোক্ত ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে বাঁচা যায়, কিন্তু হাতির বাসস্থান যেরকম জঙ্গল-পাহাড়ঘেরা এলাকাতে হয়, তা ভারতের বা আফ্রিকারও যেকোনো অঞ্চলেই হোক-না-কেন, পাকা বাড়ি প্রায় কোথাওই থাকে না। সেইসব গ্রামাঞ্চলের বাড়ি নামেই বাড়ি। তাই হাতির হাত থেকে ঘরে থেকেও তাদের বাঁচার উপায় থাকে না।

'দিন-রাতের কোন সময় যেকোনো গ্রামে গুন্ডা উপস্থিত হবে, তাও আগে থেকে বলা যায় না। রোগ হাতির আতঙ্ক সাংঘাতিক আতঙ্ক। তা ছাড়া বাঘ-ভাল্লুককে গ্রামের লোকেরা যথেষ্ট সাহসী হলে বিষমাখানো তির বা বল্লম দিয়ে মারলেও মারতে পারে, কিন্তু হাতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে এমন কোনো অস্ত্রই ওদের নেই। রাতের বেলা হলে হাতিকে আগুন দেখিয়ে ভয় দেখায়। কিন্তু যে হাতি রোগ হয়ে গেছে, তার মনে এত জ্বালাযন্ত্রণা থাকে যে, তার মৃত্যুভয়ও লোপ পেয়ে যায়।'

ঋজুদার তিতিরকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তোদের মনে আছে তিতির, সিমলিপালের জেনাবিল বাংলোর সামনে তিন-চারশো গজ দূরে একটি হাতির কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেছিলাম আমরা?'

আমি আর তিতির একসঙ্গে বলে উঠলাম 'মনে আছে।'

'তাহলে তোদের এও মনে আছে যে, জেনাবিল বস্তির লোকেরা বলেছিল যে, কোনো দলের সর্দার আর উঠতি-সর্দারের মধ্যে লড়াইয়ের ফয়সালা হয়েছিল ওখানে।'

'হ্যাঁ, বলেছিল।' তিতির বলল।

'হাতিদের খুব বুদ্ধি হয়, না?' ভটকাই শুধোল।

'হাতির বুদ্ধির নানারকম গল্প শোনা যায়। সত্যিই বুদ্ধিমান প্রাণী হাতি। লালজিকেও আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম।'

'কোথায়?'

'তখন উনি উত্তরবাংলার গোরুমারা অভয়ারণ্যের কাছে মূর্তি নদীর পাশে তাঁর একটি গণেশ এবং একটি মাকনা হাতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে ক্যাম্প করছিলেন বুনো হাতি খেদিয়ে দেবার কড়ার নিয়ে।'

'কী বলেছিলেন লালজি?' আমি শুধোলাম।

ঋজুদার হেসে বলল, 'লালজি বলেছিলেন, হাতির যদি এতই বুদ্ধি থাকত, তাহলে সে তো ডি.এফ.ও.-ই হত।'

আমরা সবাই হেসে উঠলাম ওই কথাতে।

এমন সময় দুর্গাদা আর রাজেনদা বারান্দায় এসে উঠল। ওদের পায়ের তলাটা কর্কশ হয়ে গেছে শিশুকাল থেকে, শীত-গ্রীষ্ম পাহাড়-জঙ্গলে হেঁটে হেঁটে। সিমেন্ট-বাঁধানো বারান্দায় খসস খসস শব্দ হল।

ঋজুদার বলল, 'দুর্গা, এই হারিকেনটা ভিতরে নিয়ে যাও তো। নবমীর চাঁদটা কী দারুণ উঠেছে পাহাড়ের রেখা আর ঘন বনকে আলো করে, আর এই হারিকেনের আলো চোখের উপর পড়াতে তা দেখা পর্যন্ত যাচ্ছে না।'

রাজেন বিড়বিড় করে বলল, 'এটি সাপপ অচ্ছি, গণ্ডা গণ্ডারে।'

'কঁড় সাপপ।' ঋজুদার বলল।

'কঁড় সাপপ নাহি আঁইজ্ঞা। তম্ন সাপপ অছি জুড়ে।'

মানে, কী সাপ নেই তাই বলুন। একজোড়া শঙ্খচূড় সাপও আছে।

ঋজুদার বলল, 'হউ! সাপপ মানে আচ্ছি তাংকু মনেরে, তম্বে কাঁই কাটিবাবু আসিবি সে। হ, হ, নেই যা দুর্গা, সে বত্তিটা।'

মানে হল, হোক। সাপেরা আছে তাদের মনে, খামোকা আমাকে কামড়াতে আসবে কেন?

বাতি নিয়ে যাবার পর নবমীর রাত যেমন স্পষ্ট উজ্জ্বল হল, নির্জনতাও যেন বেড়ে গেল। কলকাতায় লোডশেডিং হয়ে গেলেই নির্জন হয়ে যায় শহর। সেটা অবশ্য লক্ষ লক্ষ ফ্যান আর হাজার হাজার এয়ারকন্ডিশনারের শব্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যও হতে পারে। কিন্তু আলোর সঙ্গে শব্দের কোনো আপেক্ষিক সম্পর্ক আছে কি নেই এ নিয়ে গবেষণা হওয়া বোধ হয় দরকার। সম্পর্ক যে আছে এই কথা কোনোদিন কোনো বিজ্ঞানী হয়তো প্রমাণও করবেন। কে জানে!

ঋজুদার বলল, 'কঁড় দেখিলি দ্বি-জনে লবঙ্গি যাইকি, ক'। শুনিবি।'

গলা খাঁকরে নিয়ে দুর্গাদা আর রাজেনদা একসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল।

'আররে! পিলেমানে কোরাস গীত ধরি পকাইলু যে!' ঋজুদার হেসে বলল।

রাজেনদা একটু লাজুক প্রকৃতির। সে বলল দুর্গাদাকে, 'তু সববে ফ্যাকটো তাংকু কহি দে।'

ফ্যাকটো শব্দটি ইংরেজি। রাজেনদারাও কথায় কথায় ফ্যাক্ট শব্দটি ব্যবহার করে।

দুর্গাদা যা বলল তা শুনেই তো নাড়ি ছেড়ে যাবার জোগাড়।

হাতিটা নাকি ধোপা যেমন পুকুরের পাটে ধাঁই-ধপাধপ করে কাপড় কাচে, তেমনই করে লোকজন গাই-বলদ শুঁড় জড়িয়ে তুলছে আর কাচছে।

একটার পর একটা ঘটনা বলছে দুর্গাদা তার ঠান্ডা একঘেয়ে গলাতে আর আমরাও তা শুনে ঠান্ডা মেরে যাচ্ছি।

সব শুনে-টুনে ঋজুদার শুধোল, 'পায়ের ছাপ দেখলে কোথাও?'

'হ্যাঁ। মাঠিয়াকুদু নালাতে দেখলাম। হাতিটা মনে হয় দিনের বেলা ওই নালার কাছের গভীর জঙ্গলে থাকে। সন্ধ্যের পর উঠে আসে ফরেস্ট রোড ধরেই লবঙ্গির আশপাশের গ্রামে। লবঙ্গিতেও।'

'কী কী গাছ আছে নালার কাছে?' ঋজুদার শুধোল।

'প্রাচীন সব জংলি আম, গেণ্ডুলি, নিম, বয়ের, শিমুল আর নানারকম জ্বালকাঠ।'

জ্বালকাঠ মানে যেসব গাছ চেলাকাঠ করে উনুনে জ্বালাবার জন্য ব্যবহার হয়। হরজাই গাছও বোঝায়, জ্বালকাঠ কথাটাতে। মানে উল্লেখযোগ্য বা দামি যা নয়, তাই জ্বালকাঠ।

'কত বড়ো হাতি?'

'ও বাপ্পালো বাপ্পা। সে ষড়া গুট্টে ঐরাবত হেললা।' ওরা দু-জনে সমস্বরে বলে উঠল।

দুর্গাদা বলল, 'গোদা হাতিটা। টুল্বকার জঙ্গলে যে-দল ছিল, তারই পুরোনো সর্দারটা হবে। বয়সও হবে কম করে ষাট। তাকে তো আমরা পিলাবেলে অর্থাৎ শিশুকাল থেকে দেখে আসছি।'

ঋজুদার বলল, 'তাহলে বল-বুদ্ধিতেই শুধু আমাদের চেয়ে বড়ো নয় সে, বয়সেও বড়ো বোঝা যাচ্ছে। তাকে গোদাদাদা বলেই ডাকা হবে তাহলে।'

'বড্ড ভয় ধরিলানি ঋজুবাবু। মো, পুও ঝিওসব্ব সেটি অছি। কোনদিন্ব সেমানংকু মারি সারিবে সে ষড়া হাতি তার কিছি ঠিক অছি কি?'

দুর্গা মহান্তির বাড়ি পম্পাশরে। পম্পাশর হয়েই লবঙ্গি যেতে হয়। সেখানে একটি ছোট্ট চালাঘরে দুর্গার বউ আর ছেলে-মেয়েরা থাকে। আমি গিয়েছিলাম একবার শীতকালে অষ্টমী পুজোর সময়ে। গুলগুলা আর এণ্ডুলি পিঠে খাওয়ার উৎসব ছিল ওদের তখন। ওদের বাড়ির সামনে কন্দমূলের খেত ছিল সেই সময়টিতে। মনে আছে। সত্যিই অমন নিরাপত্তাহীন বাড়িতে বউ-বাচ্চাদের একা রাখলে ভয় হওয়া তো স্বাভাবিক।

তিতির শুধোল, 'কন্দমূল মানে কী, ঋজুদা?'

'ও, কন্দমূল মানে হল গিয়ে, আরে কী যেন বলে, কী যেন বলি আমরা বাংলাতে, বল না রুদ্র, ও, মনে পড়েছে রাঙা আলু।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমাদের দেশের বনে-পাহাড়ের মানুষেরা বছরের বেশিটা সময় অসনিমূল আর ফল খেয়েই তো বেঁচে থাকে। পালামৌতে খায় কান্দা-গেঠি। গরমের জন্য কী

কষ্ট করে ভাল্লুক, শুয়োর আর শজারুদের সঙ্গে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা সেই মূল খুঁড়ে বের করে! কিন্তু গেঠি এতই তেতো হয় যে, ঝুড়ি ভরে তা সারারাত ঝরনার স্রোতের বা প্রপাতের নীচে রেখে দেয় ওরা। তাতেও তেতো ভাব তেমন কমে না। তারপর কোনোক্রমে খায় অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। দুর্গাদারাও কথা বলছে না।

ঋজুদার বলল, 'এখানেও আমি এমন অনেক মানুষ দেখেছি যাদের গায়ের চামড়া সাপের চামড়ার মতো উঠে যায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে।'

'কেন? কেন?' তিতির আর ভটকাই শুধোল। তিতির এ অঞ্চলে আগে আসেনি, তাই তাদের অজ্ঞতা উৎসাহকেই চাগিয়ে দিচ্ছে বারবার।

'কেন, তারা এতই গরিব যে, পুরো বছর একটি গামছাকে দু-ভাগ করে পরে আর গায়ে দেয়। ছিঁড়ে গেলে অবশ্য বছর শেষ হওয়ার আগেই আর-একখানা কেনে। ওড়িশার গামছা অবশ্য খুব বড়ো বড়ো হয়। তবে পাতলা তো বটেই।'

'গায়ের চামড়া উঠে যায় কেন?' তিতির আবার শুধোল।

'শীতের সময় ঘরের মধ্যে আগুন করে আগুনের দিকে বুক করে শোয় প্রথমে, তারপর অসহ্য হয়ে গেলে আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে শোয়। এমনি করে করেই রোস্টেড হয়ে যায় শীতের শেষে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তাদের সেই পুড়ে যাওয়া চামড়া পরতের পর পরত উঠে যায়।'

'সত্যি ঋজুকাকা?' ভটকাই বলল।

'সত্যি রে। এই আমাদের আসল দেশ। কলকাতা নয়, নতুন দিল্লি বা চণ্ডীগড়ও নয়। ফ্লাইওভার আর পাতাল রেল আর ফোয়ারা নয়। যেদিন আমাদের দেশের এই সাধারণ ভালো, গ্রামীণ মানুষরা দু-বেলা খেতে পাবে, ভদ্রভাবে পোশাক পরে থাকতে পারবে, শীতে কষ্ট পাবে না, গরমে খাবার জল আর চাষের জল পাবে, সেদিনই জানবি যে আমাদের দেশের কিছু হল।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোদের আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এই গরমে শুধু মহানদীর দু-পারের ভয়াবহ ও সুন্দর সব পাহাড়-জঙ্গল দেখাবার জন্যই নয়, নিয়ে এসেছি আমাদের দেশকেও দেখাতে। কীভাবে সাধারণ মানুষেরা থাকে, কী পরে, কী খায়। মানুষকে বাদ দিলে প্রকৃতির কোনো ভূমিকাই থাকে না।'

ভটকাই বলল, 'আরও বলো।'

'আমাকে আমার ছেলেবেলায় যখন প্রথম ক্যামেরা কিনে দেন আবার বাবা, তখন কোডারমার জঙ্গলে গিয়ে অনেকগুলো ছবি তুলি। বাবা ফোটোগুলি দেখে বলেছিলেন, শুধুই প্রকৃতি বিষয় হিসেবে বড়ো একঘেয়ে, ম্যাড়মেড়ে। প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষ যদি না থাকে, তাহলে অন্য মানুষের চোখে তার দাম কমেই যায়,

প্রকৃতির বিরাটত্বকে অনুভব করতে অসুবিধে হয়। আজকে এতদিন পরে বুঝি, বাবা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন ন-বছর বয়সি আমাকে।'

ঋজুদার থেমে যেতেই আমরাও সবাই চুপ করে গেলাম।

চাঁদটা আরও অনেকখানি উপরে উঠেছে। দুটো পিউ-কাঁহা বা ব্রেইন-ফিভার পাখি পাগলের মতো ডেকে চলেছে বাংলোর দু-পাশ থেকে। আবার একবার হাতির দলের বৃংহণের আওয়াজ শোনা গেল। ওরা বোধ হয় জলে যাচ্ছে। অথবা জলের মধ্যে রয়েছে, জল খাচ্ছে, শুঁড় দিয়ে একে অন্যকে চান করাচ্ছে, বাচ্চাদের ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করছে।

দুর্গাদা বলল, 'কঁড় করিবে বাবু? যিব্বেনি সিয়াড়ে? সে মানে বড্ড কান্দা-কাটা করিলে। সে হাতিটুকু নাশ না করিলে সে কাম্ম সারিবে। পম্পাশর আউ লবঙ্গির গাঁয়েরে আউ বাঁচিবা হেব্বনি।'

রাজেনদা হাঁটুর উপরে ধুতি তুলে দু-হাঁটু ভাঁজ করে দু-হাঁটুর উপরে দু-হাতের কনুই রেখে দু-হাতের পাতার উপর মুখ রেখে বসে ছিল বারান্দায়। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'দুর্গা যা কহিলাবাবু তা সত্য। কিছি বন্দোবস্ত করি না পারিলে আউ বাঁচা হেব্বনি সে গাঁ-দ্বিটার ঝিও-পুত্তংকু।'

'মু কঁড় করিবি, ক'।' ঋজুদার অনেকক্ষণ পর পাইপটা তুলে নিয়ে আগুন ধরিয়ে বলল।

জন-হিল তামাকের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে গেল বারান্দাময়। গ্রীষ্মবনের গা থেকে যে একটা পোড়া পোড়া ঝাঁঝালো গন্ধ বের হয়, অথচ যে গন্ধটা উত্তরবঙ্গে বা অসমে, বা সুন্দরবনে বা বিহারে বা ওড়িশায় বা মধ্যপ্রদেশে একটু আলাদা আলাদা, সেই গন্ধের সঙ্গে মিশে গেল টোব্যাকোর গন্ধ।

'কালই যিবি। জিপ ধরিকি। কঁড় কহিচ্ছন্তি তমমানে?' ঋজুদার শুধোল।

'আউ? কহিবি কঁড়? নিশ্চয় যিবা-হেবব।' ওরা দু-জনে সমস্বরে বলল।

'লবঙ্গি ফরেস্ট বাংলারে আম্মোমানে রহিবি আউ সারা দিনমান জঙ্গলরে বুলিবুলিকি দেখিবি সে হাতি পাঁই।'

'কেত্তোদিন রহিবে সেটি?' রাজেনদা শুধোল।

'কিন্তু, মু কই দেলি সর্বসমেত কেবল্ব তিন দিন মু রহিপারিবি সেট্টি। ঈ পিলামানংকু ঈ প্রচণ্ড গরম মধ্যে কলকাতাটু নেই কি আসিলি, সেমানংকু কোহ উঠিবে।'

'হেব্ব। হেব্ব। ঠাকুরানির দয়া হেল্বে তিন দিনই যথেষ্ট আইজ্ঞা। শুনন্তু ঋজুবাবু, তম্বপরু সে গাঁ-দ্বিটায় সর্বে মানুষংকু পূর্ণ বিশ্বাস অচ্ছি। তমকু 'দেব' পাই সব্বে মানিছি। তমকু যিবা হব নিশ্চয়ই।'

'যিবি। কঁহিলু তো যিবি বলিকি কাল সক্কালবেলে। আউ কাঁই পাট্টি করিচি মু। বুঝিলু। এব্বে তমমানে যাইকি গা-ধেইকি খাই-পীকি শুই পড়ো। কাল সক্কালবেলে মত্বে উঠাইবি।'

'হ আইজ্ঞা। এব্বে চালিলি।'

ওরা চলে গেলে ঋজুদাকে একটু চিন্তান্বিত দেখাল। যা কথাবার্তা হল ঋজুদার আর ওদের মধ্যে আন্দাজে কিছুটা তিতির আর ভটকাইও বুঝেছিল। ওড়িয়া বড়ো মিষ্টি ভাষা, ওড়িয়া মানুষদেরই মতো।

'যা ভেবেছিলাম,' ভটকাই বলল, 'পাঁই, পিলামানংক, ঠাকুরানি আর গো-ধেইকি শব্দগুলোর মানে বুঝলাম না ঋজুদা। অন্যগুলোর মানে আন্দাজে আন্দাজে বুঝে নিয়েছি। ওড়িয়া আর বাংলাতে তফাত বিশেষ নেই!'

'না। নেই। তবে যেকোনো ভাষা বলতে হলে গান গাইবারই মতো কান চাই। যার কান যত ভালো, সে তত তাড়াতাড়ি অন্য ভাষা সেই ভাষাভাষীদের মতো বলতে পারে।'

'মানেগুলো বললে না শব্দগুলোর?'

'হ্যাঁ। পাঁই মানে হচ্ছে জন্য ইংরেজি ফর, পিলামানংকু মানে ছেলেদের বা ছেলেমানুষদের বা তাদের জন্য। ঠাকুরানি হচ্ছেন অরণ্যদেবী। গা-ধেইকি মানে চান করে।' তারপর বলল, 'একটু যত্ন করে শুনবি, তাহলেই শিখে নিতে পারবি, অন্তত বলবার মতো।' তারপর বলল, 'সরি, তিতির আর ভটকাই, তোমাদের এই বাঘ্যমুন্ডাতেই থাকতে হবে তিন দিন। আমরা ফিরে এলে তারপর সকলে মিলে রওনা হওয়া যাবে। টুল্বকাতে দু-দিন, পুরানাকোটে এক দিন, টিকড়পাড়ায় এক দিন, বৌধে দু-দিন মানে ফুলবানিতে, তারপর দশপাল্লার কাছে টাকরা গ্রামে এক দিন, তারপর ওই দিক দিয়ে ফিরে কটক হয়ে কলকাতা। মহানদী, তোদের বড়োসিলিভার আশ্চর্য সুন্দর জঙ্গলও দেখিয়ে আনব। মন ভরে যাবে দেখিস।'

'আমরা কি সত্যিই যেতে পারি না তোমাদের সঙ্গে? রোগ এলিফ্যান্টের খোঁজে?' তিতির বলল অনুনয় করে।

'না তিতির। লবঙ্গির যে-ফরেস্ট বাংলো সেটি বাঘ্যমুন্ডার মতো এইরকম হলে তোদের নিশ্চয়ই নিয়ে যেতাম। কোনো কথাই ছিল না। লবঙ্গির ফরেস্ট বাংলো খড়ের চালের গোল একটি ঘর। শীত-গ্রীষ্মের হাত থেকে বাঁচার জন্য গোল করে উলটানো বাটির মতো করে তৈরি। দেখে মনে হয়, আফ্রিকান কোনো উপজাতিদের বাড়ি। সেই বাংলোয় এত লোকের থাকাও অসুবিধেজনক হবে। দুর্গা, রাজেন, আমি আর রুদ্রই যাই। তোদের জন্য গাড়ি থাকবে। ফুটুদা আর এবিকাকুও থাকবেন। টিকরপাড়ায় কুমির বাড়ানোর জন্য যে প্রকল্প হচ্ছে, তাও দেখে আসতে পারবি।

আমরা যখন এসব অঞ্চলে শিকার করেছি পঞ্চাশের দশকে এবং ষাটের দশকের গোড়ার দিকে তখন এসব কিছুই হয়নি। তিনটে দিন। দেখতে দেখতেই তোদের সময় কেটে যাবে। আর এবিকাকু ফুটুদা যখন সঙ্গে আছেন, তখন খাওয়াদাওয়ার কোনো কষ্টের কথা তো ভাবাই যায় না। বরং খেয়েই কষ্ট পাবি। এবিকাকু তো মিস্টার আর-একটু খান প্রশান্তকাকুরই ভাই। লাইক ব্রাদার, লাইক ব্রাদার।'

ঋজুদার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হতেই বারান্দায় আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। গ্রীষ্মবনে এখন নবমীর চাঁদ পুরো আধিপত্য বিস্তার করেছে। দূরে জঙ্গলের সীমানা আর ঝাঁটিজঙ্গলের মধ্যে ডিড-ড্য-ড্যু-ইট, ডিড-ড্য-ড্যু-ইট করে ডেকে ফিরছে একজোড়া পাখি। পাহাড়, প্রান্তর, বন এবং ওই রাতপাখির ডাকের উপর চাঁদের যে প্রভাব তাতে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে, ভল্টুদা এই মুহূর্তে আমেরিকায় চাঁদের মাটি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে করেছে এবং করবে। বিজ্ঞান বোধ হয় বড়োই বেশি কুতূহলী। এর চেয়ে একটু কম হলেও বোধ হয় এই পৃথিবীর এবং পৃথিবীর যারা বাসিন্দা, তাদের ক্ষতি হত না কোনোই। কিন্তু এই কৌতূহল আর জিজ্ঞাসাই অবশ্য যুগ যুগ ধরে মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে। এ না থাকলেও মানুষের মস্তিষ্কে হয়তো মরচে ধরে যেত। দৌড়ে চলার আর এক নাম জীবন। সামনে কী আছে? জানার বাইরে কী আছে? তাকে জানার চেষ্টা আর বেঁচে থাকা আজকের আধুনিক মানুষের কাছে সমার্থক।

হঠাৎ গমগমে গলায় ঋজুদার বলল, 'তুই আড্ডা না মেরে, যা রুদ্র। রাইফেল দুটো ঠিকঠাক করে নে। কাল অত ভোরে বেরোব। সময় পাওয়া যাবে না।'

'কোনটা কোনটা নেব?' আমি শুধোলাম।

'ফোর-সেভেনটি-ফাইভ ডাবল-ব্যারেলটা আর ফোর-ফিফটি ফোর-হান্ড্রেড ডাবল-ব্যারেলটা, আর গুলি। বেশির দরকার নেই। পাঁচ রাউন্ড করে নে। হার্ড-নোজড।'

'হার্ড-নোজড নেব? সফট-নোজড নয়?'

'না। হাতির বেলা আমি হার্ড-নোজড দিয়ে মারাই পছন্দ করি। যদিও অনেকে সফট-নোজডই পছন্দ করেন।'

'এ গুলিগুলো ফুটবে তো? নিনিকুমারীর বাঘের বেলা যেমন হয়েছিল, তেমন হবে না তো?'

'এবারে তো ইস্ট ইন্ডিয়া আর্মস কোম্পানির এবিকাকু, অর্থাৎ অনন্ত বিশ্বাসবাবু খোদ হাজিরই আছেন, এবারে ওঁকে ধরব না সঙ্গে সঙ্গে।'

'তা তো ধরবে। কিন্তু নিনিকুমারীর বাঘের মতো হাতিও যদি ঠাকুরানির হাতি হয়!'

ঋজুদার বলল, 'বলিস না, বলিস না। এক ঠাকুরানির বাঘেই অনেক মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন ঠাকুরানি। হাতজোড় করছি তাঁর কাছে। আর দেখতে চাই না।'

ভোর চারটেতে দুর্গাদা আর রাজেনদা চান-টান করে তৈরি হয়ে আমাদের দু-জনকে ডেকে দিল। তখনও পুবের আকাশ ভালো ফর্সা হয়নি।

রুদ্র পাশ ফিরে শুয়ে বলল, 'জ্বালালি। আমাকে না নিয়ে কেমন কী হয় দেখা যাবে।' বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আকাশে এখনও চাঁদ আছে। আমরা চান করে রাকস্যাকে অলিভ গ্রিন রঙের ট্রাউজার আর হাওয়াইন শার্টের একটি করে চেঞ্জ, টর্চ এবং ক-টি বিস্কিটের প্যাকেট নিয়ে নিলাম।

এবিকাকু একটি মস্ত ঝুড়িতে আমাদের চার জনের জন্য তিন দিনের মতো কাঁচা রসদ, মায় চা-চিনি পর্যন্ত গুছিয়ে দিয়েছিলেন। গত রাতে ফেয়ারওয়েল ডিনার এমনই হয়েছিল যে, দুপুরের আগে আমাদের দু-জনের কারও খিদে পাবে বলে মনে হয় না। এবিকাকু নিজে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করে কালকে রাঁধিয়েছিলেন। পোলাউ, মুরগির মাংস, টাটকা রুই মাছ-ভাজা, স্যালাড এবং ঢেনকানল থেকে আনা পোড়-পিঠা। তবু এক কাপ করে চা এবং একটি করে ডিমের পোচ খেতেই হল, চান করার পর বেরোবার আগে এবিকাকুর পীড়াপীড়িতে।

জিপে যখন বসলাম গিয়ে, তখন পুবের আকাশ ফর্সা হয়েছে। সমস্ত বন জেগে উঠেছে। আমাদের সি-অফ করার জন্য ফুটুদা, এবিকাকু, তিতির, ভটকাই এবং বাংলোর সমুদয় খিদমতগার জিপ অবধি এলেন। 'গুড লাক' বলল মিস্টার ভটকাই, মনে মনে ব্যাড লাক উইশ করে।

তিতির বলল, 'রুদ্র, কিপ ইয়োর কুল।'

এবিকাকু বললেন, 'হাতি তো খাওয়া যায় না, তাই হাতির মাংস আনতে বলছি না। দাঁত দুটো তো তোমাদেরই হবে। ভালো করে কেটে এনো। আর পা-চারটেও গোড়ালির উপর থেকে। আমার অনেক দিনের শখ হাতির গোদা পায়ের মোড়ায় বসে লুঙ্গি পরে মুড়ি আর বাগবাজারের তেলেভাজা খাব।'

ফুটুদা অতিশয় স্বল্পভাষী। মনের মধ্যে হাজার কথা কিলবিল করলে মুখ ফুটে একটা-দুটো কষ্টেসৃষ্টে বেরোয়। চোখ দুটোই বলে, যতটুকু বলার। বললেন, 'আচ্ছা, তা হলে...'

স্টিয়ারিংয়ে আমিই বসেছিলাম। পাশে ঋজুদা। মুখে সদ্য-ধরানো পাইপ নিয়ে। রাইফেল দুটো বাক্স-বন্ধ করা আছে। সেগুলো ও অন্যান্য মালপত্রসমেত পেছনে বসেছে দুর্গাদা আর রাজেনদা।

পুরানাকোটের দিকে জিপ চলেছে। বৈশাখের ভোরের হাওয়া মিষ্টি লাগছে।

জঙ্গল এখনও ঠান্ডাই আছে। তা ছাড়া ঘন সেগুন বনের মধ্যে দিয়ে পথ। বৈশাখের ঠান্ডা ভোরের হাওয়া এসে লাগছে চোখে-মুখে। আলো এসে পড়েনি এখনও পথে। বেলা দশটা বাজার পর থেকে গরম হয়ে উঠবে পথ আস্তে আস্তে। তারপর হাওয়ার দাপাদাপি শুরু হবে। মনে হবে যেন স্কুল-পালানো ছেলের দল হুড়দাড় করে জঙ্গলময় পিট্টু খেলে বেড়াচ্ছে। হাওয়াটা নানারঙা শুকনো পাতাদের অগণ্য বহুরঙা ছাগলের মতো তাড়িয়ে উড়িয়ে আফ্রিকান মাসাই উপজাতির রাখাল ছেলের মতো বনময় দাপাদাপি করে বেড়াবে। বড়কি ধনেশ কুচিলা খাঁই-এর ডাল থেকে ডেকে উঠবে, হ্যাঁক্ক-হঁক্ক, হ্যাঁক-হ্যাঁক। কুম্ভাটুয়া পাখি, রং বাদামি-কালো, ল্যাজ ঝোলা; লাফিয়ে লাফিয়ে বনের ছায়ায় এক্কা-দোক্কা খেলবে একা একা। গম্ভীর মুখে। যেন বউ মরে-যাওয়া কোনো একলা বুড়ো। কাচপোকা উড়বে বুঁ-বুঁ-বুঁইইই আওয়াজ করে। নানারঙা প্রজাপতি স্বপ্নের বাগানে উড়বে আর বসবে। শব্দ হবে না কোনো। কাঠবেড়ালি হঠাৎ উল্লাসে চার পায়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে ল্যাজটা ক্রমাগত ওঠাতে-নামাতে, নামাতে-ওঠাতে তারস্বরে অনেকক্ষণ ধরে ডাকবে চিঁ-র-র-র-চিপ-চি-র-র-র, চিরিররর...। সারা বন সরগরম হয়ে উঠবে তার ডাকে। জিপের সামনে দিয়ে তাড়াতাড়ি পথ পেরোবে মস্ত ল্যাজ নিয়ে ময়ূর আর ময়ূরী। শিমুল গাছতলাতে শিমুল ফুল খেতে খেতে কোটরা হরিণ হঠাৎ-আসা জিপের শব্দ শুনে চমকে উঠে সাদা লেজটি নাড়াতে নাড়াতে দৌড়ে যাবে বনের গভীরে, তার সাবধানবাণী ছড়াতে ছড়াতে, ব্বাক! ব্বাক! ব্বাক! ব্বাক!

বড়ো গাছের উঁচু ডালে রোদে বাদামি ঝিলিক তুলে চমকে বেড়াবে এ-ডাল থেকে ও-ডালে নেপালি ইঁদুর বা জায়ান্ট স্কুইরেলরা। মিটকুনিয়া গাছেদের ডালের পাতায় পাতায় ঝরনার শব্দ উঠবে ঝর ঝর করে। রোদ ছিটকে যাবে ঘন সবুজ ক্লোরোফিল-ভরা পাতায় পাতায়।

ঋজুদার বলল রাজেনকে, 'প্রথমেই লবঙ্গি বাংলোতে যাবে? না মাঠিয়াকুদু নালায়, যেখানে পায়ের ছাপ দেখেছ গুন্ডাটার?'

'সেখানেই প্রথম চলুন। মানে, নালায়। দেখে-টেখে এসে তারপর বুদ্ধি আঁটা যাবে।'

'বেশ। রুদ্রকে পথ বলে দিয়ো। আমি তো অনেক বছর পরে আসছি এদিকে।' ঋজুদার বলল।

পুরানাকোটের মোড়ে এসে পৌঁছোলাম। সামনে টুল্বকা যাবার পথ চলে গেছে। আর ডান দিকে গেলে পুরানাকোট। আমরা বাঁয়ে অংগুলের পথ ধরলাম। এই পথেই

পম্পাশর পৌঁছে আমরা ডাইনে মোড় নেব। তারপর পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে এগোব লবঙ্গির দিকে।

ঋজুদার বলল, 'এই নালাই কি সেই নালা যেখানে ফুটুদারা একবার কাঠ কাটার জন্য ক্যাম্প করেছিল বছর পনেরো-ষোলো আগে? আমিও এসেছিলাম ক-দিন? এবিকাকু একদিন থেকে চলে গেছিল?'

দুর্গা বলল 'হ্যাঁ, সেই নালাই তো। মনে নেই? ট্রাকে করে কাঠ টানার মোষ আনবার সময় একটা মোষ ট্রাক থেকে খাদে পড়ে গেছিল? তারপর জড়িবুটির বৈদ্য কম্ফু তাকে ধীরে ধীরে সারিয়ে তুলল? কম্ফুর বউও ছিল সীতা। ছেলে কুশ।'

'আছে মনে। কম্ফু কেমন আছে? কোথায় আছে এখন?'

'সে আর জিজ্ঞেস করবেন না ঋজুবাবু। তার সঙ্গে হয়তো জঙ্গলেই দেখা হয়ে যাবে আমাদের। ভাবলেই কষ্ট হয়।'

'কেন, কী হয়েছে তার? এই গুন্ডা হাতির জঙ্গলে কী করছে সে?'

'কম্ফু পাগল হয়ে গেছে ঋজুবাবু। তার বউটা তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকেই পাগল-পাগল ভাব হয়েছিল। এখন উন্মাদ। একেবারেই উন্মাদ।'

'সে কী! থাকে কোথায়? কোনো ডেরা-টেরা নেই?'

'ওই লবঙ্গির জঙ্গলেই।'

'বাংলোতে, না বস্তিতে?'

'না বাবু, জঙ্গলে। গান গায়, কখনো খালি গায়ে চাঁদনি রাতে বনময় ঘুরে বেড়ায়। গুহাতে বা নদীর ধারে গাছের ছায়ায় থাকে। এই গরমের আর বর্ষার দিনেই ভয়। যেকোনোদিন সাপ বা বিছের কামড়ে মারা যাবে। আর মরে গেলে কেউ জানতেও তো পারবে না। হায়নাতে-শেয়ালে-শকুনে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। জংলি জানোয়ারে আর কম্ফুতে কোনো তফাত নেই এখন আর।'

'ইস, খায় কী কম্ফু?'

'খাবে আর কী! নদীর জল আর বনের ফলমূল। ওই অঞ্চলে খুব বড়ো বড়ো আম গাছ যে আছে, তা তো জানেনই। গরমের সময় আম খেয়েই পেট ভরে যায়। তবে ভয়ও আছে সেখানে। আম তো হাতি আর ভালুরও প্রিয় খাদ্য। আর ওখানে যে কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভালু আছে তা তো আপনি দেখছেনই। আর এখন তো হাতির দল নয়, গুন্ডা হাতির রাজত্ব। দুটো ভালুকেও থেঁতলে দিয়েছে গুন্ডাটা। কাল দেখে এলাম আমরা। শকুন পড়েছে তাদের তালগোল পাকানো পিণ্ডর উপরে। হাতিটা কাছেই ছিল কি না তা কে জানে! জঙ্গলে হাতি যখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, গুন্ডা হাতি হলে

তো কথাই নেই, তখন তার গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগার আগে তো বোঝা পর্যন্ত যায় না।'

'তা ঠিক।' ঋজুদার বলল।

তারপর আমাকে বলল, 'হাতিদের পথঘাট, চড়াই-উতরাই সম্বন্ধে এমনই জ্ঞান যে ইঞ্জিনিয়াররাও তাদের সম্মান করে। ঠাট্টা নয় কিন্তু। যে কোনো জায়গাতেই পি.ডব্লু.ডি. অথবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, অথবা জঙ্গলের ঠিকাদাররা কাঠ গভীর জঙ্গল থেকে বের করে নিয়ে আসবার জন্য রাস্তা যখন তৈরি করে তখন হাতিদের চলাচলের পথ-বরাবরই সে-রাস্তা তৈরি করা হয়। বিশেষ জরিপ, গ্র্যাডিয়েন্টের হিসেবপত্রের ঝামেলা অনেক কমে যায়। অবশ্য এই সুবিধা পাওয়া যায় যে-জঙ্গলে হাতি থাকে সেখানেই। কোন জংলি নদীর ঠিক কোনখানে ব্রিজ হবে তাও ঠিক করা হয় অনেক সময় হাতিদের নদী-পারাপারের জায়গা দেখে।'

এবার পম্পাশরের মোড়ে এলাম আমরা। বড়ো রাস্তা ছেড়ে ডান দিকের পাহাড়ে চড়ালাম জিপ। খুব খাড়া নয় পাহাড়। সেকেন্ড গিয়ারেই টেনে নিল। একটু গিয়েই ডান দিকে দুর্গাদার বাড়ি। সে বলল, 'একটু কিছু খেয়ে যাবেন না? রুদ্রবাবু তো এই প্রথম পম্পাশরে এল।'

ঋজুদার বলল, 'তোমার বাড়িতে অনেকবার খেয়েছি। আর রুদ্র তো তোমার জামাই নয়। এবার শুধু জল খাব। তাড়াতাড়ি করো।'

জামাইয়ের কথা বলায় দুর্গাদা আর আমি দু-জনেই লজ্জিত হলাম।

দুর্গাদা জিপ থেকে নেমে দৌড়োল।

রাজেনদা বিড়ি খাওয়ার জন্য জিপ থেকে নেমে গাছের আড়ালে যাচ্ছিল। ঋজুদার তাকে বকে দিয়ে বলল, 'তোমাকে অনেকদিন বারণ করেছি। বলেছি না, আমার সামনেই বিড়ি খাবে।'

দুর্গাদা একটু পরেই ফিরে এল ঝকঝকে করে মাজা পেতলের ঘটি হাতে করে। সঙ্গে দুর্গাদার ত্রয়োদশী, লাল শাড়িপরা, নাকে পেতলের নোলক আর হাতে লালরঙা কাচের চুড়িপরা লজ্জাবতী মেয়ে। তার হাতেও ঝকঝকে করে মাজা পেতলের থালা, তাতে দুটো ঝকঝকে গ্লাস উপুড় করা, আর ক-টি বাতাসা। লজ্জাবতী ঝোপের পাশে দুর্গাদার মেয়েকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ঋজুদার শুধোল, 'তোমার নাম কী?'

সে বলল, 'পঞ্চমী।'

আমি ভাবলাম, ত্রয়োদশীর পঞ্চমী হতে আরও দু-বছর বাকি।

দুর্গাদা বলল, 'মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি। সামনের শীতে। আপনি আসবেন তো ঋজুবাবু? রুদ্রবাবুদের সকলকে নিয়ে আসবেন। তিতির দিদিমণি, ভ্যাটকালুবাবুকে।'

আমি বললাম, 'ওর নাম ভ্যাটকালু নয়, ভটকাই।'

দুর্গাদা জিভ কাটল।

ঋজুদার বলল, 'আসতে পারি আর না পারি নেমন্তন্নের চিঠি যেন অবশ্যই পাই তারিখ জানিয়ে। খুব জরুরি কাজ না থাকলে অবশ্যই আসব।'

গেলাস দুটো সোজা করে দিল পঞ্চমী। দুর্গাদা জল ঢেলে দিল ঘটি থেকে। ঃআ, কী মিষ্টি, ঠান্ডা জল। ঝরনার জল বোধ হয়।

'জামাই করে কী? ও দুর্গা?'

দুর্গাদা বলল, 'জামাই বিনকেইতে থাকে। ওদের একটা নৌকো আছে। তার বাবা আর সে নৌকো চালায়। যখন ভাড়া না পায় তখন মাছ ধরে সাতকোশিয়া গণ্ডে।'

আমি ভাবলাম, বাঃ। কলকাতার খবরের কাগজগুলোতে পাত্র-পাত্রীর কলামে বিজ্ঞাপন বেরোয় পাত্র সুদর্শন, ব্যাঙ্কের চাকুরে অথবা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। তারপর থাকে, কলকাতার পৈত্রিক/নিজস্ব বাড়ি। আর পঞ্চমীর বিয়ে হবে যার সঙ্গে তার পরিবারের দু-পুরুষের সম্পত্তি বলতে একখানি নৌকো। অবশ্য মাথা গোঁজার মতো ঘর ডাঙাতেও নিশ্চয়ই থাকবে একটা!

দুর্গাদা যেন আমার মনের কথাই শুনতে পেয়ে বলল, 'জমিজমা থাকলে কি আর নৌকো চালিয়ে খায়। ওই গভীর গণ্ড। তাতে কুমির ভরা। কিন্তু কী করব? গরিবের তো চারা নেই। যেমন জুটল তেমনই দিলাম। তাও আবার ছেলের বাপ একটা সাইকেল চায়। দশ জন বরযাত্রীকেও খাওয়াতে হবে বিয়ের রাতে। খরচ কী কম!'

ঋজুদার বলল, 'তোমার জামাইয়ের সাইকেলটা নাহয় আমিই দিয়ে দেব। ও নিয়ে মোটেই চিন্তা কোরো না তুমি। আর পঞ্চমীকে দেব একটা সম্বলপুরি সিল্কের শাড়ি। এইরকমই লাল। যেমন লাল ও পরেছে। লাল রং বুঝি তোমার খুব পছন্দ? কী পঞ্চমী? মধ্যে হাতির কাজ করা থাকবে। কী রে, পঞ্চমী, পছন্দ হবে তো?'

পঞ্চমী লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। মনে হল, কেউ যেন ওর পায়ের কাছের লজ্জাবতীর ঝোপে আঙুল ছুঁইয়েছে। পঞ্চমী দাঁড়িয়েই ছিল লজ্জাবতীর ঝাড়ে। এমনও কি হয়? ভাবছিলাম আমি।

দুর্গাদাও কম খুশি নয়। বলল, 'বাবু, পূর্বজন্মে আপনি মোর বাপ্প থিলা।'

ঋজুদার হেসে বলল, 'ভালোই বলেছ।' তারপর বলল, 'সময় নষ্ট না করে নাও এবার চলো। যদি এ যাত্রা বেঁচে ফিরি তো ফেরার সময় তোর আর তোর মায়ের হাতে ডাল-ভাত খেয়ে ফিরব। বুঝলি পঞ্চমী?'

পঞ্চমী সঙ্গে সঙ্গে হেসে মুখ সামনে করে বলল, 'কী ডাল খাবে?'

ঋজুদার বলল, 'বিরি ডাল।'

পঞ্চমী মাথা হেলিয়ে বলল, 'আচ্ছা। তখন না বললে হবে না কিন্তু।'

বিরি ডাল মানে কলাই ডাল। গরমে ঋজুদার খুবই প্রিয়।

যে ক-টা বাতাসা ছিল, রাজেনদাকে দুর্গাদা জোর করে খাইয়ে দিল। ঘটি থেকে রাজেনদা ঢকঢকিয়ে জল খেল, তারপরে তার নীলরঙা ফুলহাতা শার্টের হাতা দিয়ে মুখটা মুছে নিল।

আমি জিপটা স্টার্ট করলাম। দুর্গাদা পঞ্চমীকে বলল, 'মু চলিলি রে মা। সাবধানে রহিবি তমমান্বে।'

পঞ্চমী মাথা হেলাল। কথা বললে ওকে অত সুন্দরী দেখাত না। আমার এই সুন্দর দেশের গরিব ঘরের ঘর-আলো-করা রাজকন্যে! সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কী আর এমনি লিখেছিলেন, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।'

পাহাড় চড়তে চড়তে আমি শুধোলাম, 'সাতকোশিয়া গণ্ড কী ব্যাপার ঋজুদা?'

'সে কী রে, তুই ভুলে গেলি?' অবাক গলায় বলল ঋজুদা।

'সেই যে প্রথমবার তুই এসেছিলি আমার কাছে, যখন আমার সাতটা দিশি কুকুর ছিল জঙ্গলে, যাদের নাম ছিল, সারেগামাপাধানি, আর তুই তো সেবারের আসা নিয়ে ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে না কী একটা বইও লিখেছিলি!'

'ও তাই তো! ভুলেই গেছিলাম। নয়নামাসিরাও তখন এসেছিল টিকরপাড়া বাংলোতে. তাই না?'

ঋজুদার বলল, 'সাতকোশিয়া গণ্ড হচ্ছে সাত ক্রোশ বা চোদ্দো মাইল লম্বা gorge বা গিরিখাত, যার আরম্ভ হচ্ছে বিনকেইতে। চৌদুয়ারে পৌঁছোবার আগেই হঠাৎ চওড়া হয়ে ছড়িয়ে গেছে মহানদী, তিস্তা যেমন কালিঝোরার পর করোনেশন ব্রিজ পেরিয়েই হয়েছে, জব্বলপুরের মার্বেল রক পেরিয়েই যেমন নর্মদা। এই গণ্ডের দু-পাশেই গভীর জঙ্গল-পাহাড়। এখানের নদীতে মাছ আর কুমিরের ছড়াছড়ি। হাজার হাজার বাঁশের ভেলা বানিয়ে ঠিকাদাররা বাঁশ চালান দেয় কাগজকলে। সেই ভেলা করে একবার গিয়েছিলাম টিকরপাড়া থেকে চৌদুয়ার। তার ডায়েরিও রেখেছিলাম একটা। খুঁজে বের করতে হবে। সে এক অভিজ্ঞতা।'

এইবার জিপ বেশ উঁচুতে চলে এসেছে। পাহাড়ের একেবারে গায়ে গায়ে নাবাল মাটির রাস্তা আর তার ডান দিকে গভীর খাদ। গভীর জঙ্গলে ভরা তা। কিন্তু নীচের সব কচি গাছই গেণ্ডুলি। একটি শিমুলও আছে। গেণ্ডুলি গাছে এখন একটা-দুটো পাতা এসেছে, শিমুল গাছেও নতুন পাতা এসেছে। ওই ন্যাড়া, রুক্ষ পটভূমিতে শিমুল গাছগুলোর গায়ে কিছু কিছু কিশলয়। কী যে সৌন্দর্য এনে দিয়েছে তা বলবার নয়।

ঋজুদার বলল, 'এই গেণ্ডুলি গাছগুলো কেন বড়ো করা হচ্ছে জানিস? লালনপালন?'

'কেন?'

'এই গাছ দিয়ে, সম্ভবত এর আঠা দিয়ে পলিয়েস্টার ফাইবার তৈরি হয়। নরম গাছ তো। আঁশ থাকে এতে। যেসব মানুষ পলিয়েস্টারের জামা পরতে ভালোবাসেন, তাঁদের যদি ওই গাছগুলোতে গ্রীষ্মে বা শীতে বা বর্ষায় বা বসন্তে একবার দেখবার সুযোগ দেওয়া হত, তাহলে তাঁরা সকলেই বলতেন, থাক, থাক। এই গাছগুলো বাঁচুক, বন বাঁচুক। পলিয়েস্টারের জামা আমরা পরব না। বিজ্ঞানের অগ্রগতিটুকুই আমাদের চোখ ধাঁধায়, কিন্তু সমস্ত চোখ-ধাঁধানো নতুন নতুন পণ্যের পেছনে যে প্রকৃতি চোখের জল ফেলতে ফেলতে রিক্ত, বিবস্ত্র, নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষে ভরা এই দেশে, তার খবর ক-জন আর রাখে বল?'

দুর্গাদা আমাকে বলল, 'রুদ্রবাবু, এবার একটু আস্তে চলো। সামনে পর পর বাঁক আছে কয়েকটা। হাতির জায়গায় তো পৌঁছে গেছি আমরা। বিশ্বাস কী তাতে? জিপের শব্দ শুনেই হয়তো বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়ে রইল। এক ধাক্কায় জিপকে ফেলে দেবে নীচে।'

ঋজুদার বলল, 'জিপটা একটু দাঁড়ই করা রুদ্র। রাইফেল আর গুলিগুলো বের করে নে।'

রাজেনদা বলল, 'পরে বের করলেও হবে। আমার হাতে তো দু-নলা বন্দুক আছে।'

ঋজুদার বলল, 'এ যদি তোমার বন্দুকেরই কম্ম হত রাজেন, তবে কি আমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে আনতে তোমরা? নিজেরাই কখন কাজ সেরে রাখতে যে, না জানতে পেতাম আমি, না ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট!'

রাজেনদা লজ্জা পেল।

আমি জানতাম যে, রাজেনদা চোরাশিকার করে। দুর্গাদাও করে। কিন্তু তা করে একটু মাংস খেয়ে মুখ বদলাবারই জন্যে। ন-মাসে, ছ-মাসে একটু মাংস খেতে পায় ওরা। সেজন্য বনজঙ্গলের বেশি মানুষই প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সিতে ভোগে। সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ই রিলেটিভ, মানে আপেক্ষিক। প্রত্যেক মানুষকে তার পটভূমিতে ফেলে বিচার করে তারপরই রায় দিতে হয়। তাই বোধ হয় কথায় বলে, 'ল ইজ নাথিং বাট কমন সেনস'।

'তোর রাইফেলে গুলি ভরিস না। আমার রাইফেলটা দে। হাতে ধরে বসে থাকি।' ঋজুদার বলল আমাকে, রাইফেল দুটো বের করার পর।

পথটা এঁকেবেঁকে চলেছে। বাঁ-দিকে একেবারে সোজা পাহাড়। ঘন জঙ্গল আছে। তবে অনেক গাছেরই পাতা ঝরা। কোথাও-বা একটু ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। সেরকম একটি ন্যাড়া জায়গাতে দেখি বাঁদরদের সভা বসেছে। ওদের পঞ্চায়েত নির্বাচন বোধ

হয় এসে গেছে। নেতা বক্তৃতা করছে। অন্যেরা শুনছে, কেউ গালে, কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে। কেউ-বা শুনছে মাথার উকুন বাছতে বাছতে। অনেকেরই মুখ বাঁদরদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদবিগ্ন। জনগণ সম্বন্ধে ভেবে ওদের নেতাদেরও রাতে ঘুম হচ্ছে না। মাথার চুলও পাতলা হয়ে গেছে।

রাজেন বলল, 'এবারে পথটা ছেড়ে ডান দিকের নীচের পথে নামতে হবে মাঠিয়াকুদু নালার দিকে।'

দেখতে দেখতে গভীর জঙ্গলের দিকে জিপ গড়িয়ে যেতে লাগল। বেলা দশটাতে ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল।

মাঠিয়াকুদু নালার কাছাকাছি পৌঁছে জিপ থামিয়ে দিলাম।

রাজেনদা বলল, 'জিপটাকে ছেড়ে যাওয়া চলবে না। রুদ্রবাবু আর দুর্গা জিপেই থাকুন। এবং জিপটা ঘুরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করান। গায়ে রোদ লাগলে লাগবে। তবু হাতি এলে তাকে দেখার সুযোগ পাবেন। জঙ্গল থেকে একটু দূরেই থাকুন। আমি আর ঋজুবাবু একটু নেমে দেখে আসি।'

রাজেনদার কথামতোই কাজ করলাম। ঋজুদার বলল, 'এবার তোর রাইফেলে গুলি ভরে নে। তবে হাতি এলেও তুই একা গুলি করবি না। জোরে জিপ চালিয়ে চলে যাবি। দুর্গা লবঙ্গির ফরেস্ট বাংলোর পথ চেনে।'

'কেন?'

'যা বললাম তাই করিস। এখন তর্কাতর্কির সময় নয়।'

'তোমরা? তোমরা ফিরবে কী করে? দুর্গাদা বলছিল পাঁচ মাইল পথ।'

'আমরা নাহয় হেঁটেই ফিরব তেমন হলে। তবে ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। দেরি দেখলে আবার জিপ নিয়ে ফিরে আসিস, বা নালা অবধি না ফিরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকিস। ফাঁকায়। গুলি করতে পারিস নেহাত প্রাণ বাঁচানো জরুরি হয়ে পড়লে। ওই হাতি শিকারের জন্য তোর রাইফেল দিয়ে গুলি করিস না আমি সঙ্গে না থাকলে। আবারও বলছি। মনে রাখিস।'

চলে যাবার আগে, ঋজুদার বলল, 'হাতির কোথায় গুলি করতে হবে জানিস তো? মনে আছে? রুআহাতে ভালো করে শিখিয়েছিলাম তোকে।'

'হ্যাঁ, মনে আছে।' বিরক্ত গলায় বললাম। ঋজুদাটা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। একই কথা বার বার বলে আজকাল।

'গুলি কিন্তু তুই করছিস না। নেহাত প্রাণ বিপন্ন না হলে।'

'ঠিক আছে।'

ঋজুদার আর রাজেনদা গাছগাছালির মধ্যে হারিয়ে গেল। রোদের মধ্যে বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে ছায়াচ্ছন্ন জঙ্গলের দিকে চাইলে জঙ্গলকে আরও বেশি ছায়াচ্ছন্ন ও

স্নিগ্ধ লাগে। দুর্গাদাকে বললাম, 'তুমি জিপের পেছনে বসে সামনের দিকে দেখো আর ডান দিকে।' আমি বসেছিলাম লোডেড রাইফেল নিয়ে জঙ্গলের দিকে মুখ করে, ঋজুদারা এগিয়ে গেল সেইদিকেই।

দুর্গাদা বলল, 'তেষ্টা পেয়ে গেল যে। তুমি বোসো। আমি নালা থেকে একটু জল খেয়েই আসছি।'

'সাবধানে যাবে। নিজের বাড়িতে জল খেতে পারলে না? হাতির ফুটবল হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি তোমার?' আমি বললাম।

দুর্গাদা বলল, 'রাখো তো। হাতি সেটি মু পাঁই ঠিয়া রহিছি।' অর্থাৎ, ছাড়ো তো, হাতি যেন আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

'নালাটা তো দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তুমি যাচ্ছটা কোথায়?'

'কাছেই।' বলেই দুর্গাদা জঙ্গলের দিকে এগোল। যাবার আগে বলে গেল, 'চুপ করে থাকলে জল বয়ে যাওয়ার কলকুলানি শব্দ তুমিও শুনতে পাবে।' দুর্গাদা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘড়িতে চেয়ে দেখলাম, প্রায় এগারোটা বাজে। কী করে যে সময় যায়। দুর্গাদা চলে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। জল খেয়ে ফিরে আসতে এতক্ষণ সময় লাগার কথা নয়। আমার মন কীরকম যেন করছে। কখনো এমন করে না। গুন্ডা হাতি সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই আমার নেই। তিতিরটা সঙ্গে থাকলে বেশ হত।

ঋজুদার কাছে গল্প শুনেছিলাম, ডুয়ার্সের এক চা-বাগানের এক ইংরেজ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অল্পবয়সি সার্গেসান একদিন বর্ষাকালের এক বিকেলে মুরগি মারতে গেছিল। ঝোপের মধ্যে মোরগের ডাক শুনেই যেই না ঢুকেছে পাশে মেঘমেদুর বিকেলে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাতি অমনি শুঁড়ের এক ঝটকানিতে তাকে তুলে নিয়ে মাটিতে ফেলে পা চাপিয়ে দিয়েছিল তার মাথার উপর। সে না ফেরাতে, রাতে দু-শো কুলি নিয়ে মশাল জ্বেলে তার বাগানের এবং অন্যান্য বাগানের ম্যানেজারেরা রাইফেল নিয়ে গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে তার বীভৎস মৃতদেহ পায়।

দুর্গাদাটা তো আচ্ছা লোক। এমন খামোখা চিন্তা করাতে পারে না। ভারি বিরক্ত লাগছে আমার। জল খেতে গেল তো ভগবানের নামে গেল।

পথের পাশের বড়ো বড়ো সব প্রাচীন গাছে নেপালি ইঁদুররা একে অন্যকে তাড়া করে ফিরছে। ঝর ঝর শব্দ হচ্ছে পাতায়। একটি বিরাট শম্বর, শিঙাল বন থেকে বেরিয়ে এসেই জিপটা ও আমাকে দেখে চমকে উঠে ঘ্যাক করে একবার ডেকেই বনের ভিতরে চলে গেল। জল খেতে যাচ্ছিল বোধ হয়। লবঙ্গির জঙ্গল এমনিতেই অত্যন্ত গভীর এবং জনমানবশূন্য। হাতির অত্যাচার তাকে আরও ভয়াবহতা দিয়েছে।

এই নির্জনে অন্ধকার নামা পর্যন্ত জলে যাবার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করছে না আর জানোয়ারেরা।

এমন সময় মনে হল, দুর্গাদার গলার স্বর শোনা গেল। তাহলে কি ঋজুদারাও ফিরে এল? এত তাড়াতাড়ি?

উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলাম নালাটা যেখানে থাকার কথা সেদিকে।

সবুজ অন্ধকার থেকে যে-লোকটি বেরিয়ে এল, সে কিন্তু দুর্গাদা নয়। অন্য লোক। সম্পূর্ণ নগ্ন। বড়ো বড়ো চুল-দাড়ি। প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো নখ হাত-পায়ের। কানের চুল ঝুপড়ি হয়ে আছে। নাকের চুলও। লোকটা বেশ লম্বা। আর তার চোখ দুটোতে আগুন জ্বলছে। তার হাত-পায়ের নখের মধ্যে লাল মাটি ঢুকেছে এমন করে যে মনে হচ্ছে, রক্ত খেয়েছে হাত দিয়ে কোনো কিছুর মাংস ছিঁড়ে।

লোকটা কী যেন বিড়বিড় করে বলতে বলতে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছে আসতেই শুনলাম, বলছে, 'আলো শুকিলা সাড়ু, মন মরি গলা দ্বিপাহারু।'

বারবার এক কথাই বলছে।

বাক্যটির মানে হল, ওরে শুকনো কচু! তোর মন মরে গেল দ্বিপ্রহরেই!

লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ চোখে আমার চোখে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'মু হেল্বা বারুঙ্গ আউ তু ভদ্দরনোক। মু মারিলে তু বাঁচিবি? চাল। গোণ্ডুলি বন মধ্যরে আজি তমকু কব্বর দেবি মু।'

কী বিপদেই পড়লাম রে বাবা। বনের প্রাণীদের মোকাবিলা করতে পারি, কিন্তু বনের মানুষকে নিয়ে কী করি?

তার ভাবগতিক দেখে আমি রাইফেলটাকে তুলে নিয়ে কোলের উপরে রাখলাম।

তা দেখেই লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। তার হাসিতে ছায়াচ্ছন্ন বন আর রৌদ্রদগ্ধ গেণ্ডুলি বনও যেন হা-হা করে উঠল।

বলল, 'মত্বে মারিবি তু? গুলি মত্বে বাজিবনি।' বলেই দুটো হাতে ঝরনা খেলাল।

আমি ততক্ষণে জিপের বনেট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছি রাইফেল হাতে।

হঠাৎ লোকটা দু-হাত তার মুখের কাছে নিয়ে, যেদিকের বনে শিঙাল শম্বরটা ঢুকে গিয়েছিল, সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে খুব জোরে ডাকল, 'কুয়ারে পলাইলিরে ঐরাবত্ব। চঞ্চল করিকি আতু। আ রে। চঞ্চল করিকি আ।'

বলতেই, ওইদিকের জঙ্গলের গভীরে একটি আলোড়নের শব্দ শুনতে পেলাম আমি। গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল আমার। উত্তেজনায়। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে পাহাড়ের মতো এক হাতি সত্যিই জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল। তার

দাঁত দুটো মাটিতে লুটোচ্ছিল। এত বড়ো হাতি যে, মনে হল আফ্রিকাতেও দেখিনি। হতবাক হয়ে গেলাম আমি। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল তার চেহারা দেখেই।

হাতিটা পাঁচ মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল খুব আস্তে আস্তে। আমি রাইফেল তুলে তার কপালে নয়, কানের পাশে কাভার করে রইলাম। যদি সত্যিই চার্জ করে? কিন্তু ঋজুদার কথা মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এক ধাক্কায় আমি সেই লোকটাকে জিপের পেছনের সিটে ফেলে স্টিয়ারিংয়ে বসে যত তাড়াতাড়ি পারি ইঞ্জিন স্টার্ট করে জিপ ছোটালাম রাইফেল পাশে শুইয়ে রেখে।

শিকারে যাওয়ার সময় যে জিপেই যাই, জিপের হুড খোলা থাকে। সামনের উইন্ডস্ক্রিনও শোয়ানো থাকে বনেটের উপর। এই কারণেই সেডান-বডির জিপ আমরা কখনো নিই না। কিন্তু এতখানি পথ আসতে হবে বলে, হুড যদিও খোলা ছিল, উইন্ডস্ক্রিন নামানো ছিল না চোখে হাওয়া লাগে বলে। বোধ হয় কুড়ি গজও উঠিনি চড়াই-এ এমন সময় পেছন থেকে এক চিৎকার শুনে রিয়ার-ভিউ-মিরারে চেয়ে দেখি, লোকটা পেছন দিক দিয়ে জিপ থেকে এক লাফ মেরে নেমে হাতিটার দিকেই দৌড়ে যাচ্ছে।

ব্রেক করে মুখ ঘুরিয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। কী হয়, কী হয়!

হাতিটা বন থেকে বেরিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এই লোকটা যে কে আমি জানি না, তবে টারজান বা অরণ্যদেবের মতো কেউ হবে বোধ হয় এইটুকু মনে হচ্ছিল, নইলে কোনো গুন্ডা হাতি কোনো মানুষের কথা এমন শোনে!

লোকটা টালমাটাল পায়ে হাতিটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ডান হাত তুলে হাতিকে কী বোঝাতে বোঝাতে।

হাতিটা মুহূর্তের মধ্যে ক্যানাডিয়ান লোকোমোটিভ স্টিম ইঞ্জিনের মতো এক দমে শুঁড় লটপটিয়ে ছুটে এসে লোকটাকে শুঁড় দিয়ে এক ঝটকাতে তুলে নিল। এবার তার পিঠে বসাবে মনে হল। কিন্তু পিঠে না বসিয়ে পথের পাশের কতগুলো বড়ো পাথরের স্তূপে লোকটাকে এক প্রচণ্ড আছাড় মারল হাতিটা। এবং সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ করে লোকটার কপাল ফেটে গেল। হাড়গোড় সব চুর চুর হয়ে গেল। থকথকে ঘিলু ছিটকে লাগল কালো পাথরে। ই রে! লালচে-হলদেটে রঙের ঘিলু।

তারপর হাতিটা লোকটাকে মাটিতে ফেলে প্রথমে বাঁ-পা, তারপর ডান পা দিয়ে তাকে যেন ঘন ঘৃণার সঙ্গে মাড়াল। মাড়িয়ে জিপের দিকে এবং রাইফেল-হাতে দাঁড়িয়ে থাকা শিকারি আমার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করে পথটা পেরিয়ে যেদিক দিয়ে এসেছিল, তার ঠিক উলটো দিকের পত্রশূন্য, রোদ-ঝাঁ-ঝাঁ করা গেণ্ডুলি বনে

ঢুকে গেল। পত্রশূন্য বলেই, দেখতে পেলাম, অবিশ্বাস্য গতিতে চোখের পলকে সে এত দূরে চলে গেল যে, কিছু পরে তাকে আর দেখাই গেল না।

এমন সময় দেখলাম, ঋজুদারা দৌড়ে আসছে।

ওঁদের দেখেই আমি সঙ্গে সঙ্গে জিপ ব্যাক করে তাড়াতাড়ি ওদের দিকে নিয়ে গেলাম।

নিজের উপর বড়োই ঘেন্না হচ্ছিল আমার। আর প্রচণ্ড রাগও হচ্ছিল ঋজুদার উপরে। হাতে ফোর-ফিফটি ফোর-হান্ড্রেড লোডেড ডাবল-ব্যারেল রাইফেল থাকতেও আমার সামনে একটা লোক দিনদুপুরে খুন হয়ে গেল, অথচ তাকে বাঁচাতে পারলাম না আমি। এমনকী বাঁচাবার চেষ্টাও করলাম না। ছিঃ! এই না হলে শিকারি। এবার থেকে ঋজুদার চামচেগিরি করাই ছেড়ে দেব। মনে মনে ঠিক করলাম।

ঋজুদার একবার দ্রুত গেণ্ডুলি বনের দিকে তাকাল, তারপর পড়ে থাকা মানুষটার দিকে। তাকে মানুষ বলে চেনার আর উপায় ছিল না কোনো। তাকে তালগোল পাকিয়ে দিয়ে হাতি তার লজ্জামোচন করছিল।

দুর্গাদা, রাজেনদা আর ঋজুদার আমাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে নিজেরা নীচু গলায় কীসব আলোচনা করল দ্রুত। পরক্ষণেই রাজেনদা আর ঋজুদার আমাকে কিছু না বলেই খুব দ্রুত গেণ্ডুলি বনের উপত্যকাতে নেমে গেল। এবং দ্রুতগতি হাতিটারই মতো অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

দুর্গাদা গুটিগুটি ওই মানুষটার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর তাকে ভালো করে দেখে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নালার দিকে ফিরে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। বসে পড়ে আমাকেও ডাকল ইশারাতে।

জিপের ইঞ্জিন তখনও চলছিল। সেটাকে বন্ধ করে রাইফেল হাতেই আমি দুর্গাদার কাছে গিয়ে পাশে বসলাম একটা পাথরের উপরে। তারপর ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি দেরি করলে কেন? জল খেতে কতক্ষণ লাগল তোমার?'

দুর্গাদা বলল, 'জল খেতে আর পারলাম কোথায়?'

'সে কী! কী করলে তাহলে এতক্ষণ!'

'নালার কাছে গিয়ে একটু পরিষ্কার জল দেখে নীচু হয়ে বসেছি, আর দেখি হাতি।'

'কোথায়?'

'আমার ঠিক পেছনে।'

'বলো কী! তারপর?'

'আর কী। জল খাওয়া তো মাথায় উঠল। সামনেই একটা মস্ত আম গাছ ছিল। কিন্তু সেটা এতই মোটা যে, দু-হাতে তার বেড় পাওয়া অসম্ভব। অতএব তার পাশেই

যে কসসি গাছ ছিল, সেই গাছে বাঁদরের চেয়েও তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম তরতর করে। হাতি একবার শুঁড় বাড়িয়ে ধরার চেষ্টাও করল আমাকে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, সে আমার প্রতি আর মনোযোগী নয়। একটুও শব্দ করল না কিন্তু।'

'হাতি ওখানে ছিল তো ঋজুদাদের ধরল না কেন?'

'আমিও তো তাই ভাবছি।'

'হাতি একবার শুঁড় দিয়ে ধরবার চেষ্টা করে যখন আমার নাগাল পেল না, তখনই তোমার দিক থেকে একটা শম্বর ডাকল ব্বাক করে। তুমি কোনো শম্বর দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ। শম্বরটা বন থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখেই ডেকে আবার বনের ভিতরে চলে গেল।'

'কী শয়তান হাতি দেখ।' শম্বরের ডাক শুনে ও বুঝেছিল যে, শম্বরটা কিছু দেখে অবাক হয়েছে। তবে বাঘ দেখেনি। বাঘ দেখলে শম্বরটা যেমন করে ডাকে, সে ডাক অন্য।'

'হাতিটা শম্বরের ডাক শুনেই সঙ্গেসঙ্গে জঙ্গলের ছায়ায় ছায়ায় সোজা ডান দিকে চলে গিয়ে বাঁ-দিকে গিয়ে তোমার দিকে চলে এসেছিল।'

'ওই লোকটা এল কোথা থেকে? লোকটা কে?'

'তা কী করে জানব। তবে ও তো আমাদের কম্ফু। আহা, কার কী পরিণতি! ও কত বড়ো ডাক্তার ছিল, তোমরা বিশ্বাস করবে না। ওর কাছে কর্কট রোগের ওষুধ ছিল, জান?'

'মানে ক্যান্সারের ওষুধ?'

'হ্যাঁ। না তো কী!'

'আমাদের একটা মোষের ভেঙে যাওয়া পা ও যেমনভাবে সারিয়েছিল অল্প দিনে, তেমনভাবে কটকের নামি হাড়ের ডাক্তার আর ছুরি-চালানো ডাক্তারেরাও পারত না। পুটকাসিয়া লতার গোড়া, কচি শিমুলের গোড়ার শিকড়, হাড়কঙ্কালির ছাল, জড়া তেলের সঙ্গে বেটে সেই ওষুধটা তৈরি করেছিল। তারপর সেই ওষুধ লাগিয়ে ডবা-বাঁশ কেটে প্লিন্টার তৈরি করে তা দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল পা। কম্ফুর মতো বদ্যি এদিকের পাহাড়-বনে কমই ছিল। সল্বপ-রস খেয়ে লোকে অসুস্থ হলে কম্ফু একটি বটি দিত আর সঙ্গেসঙ্গে সব ঠিক। বুঝে দেখো। একটি মাত্র বটি!'

'এতই বড়ো বদ্যি যদি সে, তাহলে তোমরা তাকে এমন করে মরতে দিলে কেন দুর্গাদা? তাকে ঘরে কেউই জায়গা দিলে না কেন?'

দুর্গাদা ডান হাতটা কোমর অবধি তুলল। তারপর অনেক কিছু বলতে চেয়েও থেমে গিয়ে সংক্ষেপে বলল, 'বন যাকে জাদু করে, মরণ যাকে ডাকে, তাকে ধরে

রাখে এমন সাধ্যি আছে কার? সবই আমাদের কপাল রুদ্রবাবু।'

'তা হাতিটা যদি ওখানেই ছিল, ঋজুদার আর রাজেনদাকে ধরল না কেন? ওরাই-বা দেখতে পেল না কেন? অবাক কাণ্ড!'

'সত্যিই তাই। হাতি তো ছিলই। একেবারে ওদের পাশেই ছিল। দোষ তো রাজেনের। মাঠিয়াকুদু নালাতে হাতির পায়ের ছাপ কাল যেখানে দেখেছিল সটান সেখানেই নিয়ে যাচ্ছিল ঋজুবাবুকে। আরে, কাল যেখানে হাতি ছিল আজও যে ঠিক সেখানেই থাকবে, একথা কোনো শিকারির পক্ষে কী করে বিশ্বাস করা সম্ভব হল, তা তো আমি ভেবে পাই না। আসলে ঋজুবাবুর পোশাক, হাতের রাইফেল আর পাইপের গন্ধে হাতি সামলে নিয়েছিল নিজেকে। রাজেন একা থাকলে আজ কস্ফু বেঁচে যেত। ওই মরত।'

'ঋজুদারা গেল কোথায়?'

'হাতির পিছনে।'

'দেখা পাবে? পেছনে পেছনে দৌড়ে?'

'পাগল! হাতি ততক্ষণে দু-মাইল চলে গেছে। গেণ্ডুলি বনের বাঁ-দিকে একটা বড়ো দহ আছে। মাঠিয়াকুদু নালাটা গিয়ে পড়েছে সেখানেই। ওই নদীতে দহমতো আছে একটা। হাতি নিশ্চয়ই দুপুর বেলাটা সেখানেই গা ডুবিয়ে থাকবে।'

'তুমি যদি জানই তবে সঙ্গে গেলে না কেন?'

'আমাকে নিয়ে গেলে তো। রাজেন এ জঙ্গলের কী জানে? ও রেড়াখোল আর ঢেনকানলের জঙ্গলের মুহুরি। এই মাঠিয়াকুদুতে আমি পরপর পাঁচ বছর ক্যাম্প করে থেকেছি। ফুটুবাবুদের লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে এই জঙ্গল থেকে। এমন ভালো কাঠ খুব বেশি জঙ্গলে নেই। তা রাজেন মাতব্বরের আমার সঙ্গে শলা করারও সময় হল না।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু ঋজুদার কি জানে না তোমার অভিজ্ঞতার কথা?'

'জানবে না কেন? ওই রাজেনের লোভ।'

'কীসের লোভ?' অবাক হয়ে বললাম আমি।

'ঋজুদা বলেছে না ওকে একটা থ্রি-ফিফটিন রাইফেল কিনে দেবে এবং ডিভিশনাল কমিশনারকে বলে লাইসেন্সও করিয়ে দেবে। তাই ও তেল দিচ্ছে ঋজুবাবুকে। তেল দিতে গিয়ে ঋজুবাবুর প্রাণটাই নিয়ে নেবে যা মনে হচ্ছে তাতে।'

'তেল দিলে ঋজুদার কি বুঝতে পারত না?'

'কী যে বলেন রুদ্রবাবু! নেতারাও পর্যন্ত বুঝতে পারলেন না, আর ঋজুবাবু! তেলের মতো সাংঘাতিক বিষ আর নেই। তা ছাড়া রাজেন আমাদের হুঁশিয়ার লোক।

তেল কি সকলে দিতে জানে? মবিলের ফুটোয় পেট্রল, আর পেট্রলের ফুটোয় মবিল দিয়ে দিলেই সব গোলমাল। রাজেন তেমন ভুল করে না। চালু পাট্টি।'

'রাজেনদা তো খুব ঠান্ডা লোক। মুখে কথাটি নেই। কারও নিন্দা করে না কখনো। তুমি তার সম্বন্ধে এমন খারাপ কথা বলছ কেন আমাকে? শুনে আমার কী লাভ?'

'ভাবছ তাই। ও জায়গা বুঝে চলে। হাড়কেপ্পন বদমাশ লোক। জায়গা বুঝে দাতা। জায়গা বুঝে বক্তা। নিজে হাতে পিঁপড়ে মারে না বলে মানুষে জানে, অথচ বাঘ-ভাল্লুক ওই মারে আকছার। তবে অন্যের ঘাড়ে বন্দুক দিয়ে। কারও জানবার জো-টি পর্যন্ত নেই। বড়ো সাংঘাতিক মানুষ আমাদের এই ভাজা মাছটি উলটে খেতে-না-জানা ভাব করা রাজেন। আমাদের এই গুন্ডা হাতির চেয়েও ও বেশি ভয়ের।'

'এত জেনেও তাহলে সঙ্গে থাক কেন?'

'ওই তো। আমাদের মালিক যে এক। মালিক যদি চোখ বন্ধ করে থাকেন, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন, শুধুই নিজের লাভের কড়ি গোনেন তবে রাজেনের মতো মানুষের বাড় বাড়বে না। লাভ-লোকসান ছাড়াও কিছু অঙ্ক থাকে জীবনে, যা সময়ে না মেলালে পরে আর মেলে না। বুঝেছ রুদ্রবাবু।'

এতসব বড়ো বড়ো এবং গোলমেলে কথা আমার মাথা গোলমাল করে দিল। দুর্গাদাকে আমার যেমন ভালো লাগে, তেমনই রাজেনদাকেও লাগে। এসব শুনতে আমার ভালো লাগছিল না।

আমার মনের কথাই যেন বুঝতে পেরে দুর্গাদা বলল, 'পৃথিবীর সব মানুষ, সব জানোয়ারই ভালো ঋজুবাবু, এমনকী এই হাতিটাও ভালো। ভালো, যতক্ষণ না তোমার স্বার্থে সে হাত দিচ্ছে। স্বার্থে হাত পড়লেই শুধু বোঝা যায়, স্বার্থ ভাগাভাগি করে খাওয়ার সময়েই জানা যায় কে কত ভালো। তার বাইরের ভালো-মন্দ নেহাতই পোশাকি। বুঝেছ?'

ঋজুদার আর রাজেনদার গলা শুনতে পেলাম। ওরা ফিরে আসছে।

ওদের গলা শুনে আমি ও দুর্গাদা উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

'কী হল?' আমি বললাম।

ঋজুদার হাসছিল। বলল, 'কিছু হয়নি এখনও, তবে হতে পারে।'

দুর্গাদা বলল, 'বড়ো নদীর দহটার দিকে গেছিলে?'

ঋজুদার অবাক হয়ে বলল, 'কোন দহ?'

রাজেনদা বোকার মতো চেয়ে রইল।

দুর্গাদা বলল, 'রাজেন কি জান দহটার কথা?'

বিরক্তির গলায় রাজেনদা বলল, 'কোন দহ? এ জঙ্গলে কোনো দহ-টহ নেই। মাঠিয়াকুদুতে চাকরি করেছ সুরবাবুদের ক্যাম্পে, তা বলে জঙ্গল আমার চেয়ে তুমি

ভালো চেনো দুর্গা তা আমি বিশ্বাস করি না।'

দুর্গাদা চুপ করে রইল, মাথা নামিয়ে। তারপর বলল, 'তবে তাই।'

ঋজুদার বলল, 'রাজেন, আগে কম্ফুর কী বন্দোবস্ত করবে, তা ঠিক করো। ওর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই?'

'এক ভাই আছে।'

'কোথায়?'

'চৌ-দুয়ারে।'

'সে তো অনেক দূর। এক্ষুনি যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া যে-ভাইদাদাকে এইভাবে আজ দু-বছর ছেড়ে রেখেছে জঙ্গলে-পাহাড়ে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়, সে মুখে আগুন দিল কি দিল না তাতে যায় আসে না কিছুই। ওকে আমরাই দাহ করব মাঠিয়াকুদু নালার ধারে। সেখানেই বহু বছর ও থেকেছে। ক্যাম্পে কাজ করেছে। চলো, আমরা ওকে সেখানেই বয়ে নিয়ে যাই। দাহ করব রাতে। রাজেন তুমি বন্দুক হাতে গাছে বসে ওর শব পাহারা দেবে। ততক্ষণে দুর্গাদাকে নিয়ে আমরা হাতিটার একটু খোঁজ করে আসি।'

'এখন যাবেন? এই রোদে! দুটো তো প্রায় বাজতে চলল। খাওয়াদাওয়া?' রাজেন বলল।

এই কথাতে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে তাকাল ঋজুদার রাজেনের দিকে।

তারপর বলল, 'কম্ফুকে তো আমার চেয়ে তোমরা অনেক বেশি চেনো। তোমাদেরই সহকর্মী ছিল সে। তার মৃত্যুর কারণে আমাদের সকলেরই আজ উপোস। তার আত্মার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য।'

দুর্গাদা বলল, 'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। তাই তো করা উচিত।'

ঋজুদার বলল, 'চল, নালা থেকে পেট ভরে জল খেয়ে নিই। যা রোদ। কখন আবার খাওয়া জোটে তার ঠিক কী।'

'আদৌ কোনোদিন জোটে কি না, তারই বা ঠিক কী!' আমি বললাম, কম্ফুর দিকে চেয়ে।

'যা বলেছিস।' ঋজুদার বলল।

বললাম, 'চলো।'

ঋজুদার বলল, 'তার আগে চল সকলে ধরাধরি করে কম্ফুকে ছায়াতে নিয়ে গিয়ে শোওয়াই। বড়ো রোদ লাগছে বেচারার। একটা মানুষের মতো মানুষ ছিল রে কম্ফু। ওর বউ ওর মতো মানুষের দাম বোঝেনি।'

আমি বললাম, 'যদি নাই-বা দাম বোঝে কেউ, তাহলেও চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার তো কোনো মানে নেই।'

'নিশ্চয়ই নেই।' ঋজুদার বলল।

আগে আমরা রাইফেলগুলো জিপে রাখলাম। জিপটাকেও ছায়াতে নিয়ে এসে দাঁড় করালাম। তারপর চার জনে হাত লাগিয়ে ওই রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডকে বয়ে নিয়ে এসে নালার পাশে ঠান্ডা স্নিগ্ধ জায়গাতে রাখলাম। রেখে, নালার জলে হাত ধুলাম ভালো করে। মানুষের রক্তেও জানোয়ারের রক্তের মতো বদগন্ধ থাকে। তারপর উজানে গিয়ে পরিষ্কার জল দেখে চোখে-মুখে-ঘাড়ে-কানের পিছনে জল দিয়ে পেট ভরে জল খেলাম।

ঋজুদার বলল, 'চল এবার। ডে-লং-নাইট-লং ভিজিল। হাতিটাকে যখন চাক্ষুষ করা গেছে এই সুযোগ নষ্ট করলে চলবে না। তা ছাড়া কস্ফুকে ও এমন করে চোখের সামনে মারাতে ওর সঙ্গে আমাদের একধরনের ব্যক্তিগত শত্রুতাও জন্মে গেল। এখন ভেন্দেত্তার সময়। খুনের বদলা খুন।'

রাজেনকে নিজের পাইপের টোব্যাকো-পাউচ থেকে একটু সুগন্ধি তামাক দিয়ে ঋজুদার বলল, 'আচ্ছা রাজেন, আমরা তাহলে এগোচ্ছি। তুমি পারলে কিছু জ্বালকাঠ কেটে রাখো এখনই। ফিরে এসে আমরা কস্ফুকে দাহ করব।'

দুর্গাদা বলল, 'আমাদের মধ্যেও কাউকে করতে হতে পারে। কে বলতে পারে?'

ঋজুদার ধমকে বলল, 'বাজে কথা বলবে না দুর্গা। ভালো কাজে বেরোনোর আগে আজেবাজে কথা ভালো লাগে না।' তারপর বলল 'চলি আমরা রাজেন।'

'আইজ্ঞা।' রাজেনদা বলল।

আমরা তিন জনে গেণ্ডুলি বনের মধ্যে মাইল খানেক যাওয়ার পর ঋজুদার বলল, 'হাতিটা কিন্তু ওই দহ না কী বলছে দুর্গা, সেদিকেই গেছে। এতক্ষণে হাতির কাছে পৌঁছে যাওয়া যেত। কেন যে রাজেন বলল না।'

'রাজেন জানত না ঋজুবাবু।'

'তা তুমি এলে না কেন? আমি তো এবার শিকার করতে আসিনি। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করার সুযোগ পেলে ঝামেলাই মিটে যেত।'

'আমাকে তো ডাকলেনই না। ঝড়ের মতো চলে গেলেন। আমাকে তো থাকতেই বলে গেছিলেন।'

'তাও তো থাকলে না। হাতির হাতে মরার কথা তো তোমারই ছিল আজ।' আমি বললাম।

'তাই?' অবাক হয়ে ঋজুদার বলল।

'তাই নয়?'

মাথা নীচু করে দুর্গাদা বলল, 'জল খেতে গেছিলাম আর আম গাছ থেকে কিছু কাঁচা আমও পাড়তাম। পঞ্চমী কাঁচা আম খেতে খুব ভালোবাসে। বিয়ে হয়ে চলে

যাবে মেয়েটা।'

ঋজুদার সহানুভূতির গলায় বলল, 'যাই হোক, এমন মূর্খামি আর কোরো না।'

এটুকু বলেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল ঋজুদা।

'কী, হল কী?' আমি বললাম।

'হাওয়া ঘুরে গেছে।'

দুর্গাদা সঙ্গেসঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে মাটি থেকে একমুঠো ধুলো নিয়ে উড়িয়ে দিল। ধুলোগুলো আমাদের সোজা সামনে উড়ে গেল। দুর্গাদার মুখ প্রসন্নতায় ভরে গেল।

'কী?' ঋজুদার শুধোল।

'না। ঠিক আছে। আমরা দু-মাইল গিয়ে তারপর অপেক্ষা করব। এই হাওয়াতে হাতি গন্ধ পাবে না আমাদের। কারণ দহটা, আমরা যেখান থেকে বাঁয়ে মোড় নেব, সেখান থেকে প্রায় আধমাইলটাক ভেতরে।'

ঋজুদার বলল, 'বাঁচালে দুর্গা। তবে কথাবার্তা এখন থেকে একদম বন্ধ। কথাবার্তা হবে মাঠিয়াকুদু নালাতে কস্ফুর মৃতদেহের কাছে ফিরে গিয়ে।'

দুর্গাদাও সেকথাতে সায় দিল।

বৈশাখের মাঝামাঝি। রোদ বেশ কড়া। গাছে পাতা থাকলে রোদ অবশ্য বোঝাই যেত না। 'লু'-এর মতো দমকে দমকে বাতাস বইছে শুকনো পাতা আর লাল ধুলো উড়িয়ে। নাকের মধ্যে দিয়ে সে হাওয়া গিয়ে মাথার মধ্যে, যেখানে যা-কিছু আর্দ্রতা ছিল, তা শুকিয়ে দিচ্ছে।

আমরা সিঙ্গল ফরমেশনে হেঁটে চলেছি, সাদা ঝাঁঝ-ওঠা জঙ্গলে। মাথার নীচের খুলি গরম হয়ে উঠছে। গরম হয়ে উঠছে রাইফেল। যেখানে হাত লাগছে, ইস্পাতে, ছেঁকা লেগে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে হাঁটছি আমরা। কিন্তু আস্তে হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে এই রোদে। ঘড়িতে দুটো বেজে পনেরো এখন। সকাল থেকে সেই ডিমের পোচ আর চা ছাড়া পেটেও কিছু পড়েনি।

ঋজুদার ফিসফিস করে কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বলল, 'এক কাপ চা পেলে বেশ হত। কী বল?'

মাথা নাড়লাম আমি। ভাবছিলাম, ভটকাই আর তিতির, এবিকাকু আর ফুটুদার তত্ত্বাবধানে জম্পেশ করে খেয়েদেয়ে এখন হয় ঘুম লাগিয়েছে, নয় ওয়ার্ড-মেকিং খেলছে। দরজা-জানালা বন্ধ ঠান্ডা ঘরে। এই গেণ্ডুলির বনে যদি কেউ পথ হারায় তো পথ সে খুজে পাবে না বছরের অন্য সময়ে। এখন ন্যাড়া বলে আমাদের ডান দিকের উঁচু পাহাড়, মায় লালমাটির রাস্তাটাসুদ্ধু দেখা যাচ্ছে। সেই সিঙাল-শম্বরটা ওই রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে একা হেঁটে যাচ্ছে শিং উঁচিয়ে খাঁ খাঁ রোদে।

ভাবছিলাম, যত পাগল এসে জুটেছে এখানে, কি মানুষ, কি জানোয়ার।

কতক্ষণ হাঁটলাম, খেয়াল ছিল না। একসময় ঘড়িতে দেখলাম, সাড়ে-তিনটে বাজে।

দুর্গা ইশারাতে বলল, এবার আমাদের বাঁয়ে মোড় নিতে হবে। আধ মাইল গেলেই দহ। সেখানে গভীর জঙ্গল। ছায়াচ্ছন্ন। নিবিড়। এই গ্রীষ্মেও আরাম। হাতিও সে কারণেই গেছে। এয়ার কন্ডিশন্ড কমফর্টে।

ঋজুদার একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে কী যেন ভেবে নিল। তারপর পাইপটাকে নিভিয়ে, ছাই ঝেড়ে বেল্টের সঙ্গে গুঁজে রাখল।

দুর্গাদা একটা বিড়ি ধরিয়েছিল। বিড়িটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ঋজুদা। তারপর আমরা বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে আস্তে আস্তে এগোলাম।

কিছুক্ষণ চলার পরই অন্যান্য গাছ দেখা যেতে লাগল। যাদের পাতা ঝরে না এবং ঝরলেও ঝরে শীতকালে। একটু একটু ছায়া পেতে লাগলাম এখন। হাওয়াও তত গরম লাগছে না আর। জলের দিকে এগোচ্ছি বলেও হয়তো-বা। আর-একটু যেতেই লাল কাদা মেখে লালমুখো সাহেব-হয়ে-যাওয়া একদল শুয়োরের সঙ্গে দেখা হল আমাদের। তাদের মধ্যে কয়েকটি বেশ বড়ো দাঁতাল ছিল।

আমরা থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সম্মান দেখালাম ওদের, যোগ্য সম্মান। শুয়োর-ঢুঁ যে খেয়েছে সেই সম্মান দেখায়। আমরা সকলেই কখনো-না-কখনো খেয়েছি। শুয়োরেরা জলের দিকে চলে গেল। আমরা যেদিক দিয়ে গেণ্ডুলি বনে ঢুকেছিলাম, ওরা তার উলটো দিক থেকে এসেছিল। তারও পর দেখা হল একদল বিরাট বিরাট গল্বর সঙ্গে। গয়াল বা ইন্ডিয়ান বাইসন। তারা শুয়োরেরা যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে চলে গেল। মানে, দহর দিকে। তারাও আমাদের কিছু বলল না।

কোনো বার্কিং-ডিয়ার বা হনুমানের দল আমাদের দেখে ফেললেই মুশকিল ছিল। তাদের অ্যালার্মকল-এ হাতি হয়তো সাবধান হয়ে যাবে। ডিড-ড্য-ডু-ইট বা ল্যাপউইগ পাখির নজরে পড়লেও বিপদ ছিল। জানাজানি কানাকানি হয়ে যেত। মুশকিল হত ধারে-কাছে অন্য হাতিরা থাকলে। তা নিশ্চয়ই নেই। থাকলে গুন্ডা হাতি এসে এখানে থাকত না।

ঋজুদাও বলছিল পথে আসতে আসতে যে, বহুবার মাঠিয়াকুদু নালার ক্যাম্পে এসে থেকেছে ফুটুদার সঙ্গে, কিন্তু এখানে হাতি কখনোই দেখেনি। জায়গাটা উপত্যকা, তায় একটা খোলের মধ্যে। এখানে ঢোকা সোজা। বেরোনো মুশকিল। তা ছাড়া বসতিও খুব দূরে দূরে। খেতের ফসল, যেমন ধান, এই খোলের মধ্যে হয়ই না মানুষের বসতি না থাকাতে। গুন্ডা হয়ে গেছে বলেই বোধ হয় হাতিটা এই নিরিবিলি গর্তে এসে রয়েছে। এর দৌড় এখান থেকে লবঙ্গি ও পম্পাশর।

কুড়ি মিনিট পথ খুব আস্তে আস্তে গিয়ে আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। এতক্ষণ দুর্গাদা আর ঋজুদার হাতিটার পায়ের দাগ নজর করে করেই আসছিল। এখন এই জায়গাটা ঘন ঘাসে ভরা থাকায় পায়ের দাগ নজর করার অতখানি সুবিধে হচ্ছিল না, কিন্তু জমি নরম বলে হাতির ওজনের কারণে সুবিধেও হচ্ছিল পায়ের দাগ খুঁজতে, চারদিক দিনমানেই এখন অন্ধকার। আন্দাজে আর এগোনোও যায় না। সামনে শ-খানেক গজ দূরেই মস্ত দহটা। নালাটা এখানে এসে ছড়িয়ে গেছে যে, শুধু তাই-ই নয়, প্রতি বছর নানা জানোয়ারে গরমকালে এখানে এসে গা ডুবিয়ে বসতে বসতে বা ওয়ালোয়িং করাতে জায়গাটা খুব গভীরও হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

ঋজুদা, দুর্গাদাকে ইশারাতে বলল, ঝাঁকড়া একটা কসসি গাছে চড়ে দেখতে। এবং হাতিকে দেখতে যদি পায়, তবেই আমাদের ইশারা করে জানাতে। নইলে চুপ করে থাকতে। দুর্গাদাই এখন আমাদের স্কাউট।

হাতি যতক্ষণ দহতে গা ডুবিয়ে থাকবে, যদি আদৌ এখানে থেকে থাকে তবে তখন গুলি করা চলবে না। সেটা আনস্পোর্টসম্যানসুলভ হবে। তা ছাড়া কাদায়-থাকা অবস্থায় হাতি মারা গেলেও তাকে তোলা যাবে না। দাঁত এবং গোড়ালি কেটে নেবার অনেক অসুবিধে হবে।

দুর্গাদা খুব আস্তে আস্তে গাছে চড়তে লাগল। এই গাছের ডাল খুব শক্ত হয় বলে এই গাছেরই কাঠ দিয়ে ওড়িশার গ্রামাঞ্চলে গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করে মানুষেরা।

ঋজুদার দুর্গাদাকে বলে দিয়েছিল যে, হাতিকে দেখতে পেলেই একবার ডান হাত নাড়াবে। হাতি যদি কাদায় বসে থাকে তবে দুর্গাদা নিজের মাথায় হাত দেবে। তারপর হাতি যখন কাদা ছেড়ে উঠবে, তখন দু-বার পরপর মাথায় হাত দেবে।

ভাবছিলাম, অত হাত-নাড়ানাড়ি ও মাথায়-হাতে হাতির যদি চোখে পড়ে যায়? হাতি অবশ্য তেড়ে এলে দুর্গাদা চেঁচিয়েই সে বার্তা আমাদের জানাতে পারে। বড়ো গাছে চড়ে থাকলে হাতি কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। তা ছাড়া একলা হাতি। দলে তো নেই। চেঁচিয়ে বললে, বার্তা পাব ঠিকই, কিন্তু আমাদের কাছে বার্তা পৌঁছোনোর সঙ্গেসঙ্গে হাতিও হয়তো পৌঁছে যাবে।

আমরা দেখলাম, দুর্গাদা খুব সাবধানে একটু একটু করে উপরে উঠল। তারপরে বেশ উঁচু ডালে উঠে পাতার আড়ালে বসে চারধারে ইতিউতি চাইতে লাগল। ঠাহর দেখে মনে হল, সে এখনও দেখার মতো কিছু দেখতে পায়নি। তাহলে? হাতি কি চলে গেছে দহ ছেড়ে? অথবা দহতে নামেইনি আদৌ?

এখন দুর্গাদার কাজ হল, হাতি দেখা। আর আমাদের কাজ হল, দুর্গাদাকে দেখা।

একটুক্ষণ পর নাক উঁচিয়ে যেন অনেক দূরে তাকিয়ে হাতিকে দেখতে পেয়েছে এমন ভাবভঙ্গি করে একবার ডান হাত নাড়ল সে। পরক্ষণেই নিজের মাথায় হাত দিল। আমাদেরও আক্ষরিকভাবে মাথায় হাত দেবার অবস্থা। তারপর আমাদের দিকে চেয়ে হাত প্রসারিত করে বোঝাল যে, হাতি একটু দূরে আছে। কাছের দহে নেই।

ঋজুদার হাত নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে।' মানে আমরা বুঝেছি তার সংকেতের অর্থ।

ভাবছিলাম, কম্যান্ডোদেরই মতো প্রত্যেক ভালো শিকারিরই সিগন্যালিং-এ ভালো ট্রেনিং থাকা দরকার। তারপর ঋজুদার আমাকে কানে কানে বলল, 'বিশ্রাম করে নে একটু।'

জায়গাটা বিশ্রাম করার উপযুক্তই বটে। কুসুম গাছের লাল ফুলে ফুলে মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে বনে বনে। চারধারে গ্রীষ্মবনের মধ্যেও নানা জলজ গন্ধ ও শব্দ। তার মধ্যে স্কার্লেট-মিনিভেট, বুলবুলি, বউ-কথা-কও, কোকিল, আরও কত পাখি যে ডাকতে ডাকতে ফুল ঝরিয়ে ওড়াউড়ি করছে, তা কী বলব। বড়ো বড়ো সব গাছের নীচে নীচে অর্গুন গাছ। ভারি সুন্দর দেখতে এদের পাতা। চেরা চেরা বটল গ্রিন এদের পাতা। কার্তিক-মাঘ মাসে সুপুরির মতো দেখতে, ফলসারঙা গোল গোল ফল ধরে এই গাছগুলোতে। জলপাই-এর মতো স্বাদ। টক করে খায় পাহাড়-বনের গ্রামের লোকেরা। অর্গুনের কচি পাতাও বর্ষাকালে টক করে খায়। অর্গুন ফল বিছানাতে রাখলে ছারপোকা হয় না বিছানাতে।

কুসুম আর হরজাই বনের ওধারে শুধুই গেণ্ডুলি। শিমুল এবং পলাশও আছে। বাঁশের বনে ফুল ফোটা শেষ। মরার পালা এবার। কিন্তু জংলি আম গাছগুলোতে বোল এসেছে। জংলি কাঁঠাল গাছে মুচি। রুখু হাওয়াতে তাদের মিষ্টি গন্ধ ভাসছে। অনেক গাছে 'পন্বস' ধরে গেছে। ওড়িয়াতে কাঁঠালকে বলে পন্বস। এঁচড় এবং

কাঁঠালের একই নাম। আদিগন্ত লাল ফুলের মাঝে মাঝে আমের সাদা সাদা ফুলগুলোকে দারুণ দেখাচ্ছে।

বেলা পড়ে আসছে। নানা জানোয়ার দলে দলে আসছে। নানা পাখি। দূর থেকে হুঁ-য়া-ও করে বাঘ ডেকে উঠল। জলে আসছে বোধ হয়। এখনও দূরে আছে অনেক। বাঁশে বাঁশে কটকটি আওয়াজ উঠছে। ঝরা পাতারা উশখুশ করে ঝরে পড়ছে। মৌটুসি পাখি তারই মধ্যে ফিসফিস করছে। শেষ বিকেলের হাওয়ায় পাতা দুলছে। আলো-ছায়ার চিরুনি বুলোচ্ছে দীর্ঘ চুলের গাছেরা সন্ধ্যের আগে। কাঁপা কাঁপা চিলতে চিলতে রোদ ঝলকাচ্ছে তাদের পাতায় পাতায়। একজোড়া নীলচেরঙা রক-পিজিয়ন গুটিগুটি পায়ে পাথরের আলসেতে পায়চারি করছে। যেন, রিটায়ার্ড বুড়োর সঙ্গে বুড়ি। চারদিকের এই গন্ধের সমারোহ ও শব্দমঞ্জরির মধ্যে আমার ক্লান্ত চোখ মুহূর্তে জড়িয়ে এল। ঋজুদার পাশে থাকলে কোনো ভয় নেই। যমদুয়ারেও ঘুমোতে পারি আমি। ঘুমিয়ে পড়লাম।

হাতিটাও কি ঘুমোচ্ছে এখন? লাল থকথকে কাদার মধ্যে গা ডুবিয়ে গাছের ছায়াতে? কী স্বপ্ন দেখছে ও কে জানে? হয়তো গাইছে নয়নামাসির মতো সেই রবীন্দ্রসংগীতটি:

এ পরবাসে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে।।
হেথা কে রাখিবে দুখভয়সংকটে-
তেমন আপন কেহ নাহি হে প্রান্তরে হায় রে।।

হাতিটারও একদিন সব ছিল। সবাই ছিল। আজ কেউই নেই। কস্ফুরই মতো। কস্ফুর ইতিহাস জানলে উন্মাদ হাতিটা উন্মাদ কস্ফুকে হয়তো ক্ষমা করে দিত। একজন বিতাড়িত, অপমানিত মানুষ আর একটি হাতির মধ্যে হয়তো একধরনের সখ্য জন্মাত। যা জন্মালে স্বজনবিরোধ ঘটাত না হাতিটা।

হাতির চোখ দিয়ে তো জল পড়ে দুঃখ হলে। হাতিটা কি কাঁদছে এখন? তার চোখের জল নিঃশব্দে গিয়ে মিশছে দহর জলে?

এ ছায়াচ্ছন্ন দহর মধ্যে আমি মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছিলাম। আজ কেউ মরবে। হয় আমাদের মধ্যে কেউ, নয় হাতিটা। মৃত্যুর গন্ধটা কোনো ঝাঁঝালো নাম-না-জানা ফুলের গন্ধের মতো। হাওয়ার দমকে ভেসে আসে। নাক জ্বালা করে। পরমুহূর্তে ভেসে চলে যায়।

কতক্ষণ পরে ঠিক জানি না, যেন একযুগ পরে, ঋজুদার ঠেলা মারল আমাকে আস্তে করে। পেটে।

তাকিয়ে দেখি ঋজুদার হাঁটু গেড়ে বসে সাবধানে মাথা উঁচিয়ে দেখছে।

আমিও তাই করলাম।

শুনতে পেলাম খলবল, হাপুস হুপুস, পকাত চকাত বিচিত্র সব শব্দ। লাল কাদা-জল মেখে একটা লাল পাহাড়ের মতো ঘোলা, বিচ্ছিরি, লাল কাদা দহ থেকে উঠল গুন্ডা হাতিটা। আমাদের সামনে যে দহ, তাতে সে ছিল না, ছিল তার পেছনের দহে। তার প্রকাণ্ড দাঁত দুটোও লাল কাদাতে লাল হয়ে গিয়েছিল। হাতি শুকনো ডাঙায় উঠেই বড়ো বড়ো পা ফেলে নালা পেরিয়ে ঘন হরজাই বনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল, আমরা যেদিক থেকে এসেছিলাম সেই দিকে মুখ করে। বোধ হয় গেণ্ডুলি বনের দিকেই যাচ্ছে।

ঋজুদার বুকে হেঁটে ঠিক নয়, নীচু হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতিটার দিকে এগোতে থাকল ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে, আমাকেও এগোতে ইশারা করে। হাতিটা প্রথম চালে অনেকখানিই এগিয়ে গিয়েছিল। হাতি জোরে চললে মানুষের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া ভার। তবে এখন চলছে বেশ আস্তে। তবুও গজেন্দ্রগমন বলে কথা। গতি কমিয়েছে। কেন যে, সে সেই জানে।

এবারে আমরা প্রায় হাতিকে ধরে ফেলেছি। কিন্তু আমাদের আসার কথাটা সে যেন না জানে। এখানে জঙ্গল খুবই গভীর। সব গাছেই পাতা আছে। অস্তগামী সূর্যের আলো খুব কমই পৌঁছেছে। যখন হাতিকে প্রায় ধরে ফেলেছি, হাতির বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, ঠিক তখনই হঠাৎ হাতিটা হারিয়ে গেল।

কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল অতবড়ো জানোয়ারটা, বুঝতে পর্যন্ত পারলাম না একটুও। আমাদের দু-জনের কেউই নয়। আর ঠিক সেই সাংঘাতিক মুহূর্তের ঋজুদার 'আঁক' শব্দ করে একটা বড়ো গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। মস্ত বড়ো শিমুলের শিকড়ের আঘাত লাগল কোমরে। মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। মনে হল, কোমরের হাড় ভেঙে গেছে বুঝি। যে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়ল, তারা ঝরঝর শব্দ করে নড়েচড়ে উঠল। ভয়ে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। এই নিবিড় জঙ্গলে গরমের দিনে রাত নামার ঠিক আগে আগে জলের পাশে সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে খুনি গুন্ডা হাতিটাও ইচ্ছে করে হারিয়ে গেল আর ঋজুদাও পড়ে গেল এমনভাবে যে, শিগগিরই যে সে উঠতে পারবে, মনে হল না।

ঋজুদার দিকে আমি অসহায়ের মতো তাকালাম এক ঝলক। তখন সমবেদনা জানাবার সময় ছিল না।

ঋজুদার কথা না বলে, নিজের রাইফেলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমার রাইফেলটা নিজে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল রাইফেলটার নল সামনে করে। আমাকে ইশারাতে বলল, এগিয়ে যেতে।

কমান্ডারের আদেশ। এবং সামনে অমিত পরাক্রমশালী অদৃশ্য শত্রু। এগিয়ে যেতে লাগলাম আমি নীচু হয়ে। প্রায় লেপার্ড-ক্রলিং করে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল কস্ফু-বদ্যির তালগোল পাকানো রক্তাক্ত পিণ্ডের মতো মৃতদেহ। ভাবছিলাম, মানুষের মৃত্যু কত বিভিন্ন রূপ ধরেই না আসে।

ঋজুদার আছাড় খেয়ে পড়বার সময় শব্দ হয়েছিল আগেই বলেছি। তার চেয়েও বড়ো কথা গুলি-ভরা রাইফেলের গুলি ছুটে যেতে পারত। এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তা ঘটেনি। একটাই ভরসার কথা ছিল এই যে, হাতিটাকে আমরা হারিয়ে ফেলার আগে হাতির মুখ ছিল সামনে, মানে, আমাদের ঠিক উলটো দিকে এবং ঋজুদার পড়ে যাওয়ার আওয়াজ যদি সে শুনেও থাকে তবুও সে হয়তো আমাদের অবস্থানটি দেখেনি। এই ভেবেই সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম নিজেকে। হাতি শব্দ শুনলে বা ঋজুদাকে দেখতে পেলে এতক্ষণে রে রে করে তেড়ে আসত নিশ্চয়ই।

এগিয়ে তো গেলাম, কিন্তু প্রায়ান্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া গুন্ডা হাতির পেছনে আন্দাজে যাবটা কী করে? ঋজুদার কাছ থেকে আমি প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে এসেছি। ঋজুদাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। দ্রুত আমার চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। বনের চন্দ্রাতপের নীচে আছি। বড়োজোর মিনিট-পাঁচেক রাইফেল দিয়ে গুলি করার মতো আলো থাকবে এখানে। ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে এল। ঘাম দিতে লাগল খুব। আর না এগিয়ে উবু হয়ে বসে আমি ফ্রিজ করে গেলাম রাইফেলটাকে রেডি পজিশানে ধরে। রাইফেলটাও তেমন। চোদ্দো পাউন্ড ওজন। ফ্রিজ করে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে দেখতে লাগলাম। এতই আস্তে যে, কোনোরকম চাঞ্চল্য যেন কারও চোখেই না পড়ে তা নিশ্চিত করে। কিন্তু কিছুই যে দেখতে পাই না। চারধারেই গাছের কাণ্ড। গাছেরা চারপাশে আমাকে ঘিরে আছে। তাদের সোঁদা গন্ধ গা নিয়ে। মোটা গাছ, মাঝারি গাছ, সরু গাছ। সার সার নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। একটা কুটুরে ব্যাং ঠিক সেই সময়ে কুটুর কুটুর ডেকে উঠল, হয়তো আমাকে ভয় পাওয়াবারই জন্য।

একবার ডাইনে থেকে বাঁয়ে আর-একবার বাঁ থেকে ডাইনে ঘাড় পুরো ঘুরিয়ে নিয়ে দেখলাম এবং ঘাড়টা ঘোরানো দ্বিতীয়বার যখন শেষ করে এনেছি প্রায়, ঠিক সেই সময়েই আমার হৃৎপিণ্ড একদম বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, আমার ডান দিকে খুবই কাছে দুটো গাছের গুঁড়ির রং সাদাও নয়, কালোও নয়। লাল। এবং সেই দুটো গুঁড়ি থেকে তখনও কাদা ও জল ঝরছে। চোখের দৃষ্টি যতখানি তীক্ষ্ণ করা যায়, ততখানি তীক্ষ্ণ করে আমি সেই লাল গুঁড়ি দুটোকে লক্ষ করে দেখলাম আরও একটি মরা গুঁড়ি সামনে আছে। তারপর দুটো মোটা লাল গুঁড়ির মধ্যে এবং একটি

গুঁড়ির সঙ্গেই প্রায় আরও একটা গুঁড়ি চোখে পড়ল। আমার মধ্যে থেকে কে যেন চিৎকার করে বলে উঠতে গেল: হাতি-ই-ই-ই।

কিন্তু অন্য কেউ আমার মুখ সজোরে চেপে ধরল দু-হাতে। কম্ফুর চেহারাটা আবারও মনে পড়ল।

পেশি এবং স্নায়ু যথাসাধ্য শক্ত করে আবারও আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনে চেয়ে দেখলাম কেউ নেই। তখনও ঋজুদার সেই গর্ত থেকে উঠে আসতে পারেনি।

কিন্তু দুর্গাদা? পরমুহূর্তেই ভাবলাম, সেই-বা খালি হাতে এসে কী করবে? ঋজুদার সঙ্গে দেশে-বিদেশে অনেক বিপজ্জনক প্রাণীর মুখোমুখি হয়েছি, আজ অবধি কিন্তু এমনটি বিপদ আর কখনো হয়নি। নিজেকে শক্ত করতে লাগলাম। ভটকাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল, 'ব্রাদার, লাইফে তোমার আসলে কেউই নেই। একা এসেছ, একা যাবে। তুমি পটল তোলার পর তোমাকে কেউ বারোটি ঘণ্টাও মনে রাখবে না। এই হচ্ছে সার কথা। তবে আর ভয়-ভাবনা করা কেন?'

হাতিটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতিই তো? এত কাছে? মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠান্ডা সাপ নেমে গেল। পাগুলো ও শুঁড়টাতে এতটুকুও কম্পন নেই। এত বড়ো একটা জানোয়ার কী করে যে এমন নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। হাতিটার মাথা বা কান কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শরীরের কোনো ভাইটাল অংশই নয়, যেখানে গুলি করতে পারি।

নিশ্বাস বন্ধ করে, তাকে আর-একটু ভালো করে দেখতে পাওয়ার আশায় আমি একগজ এগোলাম, চুলচুল করে করে যেন একযুগ ধরে। এবং এগোতেই, ডালপালার আড়াল সরে গিয়ে হাতির শরীরটা এবারে নজরে এল। তাও লাল কাদা-মাখা। হাতিটা আমার এতই কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে, ইচ্ছে করলেই আমাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে নিতে পারে। হাতিটার শুঁড় দেখে বুঝলাম যে, ঋজুদার যেখানে গর্তে পড়েছে সেই মস্ত শিমুলের দিকেই সে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। ঋজুদার আবার নড়াচড়া না করে! হাতিটা কি দেখতে পেল ঋজুদাকে?

আর ভাববার সময় নেই। হাতির মাথা বা কানের পাশে গুলি করার সুযোগ যখন নেই, তখন আমি মায়ের মুখ স্মরণ করে হাতির হার্টটা যেখানে থাকতে পারে বলে অনুমান করলাম, সেইদিকে নিশানা নিয়ে চুলচুল করে রাইফেলটা ওঠালাম। ফোর-সেভেনটি-ফাইভ ডাবল ব্যারেল, রাইফেলটার ওজন চোদ্দো পাউন্ড। এ রাইফেল কপিকলে করে তুললে মানায়। ঋজুদার মতো লম্বা-চওড়া মানুষ বলেই এই রাইফেল

অবহেলায় নাড়াচাড়া করে। অত ভাবার সময় আর নেই। আমি এখন আর আমি নেই। রোবট হয়ে গেছি কোনো। রিমোট কন্ট্রোলে ঋজুদাই যেন নির্দেশ দিচ্ছে।

নিনিকুমারীর বাঘ মারতে গিয়ে ভটকাইয়ের গুলি-করা বাঘিনি যে ডান হাতে জখম করে দিয়েছিল গত শীতে তা এখনও মাঝে মাঝেই কষ্ট দেয়। হাতটা এখনও এত ভারী আর বড়ো বোরের রাইফেল চালাবার মতো পোক্ত হয়নি। কিন্তু এখন শুধু ঋজুদার আর দুর্গাদার নয়, আমার নিজেরও প্রাণসংকট।

রাইফেলের নলটা সোজা হতেই ব্যাক-সাইট আর ফ্রন্ট-সাইট যতখানি ভালো করে পারি দেখে নিয়ে সেফটি ক্যাচ অন করতে করতেই ট্রিগারে ফার্স্ট প্রেশার দিলাম এবং পর মুহূর্তেই সেকেন্ড প্রেশার।

উপত্যকার ওই ছায়াচ্ছন্ন নিবিড় বনময় ঘেরাটোপের মতো নিশ্ছিদ্র জায়গাটিতে যেন কেউ কামান ছুড়ল। এইরকম শব্দ হল। দহর কাছে যত জীবজন্তু ও পাখি ছিল এবং যত জীবজন্তু ও পাখি এই রাইফেলের বজ্রনির্ঘোষ শুনল, তারা সকলে মিলে একই সঙ্গে প্রচণ্ড হইচই তুলল। তাদের ভয়ার্ত চিৎকার আহত হাতির ভয়কে আরও একশো গুণ বাড়িয়ে দিল। এবং সেই ক্যাকোফোনির মধ্যে হতভম্ব আমি দেখলাম যে, হাতিটা যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। ফোর-সেভেনটি-ফাইভ-এর গুলিও হজমিগুলির মতো হজম করে নট-নড়ন-নট-কিচ্ছু হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

গুলি কি তবে মিস করলাম? এত কাছ থেকে?

নার্ভাস হয়ে গেলে সবই হতে পারে। বড়ো বড়ো ওলিম্পিকে কমপিট-করা শিকারি দেড় হাত দূরে খরগোশ মিস করে, কিন্তু খরগোশ তো গুন্ডা হাতি নয়। হয়তো ট্রিগার-পুলিং ঠিক হয়নি, গুলি হাতির পিঠের উপর দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু গুলি মিস করলে আওয়াজ তো অন্যরকম হত। রাইফেল তুলে নিশানা নিয়েই মেরেছিলাম। তাও এত কাছ থেকে। হাতির গায়ে না লাগলে কোনো-না-কোনো গাছের ডালে লাগতই।

বাঁ-দিকের ব্যারেলেও হার্ড-নোজড বুলেট আছে আমি জানি। কারণ দুটো রাইফেলেরই গুলি আমিই এনেছি বাঘমুন্ডা থেকে। তবে যে গুলিটি করলাম তা সফট-নোজড হলে আমার মতো সুখী কেউ হত না। জানোয়ারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে সফট-নোজড-এর জুড়ি নেই।

কী হল ভাবছি, আর রাইফেলের ট্রিগার গার্ডে আঙুল ছুঁইয়ে বসে একদৃষ্টে সেই ভৌতিক হাতির দিকে চেয়ে আছি। ঠাকুরানির বাঘের পরে কি ঠাকুরানির হাতির খপ্পরে পড়লাম। অবিশ্বাস্য ব্যাপারস্যাপার বেশিদিন ভালো লাগে না আমার। মন দুর্বল হয়ে যায় বড়ো।

একদৃষ্টে চেয়ে আছি রাইফেল হাতে। মনে হল, হাতির লাল পাগুলো একটু একটু কাঁপছে যেন। তারপরই মনে হল থরথর করে কাঁপছে। যেই অমন মনে হল সঙ্গেসঙ্গে কে যেন কোন মন্ত্রবলে হাতির গায়ে একটি ফোয়ারা ফুটিয়ে দিল, আর মুহূর্তে সে ফোয়ারা খুলে গেল। ঝরঝর করে ফিনকি দিয়ে নয়, ফোয়ারারই মতো মোটা এবং শব্দময় উৎসারে হাতির বুক থেকে রক্ত ছুটতে লাগল। হাতিটা আমার এতই কাছে ছিল যে যদি গুলি খেয়ে সে আমার দিকে হঠাৎ পড়ত তো আমি হাতির নীচে চাপা পড়েই মরতাম।

ওখান থেকে পালাব কি না ভাবছি, এমন সময় দেখি রক্তের ফোয়ারা আরও জোর হল এবং হাতিটা হাঁটু গেড়ে আস্তে আস্তে বসে পড়ল। যেন প্রার্থনা করবে হাতিদের দেবতাদের কাছে, স্তোত্র পড়বে যাবার বেলায়।

তখন আমি দাঁড়িয়ে উঠে কিছুটা বাঁ-পাশে সরে গেলাম। মনটা ভীষণই খারাপ লাগতে লাগল। হাতিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম আবার ওঠে কি না তার উপর নজর রেখে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দুটো ছোটো গাছ এবং একটা অর্গুন গাছ ভেঙে হাতিটা ডান পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। খুব জোরে নিশ্বাস নিল একবার। তারপর আরও জোরে নিশ্বাস ফেলল।

আমি রাইফেলের সেফটি ক্যাচটাকে অফ করে দিয়ে এবারে পেছন ফিরলাম। দেখি, দুর্গাদা ইতিমধ্যে ঋজুদার কাছে পৌঁছে গেছে, এবং সেই গর্তের মধ্যে দু-হাত মাথার উপর তুলে ধেইধেই নাচ নাচছে। আমার রাইফেলটাকে রেডি পজিশনে ধরে ঋজুদার শিমুলের শিকড়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখ এদিকে। তখনও যেকোনো ইভেনচুয়ালিটির জন্য তৈরি।

হাতি যে আর কোনোদিনও উঠতে পারবে না তার ওই শয্যা ছেড়ে এই কথা বুঝতে পেরে দুর্গাদা গর্ত ছেড়ে তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আমি বললাম, 'চুপ করো। কারও মৃত্যুর সময়েই গোলমাল করতে নেই। যে যাচ্ছে তাকে শান্তিতে যেতে দাও। মৃত্যুপথযাত্রী বা মৃত প্রত্যেকে জীবিতের চেয়ে বেশি সম্মানের। সে যে চলে যাচ্ছে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে।'

দুর্গাদা বলল, 'পিলা। তু গুট্টে কাণ্ড ঘটাইলু আজি। কঁড় কহিবি মু।' বলেই গুন্ডিপানের গন্ধভরা মুখে আমার মাথায় একটা জব্বর চুমু খেল।

আমার কথা শুনল না দুর্গাদা। কী বলতে চাই বোঝে না।

ঋজুদার গর্ত থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'ব্র্যাভো রুদ্র। ওয়েল ডান। এদিকে আয়।'

ঋজুদার কাছে যেতেই অনেকক্ষণ পর পাইপটা বের করে তাতে আগুন দিয়ে সেটা ধরিয়ে মুখে পুরে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

'আছ কেমন এখন? পারবে উঠতে?' আমি বললাম।

'ঠিক আছি। ঠিক হয়ে যাব। এখন হাতির কথা বল। এমন সময়ই আছাড়টা খেলাম, আর এমনভাবে যে, আজ তোর এবং আমাদের অবস্থাও কম্ফুর মতো হলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।'

'তুমি শেষ মুহূর্তে রাইফেল বদল করলে কেন?'

'কেন করলাম তা রাইফেলের মার দেখেও বুঝলি না? ওই গুলিটাই তোর নিজের রাইফেল দিয়ে করলে হাতি হয়তো তোকে এবং আমাদের মেরে দিত নিজে মরবার আগে। আফ্রিকার বিখ্যাত হাতি-শিকারি এবং বিশেষজ্ঞ পোন্ডোরাসাহেব লিখেছিলেন যে, এই ফোর সেভেনটি ফাইভ রাইফেল দিয়ে ইভন ইফ য়্যু শুট অ্যাট দ্য রুট অব দ্য টেইল অব অ্যান এলিফ্যান্ট, ইট উইল রান থ্রু দ্য হোল লেঙ্গথ অব ইটস বডি অ্যান্ড রিচ দ্য ব্রেইনস। এতই ক্ষমতা এই রাইফেলের। আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, গুলি করতে হলে তোকে অত্যন্তই শর্ট-রেঞ্জ থেকে করতে হবে এবং সে-গুলি যদি হাতিকে সে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাতেই থামাতে না পারে তাহলে তোর তো নিশ্চিতই, আমাদের সকলের বিষম বিপদ।'

'হাতি কিন্তু তোমাদের দিকেই তাকিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেইনি। শোনেওনি। তোমার জন্যই আমি বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।'

ঋজুদার একগলা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমিও, মানে, আমি আর দুর্গাও তোরই জন্যে।'

দুর্গাদা হেসে বলল, 'আমাকে একটু ভালো বাসনার তামাকু দাও, খৈনি করে খাব।'

ঋজুদার পাইপের টোব্যাকোর পাউচটা বের করে দিল।

ঋজুদার কোমরে চোট সত্যিই খুব জোর হয়েছিল। হাড় ভেঙেছে কি ভাঙেনি, তা অবশ্য অংগুলে গিয়ে এক্স-রে না করালে বোঝা যাবে না। নিজে দু-একবার ওঠার চেষ্টা করল, তারপর দুর্গাদা বলল, 'আমি টাঙ্গি দিয়ে তোমার জন্যে একটা লাঠি কেটে আনছি, তারপর আমাদের দু-জনের কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে পারবে।'

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। যে বাঘের ডাক অনেকক্ষণ আগে শুনেছিলাম, তারই বিরক্তির চাপা আওয়াজ শুনলাম দহর একেবারে কাছে গর-র-র-র-র-র করে। আমরা যে সেখানে আছি তা সে জেনেছে, কিন্তু এও জেনেছে যে, আমরা তাকে শিকার করতে আসিনি। শিকারি যারা, তারা এত অসাবধান হয়ে জোরে জোরে কথাবার্তা বলে না। বাঘেরাও কোন মানুষ কী করতে কোথায় উপস্থিত, তা বিলক্ষণই জানে।

বাঘ জল ছেড়ে চলে গেল। একদল গল্ব এল। তাদের মেজাজ শরিফ থাকলে ভয়ের কিছুই নেই।

দুর্গাদা যে কোন চুলোয় বাঁশ কাটতে গেল টাঙ্গি হাতে, ঘাড়ে গিয়ে না পড়ে।

গল্বরাও ওঁয়াও বোঁয়াও আওয়াজ করে জল ছেড়ে চলে গেল। এখন এই খোলের মধ্যে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যেখানে যেখানে সামান্য ফাঁকফোকর আছে, সেখানে সেখানে অন্ধকার একটু হালকা মনে হচ্ছে। অন্য সব জায়গায় ঝুপড়ি ঝুপড়ি অন্ধকার। দশমীর চাঁদ এতক্ষণে বিশ্বচরাচর উদ্ভাসিত করে উঠেছে নিশ্চয়ই, আর উঠেছে পশ্চিম দিগন্তে সন্ধ্যাতারা। কিন্তু তাতে রূপ খুলেছে মেমসাহেবদের গায়ের রঙের মতো ফর্সা গেণ্ডুলি বনেরই, সে-বনে পৌঁছোতে পারলে তবেই না!

বাঁশের ঝাড় আছে দূরের দহর কাছে। বাঘ ও গল্বদের বিদায় করার পরই বাঁশ কাটতে লাগল দুর্গাদা। বাঁশের উপর টাঙ্গির কোপ পড়ছে তো মনে হচ্ছে বোমা পড়ছে। এই খোলের মধ্যের ঘন জঙ্গলের অডিটোরিয়ামের এমনই অ্যাকুস্টিকস।

একটু পরই একটি পোক্ত লাঠি নিয়ে ফিরে এল দুর্গাদা। যেদিকে ঋজুদার ধরবে, সেদিকে যাতে তার হাতে না লাগে, সেজন্য নানারকম পাতা মুড়ে লতা দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে ভালো করে। আমরা দু-জনে দু-হাতে ধরে ঋজুদাকে দাঁড় করালাম। কিছুক্ষণ মুখ বিকৃতি করে দাঁড়িয়ে রইল ঋজুদা। তারপর আমাদের দু-জনের কাঁধে হাত দিয়ে লাঠি ভর করে গর্ত থেকে উঠে দাঁড়াল। খুবই আস্তে আস্তে।

বললাম, 'দেখি, এবার হাঁটি হাঁটি পা-পা করে একটু একটু এগোও। ব্যথা কমে আসবে।'

ঋজুদার হেসে বা হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'অসহায় একেই বলে।'

হাতি এবং গুন্ডা হাতির সামনেই ওই বিপজ্জনক মুহূর্তে পড়ে যাওয়াতে ব্যথার সঙ্গে শকও মিশে ছিল নিশ্চয়ই। মানুষের উপরে তার মনের প্রভাব, শরীরের প্রভাবের চেয়ে অনেক বড়ো। ঐরাবত ধরাশায়ী হওয়াতে এখন শকটা চলে গেছে মনে হল। মনে হল কোমরের হাড়ও ভাঙেনি। ভাঙলে ঋজুদার হাঁটতে পারত না আদৌ। প্রথমে দুর্গাদা ঋজুদার রাইফেল এক কাঁধে নিয়ে অন্য কাঁধে টাঙ্গি ঝুলিয়ে অন্ধকারে সাবধানে দেখে পা ফেলতে লাগল। পেছনে ঋজুদা। তার পেছনে আমার রাইফেল কাঁধে আমি। কিছুদূর যেতেই গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে যেন এক স্বপ্নরাজ্য ধীরে ধীরে ভাস্বর হয়ে উঠতে লাগল আমাদের সকলের মুগ্ধ চোখের সামনে।

দুর্গাদা বলল, 'সাপে না কাটে! গরমের দিন। তায় অন্ধকার। একটা টর্চ থাকলে ভালো হত।'

'যা নেই তার চিন্তা করে আর কী হবে।' ঋজুদার বলল। তারপর বলল, 'দুর্গা, তোমার আর রাজেনের ভার, কাল ভোরে লবঙ্গি আর পম্পাশর থেকে লোক এনে দাঁত দুটো এবং চারটে গোড়ালির ব্যবস্থা করার। হাতির ল্যাজের চুল যেন লোপাট না হয়ে যায়।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'বালা আর লকেট বানিয়ে দিতে হবে রুদ্রর মাকে। নয়নাও চেয়েছিল।'

একসময় আমরা এসে সেই গেণ্ডুলির বনে দাঁড়ালাম। আহা! জ্যোৎস্নার কী রূপ। মাথা ঘুরে গেল। মস্ত ন্যাড়া শিমুলের মগডালে একটি লাল-বুক ইগল স্থবির হয়ে বসে ছিল। যেন মহাকাল। দূরের একটা ছোটো গেণ্ডুলির ন্যাংটো ডালে বসে কোনো পাগলা কোকিল ডেকে যাচ্ছিল অবিরত। আর ব্রেইন-ফিভার পাখিরা উড়ে উড়ে ডাকছিল, 'ব্রেইন-ফিভার' 'ব্রেইন-ফিভার', 'পিউ-কাঁহা', 'পিউ-কাঁহা'। দূর থেকে তার দোসর সাড়া দিচ্ছিল।

আমাদের মস্তিষ্কেও জ্বর। অনেক জ্বর। অনেকই কারণে।

আমরা কোনাকুনি এগোলাম শর্টকাট করার জন্য। ঋজুদার খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল পা টেনে টেনে। এবার আমরা পাতাঝরা গেণ্ডুলি বনের মাঝামাঝি চলে এসেছি। এখানে শুধুই গেণ্ডুলি। যেন হাজার হাজার মেমসাহেবদের পায়ের মধ্যে হেঁটে চলেছি আমরা। সুন্দর একরকম গন্ধ গেণ্ডুলি বনে। জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে দশদিক। বাঁ-দিকে দূরে মেঘের মতো দাঁড়িয়ে আছে লবঙ্গির পাহাড়শ্রেণি। ডান দিকে ঘন গভীর বন। যেখানে হাতিটা পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে তার শরীরের এবং মনের সব জ্বালা নিভিয়ে দিয়ে। চিরশান্তির ঘুম।

অত বড়ো একটা প্রাণী, বয়সে সে হয়তো আমার ঠাকুমার বয়সিই হবে, তাকে মেরে আমার মন বড়ো ভারী হয়েছিল।

ঋজুদার বলল, 'দুর্গা, তুমি এগিয়ে গিয়ে কম্ফুর দাহর বন্দোবস্ত করো। রাজেন জ্বালকাঠ কাটল কি না কে জানে! আমাদের পৌঁছোতে তো সময় লাগবে। রাইফেলটা নিয়েই যাও। বাঁ-দিকের ব্যারেলে গুলি আছে।

'ঠিক আছে ঋজুবাবু। ভয় আর কিছুতেই করি না। এক ভালু ছাড়া। কথা নেই, বার্তা নেই খামোখা তেড়ে এসে নাক-মুখ খুবলে নেয় পাজিরা।'

আমি ওকে সেফটি ক্যাচটা কোথায় আছে দেখিয়ে দিলাম। দুর্গাদা বাঁ-কাঁধে টাঙ্গি ঝুলিয়ে ডান কাঁধে ঋজুদার রাইফেলটা নিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল চাঁদের বনে।

একটু এগোতেই দুর্গাদার গান ভেসে এল। জ্যোৎস্নায় ভেসে এসে নির্মেঘ নীল তারাভরা আকাশে অকলুষিত, আর বাঁ-দিকের লবঙ্গি পাহাড়শ্রেণিতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে সে-গান ফিরে আসছিল। দুর্গাদা গাইছিল:

ফুলরসিয়ারে মন মোর ছুঁয়ি ছুঁয়ি যা
তো লাগি বিকশি চাহিছে এ কুঞ্জে
গুঞ্জন দেই যা যা।
যা না রে ফেরি, আসসি পাশে যা না
গা মন ভরি, করো না তু মনা
ঝুরিলে কি আউ আসিবে এ দিন্ব
হসসি, লেটি, গাই যা যা-
সাজি কেতে কুঞ্জে, কেতে ফুল্ব সেজে
মহক ছটাই মরে নিতি লাজে
লাজ ত্যজি আজি করুছি আরতি
থরে ধীরে চাহি যা যা।

চমৎকার সুরেলা গান।

'কী গান এটা?' আমি শুধোলাম।

ঋজুদার হাসল। বলল, 'টিকরপাড়ায় ঘাটের বাঁশের ভেলা-ভাসানো মাঝিরা এইসব গান গাইতে গাইতে এমন চাঁদনি রাতে চলে সারারাত সাতকোশিরা গণ্ডে। টিকরপাড়ার খাসিয়ানি মেয়েরাও গায়।'

তারপরেই বলল, 'জানিস, রুদ্র, ভারি চমৎকার এই আমাদের দেশ। এই ভারতবর্ষ, না রে? চমৎকার এই দেশের মানুষ।'

বলেই চুপ করে গেল।

আমি জানতাম, কী ভাবছে ঋজুদা।

পরক্ষণেই বলল, 'একটা গান গা রুদ্র।'

'কী গান?'

'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা।'

আমি খোলা গলায় গান ধরলাম, 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা/ তাহার মাঝে আছে দেশ এক-সকল দেশের সেরা/(সে যে) স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে-দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।'

ঋজুদার গলা গাঢ় হয়ে এল। 'গা-গা থামলি কেন, পুরোটা গা।'

এগিয়ে চললাম আমরা যেখানে কম্ফু পড়ে আছে সেদিকে। কম্ফুর বউ সীতা আর ছেলে কুশ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে সেই দুঃখেই সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। বড়ো গুণী লোক ছিল কম্ফু। আর হাতিটাও উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল প্রায় একই কারণে।

তার প্রিয়জনে ভরা দল, পরিবার এবং গোষ্ঠী থেকে ক্ষতবিক্ষত অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হয়ে।

আমরা পাগলা কোকিল আর পিউ-কাঁহার অবিশ্রান্ত ডাকের মধ্যে পরিষ্কার ধবধবে সুন্দরী গেণ্ডুলি বনের মধ্যে মধ্যে দশমীর বনজ্যোৎস্নায় আর নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভেসে ভেসে হাঁটতে লাগলাম, খিদে এবং তৃষ্ণার সব কথা ভুলে গিয়ে।

ঋজুদার খুবই আস্তে আস্তে হাঁটছিল।

মনে হচ্ছিল, আমরা যেন কতদিন ধরেই চলেছি এমনি করে। এবং চলবও। কস্ফু, হাতিটা, আমি, ঋজুদা।

আমরা সকলেই।

ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলমহলে

বিকেলে খেলে ফিরতেই ছোড়দি বলল, 'এই রুদ্র, তোকে ঋজুদার ফোন করেছিল।'

খেলার ঘেমো জামাকাপড় না ছেড়েই ঋজুদাকে ফোন করলাম। বললাম, 'হ্যালো, ঋজুদা, আমি বলছি। ফোন করেছিলে কেন?'

ঋজুদার একটু চাপা হাসি হাসল। বলল, 'স্কুল খুলছে কবে?'

'তেইশে জুন।'

'পড়াশোনা, হোমটাস্ক, সব হয়েছে?'

'সব নয়; হয়েছে কিছু কিছু।'

আমি বিরক্ত হলাম। ঋজুদার মুখে পড়াশোনার কথা শুনতে ভালো লাগে না। ঋজুদার বলল, 'না হয়ে থাকলে, সাত দিন সময় দিলাম, তার মধ্যে সব করে নে। আমি অসমে যাচ্ছি, মিকির হিলসে। অসম গভর্নমেন্ট নেমন্তন্ন করেছে-খুব একসাইটিং ব্যাপার। পরে সব বলব। তোর বাবা-মাকে আমি রাজি করাব এখন। তবে হোমটাস্ক সব শেষ না করলে নিয়ে যাওয়া হবে না।'

আমার গলার কাছে একরাশ আনন্দ আমসত্ত্বর মতন দলা পাকিয়ে গেল।

বললাম, 'ওসব ভেবো না-আমি এক্ষুনি আরম্ভ করছি, সব শেষ করে ফেলব। তবে মা বলছিলেন, পুরী যাবেন, আমাদেরও নিয়ে যাবেন। আহা! আমি কি ছোটো আছি যে, সমুদ্রের পড়ে বসে বালি নিয়ে খেলা করব? তোমার সঙ্গে গেলে কত সব অ্যাডভেঞ্চার! তা নয়, গুডি-গুডি ছেলেদের মতন, লক্ষ্মী মেয়েদের মতন মায়ের আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ানো; ভালো লাগে না। তুমি কিন্তু কেস খারাপ করে দিয়ো না। প্লিজ, দেখো ঋজুদা।'

ঋজুদার হাসল। বলল, 'ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করব।'

নাওয়া-খাওয়া ভুলে লেগে পড়লাম। পাঁচ দিনেই প্রায় পুরো সামার ভেকেশনের টাস্ক শেষ করে আনলাম-এমন সময় ঋজুদার ফোন এল একদিন সকালে।

ঋজুদার গম্ভীর গলায় বলল, 'তোর মামিমার হঠাৎ খুব অসুখ করেছে-হাসপাতালে রিমুভ করেছে সকালে। আজই অপারেশন। অপারেশনের পরে আটচল্লিশ ঘণ্টা ক্রাইসিস। সেই কারণে আপাতত অসম গভর্নমেন্টের নেমন্তন্ন রাখা যাচ্ছে না। তবে, তোকে যখন নাচিয়েছি, তখন নিয়ে যাবই। শিকারে নয়-বেড়াতে। পালামৌর বেতলা ন্যাশনাল পার্কে।' তারপর বলল, 'তোকে আবার ফোন করব পরশু, তোর মামি কেমন থাকে দেখে।'

ফোনটা নামিয়ে রেখেই মামিমার উপর এমনই রাগ হল যে, কী বলব। অসুখ বাধাবার আর সময় পেল না।

একদিন ভোর বেলা রাঁচি এক্সপ্রেসে আমরা রাঁচি এসে পৌঁছোলাম।

ভোররাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আমি জানালার পাশে বসে বাইরের অপূর্ব সব দৃশ্য দেখছিলাম। কত পাহাড়, নদী, উপত্যকা, আর জঙ্গল।

এখন গরমকাল, মে মাস, জঙ্গলের বেশিরভাগ গাছের পাতা ঝরে গেছে। লালে লাল হয়ে আছে পাহাড়-উপত্যকা, পলাশে-অশোকে-শিমুলে।

কী একটা স্টেশনের আউটার কেবিনের সামনে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিল-

যেই ট্রেনের চলার শব্দ থেমে গেল অমনি বাইরের পৃথিবীর সব শব্দে কান ভরে গেল। ফিসফিস হাওয়ার শব্দ-পাখির ডাক, দূরে কাঠ-কাটার শব্দ, মোষের গলার গম্ভীর হাম্বা রব। কী যে ভালো লাগতে লাগল, তা কী বলব!

স্টেশনে, ঋজুদার খুবই জানাশোনা, ঋজুদার বলে ছোটো ভাই, ডালটনগঞ্জের মোহনবাবু তাঁর ড্রাইভার কিষানকে পাঠিয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে। সঙ্গে রমেনবাবু।

কিষানের চেহারা ভারি সুন্দর। চমৎকার ফিকে-খয়েরিরঙা পোশাকপরা। রমেনবাবু বেঁটেখাটো, ঋজুদার ডাকছিল রমেনদা বলে। দারুণ মজার লোক।

বি.এন.আর. হোটেলে আমরা চা-টা খেয়ে গাড়িতে চড়ে বসলাম। কিষান আর ঋজুদার সামনে। আমি আর রমেনদা পিছনে।

হু-হু করে গাড়ি চলতে লাগল। লোহারডাগার পথে আমরা অনেকদূরে গিয়ে কুরু বলে একটা ছোট্টো গ্রামে ডান দিকে মোড় নিলাম। তারপর চাঁদোয়া টোড়ি।

ঋজুদার বলল, 'জানিস রুদ্র, যখন ছোটো ছিলাম, একবার মা-বাবার সঙ্গে এই ঘাটে একটা বড়ো বাঘ দেখেছিলাম। সে খুব মজার গল্প। তোকে পরে বলব।'

গাড়িতে নানারকম জঙ্গলের, পুরোনো ঘটনার গল্প হচ্ছিল। হু-হু করে হাওয়া লাগছিল চোখে-মুখে, মহুয়ার গন্ধ আসছিল নাকে, চারদিকের চমৎকার দৃশ্য, আমি অবাক হয়ে বসেছিলাম আর দেখছিলাম। দেখছিলাম না বলে গিলছিলাম বলা ভালো।

একসময় লাতেহারে একটু দাঁড়ানো হল। চা, পণ্ডিতজির দোকানের শেউই ভাজা আর প্যাঁড়া খেয়ে আমরা আবার চললাম।

বেলা বারোটা নাগাদ কের বাংলোয় গিয়ে পৌঁছোলাম। কের বাংলোয় মোহনদা ঋজুদার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বাবুর্চি ছিল, জুম্মান। ঋজুদার বলল, 'জুম্মানের রান্না খেলে তুই অজ্ঞান হয়ে যাবি।'

মোহনদা, বাবলুদা, শান্টুদা, রমেনদা, খোকনদা, সকলেই ঋজুদাকে পেয়ে খুব খুশি হল।

আমি ঋজুদাকে একটু একা পেয়ে বললাম, 'তোমাকে এঁরা খুব ভালোবাসেন না?'

এই স্বার্থহীন ভালোবাসার কোনো তুলনা নেই। এতে শুধুই আনন্দ; কাঁটাহীন।

বেতলাতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের রেস্ট হাউস আছে। তাতে ঋজুদার থাকে না। ঋজুদার বলে, 'শহরের আদেখলে লোকগুলো এসে এমন দাঁড়কাকের মতো হল্লাগুল্লা করে ওখানে, গাঁকগাঁক করে খায়, তারপর গোল হয়ে বসে শুধু তাস খেলে। চুপচাপ একটু নির্জনতা উপভোগ করবি যে, তার উপায় নেই।'

মোহনদারা সব বন্দোবস্ত-টন্দোবস্ত করে ডালটনগঞ্জ চলে গেলেন। শান্টুদা ও নিমাইদা গেলেন ছিপাহোদরে। নিমাইদাকে দেখতে একেবারে 'সোনার কেল্লা'র জটায়ুর মতো।

কের-এর বাংলো পুরোনো দিনের ফরেস্ট বাংলো। এখান থেকে বেতলা তিন মাইল। ছিপাদোহরও তাই। বিরাট বিরাট ঘর, বিরাট বিরাট বাথরুম। বড়ো টাবে জল রাখা আছে চান করার জন্যে।

আমরা চান-টান করে খেতে বসলাম।

বিউলির ডাল, আলুপোস্ত, মুরগির পাতলা ঝোল, কাঁচা আম-আদা লঙ্কা দিয়ে বাটা চাটনি, পুদিনার চাটনি এবং পুডিং।

খেয়েদেয়ে উঠে, বারান্দার ইজিচেয়ারে ঋজুদার একটা বই নিয়ে পাইপ ধরিয়ে বসল।

আমিও অন্য একটা ইজিচেয়ারে বসলাম।

বাংলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগল এই বারান্দাগুলো। সামনে ও পিছনে প্রকাণ্ড চওড়া বারান্দা। আমরা এখন সামনের বারান্দায় বসে আছি। সামনেই পাহাড়

ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এখন একটু লু-এর মতো হাওয়া বইছে। গরম রুক্ষ হাওয়া। একটু বসলেই চোখ শুকিয়ে আসে।

ধুলোর ঝড় উঠছে পাহাড়ে পাহাড়ে শুকনো শাল পাতা উড়িয়ে, গড়িয়ে, নাচিয়ে, ভাসিয়ে যাচ্ছেতাই করছে হাওয়াটা। মচ মচ সড় সড় শব্দ উঠছে হাওয়ার তোড়ে। আবার যেই হাওয়াটা শান্ত হচ্ছে অমনি বনের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠছে যেন-চাপা। যেন বনের কত কষ্ট।

কের বস্তি কাছেই। কোনো মাটির ঘরে কে যেন ধান কি অন্য কিছু কুটছে। তার একটানা গুপ গুপ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কুয়োতলায় ল্যাংটা ছেলে চান করছে ভরদুপুরে-লাটাখাম্বা উঠছে নামছে ক্যাঁচোর কোঁচোর। রোগা গোরু ল্যাজ দিয়ে গায়ে-বসা মাছি তাড়াচ্ছে। বলিরেখাময় মুখ নিয়ে এক আদ্যিকালের বুড়ি একটা সাদা-জমিন লাল-পাড়ের ময়লা দেহাতি শাড়ি পরে বসে ছুঁচের মাথায় নীল সুতো পরিয়ে কী যেন সেলাই করছে। ঘুঘু ডাকছে একটানা ঘুমপাড়ানি সুরে-ঘুররররর-ঘু, ঘুঘুর-র-র-র-র-ঘু।

সব কিছু মিলিয়ে, আর কিছু করার না থাকাতে, কখন যে ইজিচেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

ঘুম ভাঙল ঋজুদার কথাতে।

দেখলাম ঋজুদার জামাকাপড় পরে আমার কাঁধে হাত দিয়ে ডাকছেন, 'রুদ্র, রুদ্র, চল-চল, মুখ ধুয়ে খেয়ে নে, তোকে পালামৌয়ের গড় দেখিয়ে আনি।'

মুখ-হাত ধুয়ে জামাকাপড় পরতে পরতেই দেখি, ট্রেতে সাজিয়ে সুন্দর কেটলি ও কাপে চা এনে হাজির জুম্মান। সঙ্গে বিস্কিট, সন্দেশ, ফল ইত্যাদি।

ঋজুদার হাসল। বলল, 'ও জুম্মান, আমরা তো কোম্পানির বড়োসাহেব নই-আমাদের অত খাতির না করলেও চলবে। তা ছাড়া এই-ই তো খেয়ে উঠলাম।'

এককাপ করে চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে আমার বড়ো টর্চটা নিয়ে নিলাম।

মোহনদা একটা জিপ গাড়ি রেখে গিয়েছিল আমাদের জন্যে। জিপটার হুড খোলা ছিল। সামনের কাচও নামানো ছিল।

ঋজুদার বলল, 'রুদ্র, চালাবি নাকি?'

আমি খুবই খুশি হলাম। কিন্তু লাজুক লাজুক ভাব করে বললাম, 'পুলিশে ধরলে?'

ঋজুদার হাসল। বলল, 'এই জঙ্গলে তোর লাইসেন্স পরীক্ষা করবে কে? যদি বাঘের কি বাইসনের পেছনে ধাক্কা মারিস, তাহলে তারা হয়তো তোর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চাইতে পারে-'

ঋজুদার কথামতো জিপ চালিয়ে চললাম। কলকাতার লুকিয়ে লুকিয়ে ধ্রুবদার পাশে বসে স্কুল থেকে আসার পথে একটু একটু করে চালিয়ে গাড়ি চালানোটা প্রায় শিখেই ফেলেছিলাম-কিন্তু বাড়িতে কেউ জানে না-একদিন ছোড়দি দেখে ফেলেছিল বন্ধুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, ছোড়দিকে অনেক করে পটিয়ে-পাটিয়ে কথাটা বাবা-মা-র কানে তুলতে দিইনি।

এইরকম জঙ্গল-পাহাড়ে জিপ চালানো দারুণ একটা ব্যাপার। মনে হয়, কী একটা বিষম অ্যাডভেঞ্চারাস কাণ্ড করছি বুঝি।

একটু গিয়েই ডান দিকে একটা বিরাট দহ পড়ল। একটা মজা পাহাড়ি নদী। মধ্যে মধ্যে বড়ো বড়ো পাথর। ওঁরাও ছেলের মতো চ্যাটালো বুক চিতিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে।

ঋজুদার বলল, 'দেখ রুদ্র এ জায়গাটার নাম কমলদহ। ভারি সুন্দর জায়গা না? এখানে বসলে অনেক জানোয়ার দেখা যায়। যখন জল থাকে, তখন হাতির দল এসে শুঁড় দিয়ে জল তুলে চান করে, বাচ্চাদের চান করায়। ভারি সুন্দর দেখতে লাগে।'

আমি বললাম, 'আমরা হাতি দেখতে পাব?'

ঋজুদার চার ধার দেখে বলল, 'দেখতে তো পাওয়ার কথা। তবে এখানে একটা একলা হাতি-দাঁতাল-কিছুদিন হল বড়ো ঝামেলা করছে। সেটাকে না দেখাই ভালো।'

আমি উৎসুক গলায় শুধোলাম, 'সেই টুম্বকার হাতির মতো পথ জুড়ে দাঁড়াবে না কি?'

'তোর মনে আছে দেখছি?' ঋজুদার বলল।

আমি বললাম, 'কী বল তুমি? মনে আবার থাকবে না!'

দেখতে দেখতে আকাশজুড়ে পাহাড়ের মাথায় বনজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে গড়ের সীমানা দেখা গেল।

অবাক হয়ে আমি গিয়ার চেঞ্জ করতে ভুলে গেলাম। অ্যাকসিলেটর টিপতেও ভুলে গেলাম।

জিপটা কট কট কট কট আওয়াজ করে একটা ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল।

ঋজুদার সুইচ বন্ধ করে দিয়ে হাত তুলে আমাকে দেখাতে লাগল গড়ের সীমানা। যুদ্ধ করার জন্যে গড়ের দেওয়ালে যেসব ফুটো ছিল, তারপর দেওয়ালের উপর দিয়ে সৈন্যদের হেঁটে যাওয়ার জন্যে যে-সমস্ত রাস্তা ছিল, সবই দেখা যাচ্ছে।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে জিপটা রেখে আমরা গড়ে উঠলাম। অনেকখানি পথ উঠতে হয়।

একদল ময়ূর-ময়ূরী আমাদের দেখে ভর ভর করে ভারী ডানার আওয়াজ তুলে জঙ্গলের গভীরে চলে গেল। একটা ময়ূর বড়ো গাছের ডালে বসে বুকের মধ্যে চমকে দিয়ে ডাকল, কেয়াঁ-ক্কেঁয়া-ক্কেঁয়া।

ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া, টুঁই হরিয়াল উড়ে যাচ্ছিল কোনাকুনি। নীচ থেকে বনমুরগি, তিতির, ছাতারে, বটের, ঘুঘু আরও কত কী পাখি ডাকছিল।

গড়ের উপরে উঠেই থমকে গেলাম।

এখান থেকে অদূরে অন্য একটি ছোটো গড় দেখা যাচ্ছিল।

ঋজুদার বলল, 'দেখ রুদ্র, ওটা পুরোনো গড়।' তারপরই বলল, 'পালামৌ সম্বন্ধে তুই জানিস কিছু?'

আমি বললাম, 'মানে তুমি কী বলতে চাইছ?'

ঋজুদার বলল, 'তুই কোনো বই-টই পড়েছিস?'

আমি বাহাদুরি করে বললাম, 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'।'

'বাঃ তবে তো পড়েইছিস। তবে সে পালামৌ আর আজকের পালামৌ-এ অনেক তফাত।'

তারপরই ঋজুদার আমাকে জব্দ করার জন্যে বলল, 'পালামৌ নামটা কী করে হল বলতে পারিস?'

আমি টক করে বলেদিলাম, 'পল-আম্ম-উ-এই তিনটি দ্রাবিড় শব্দ নিয়ে পালামৌ। পালামৌ মানে দাঁত-বের-করা-নদী।'

ঋজুদার দুষ্টু দুষ্টু চোখ করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

বলল, 'করেছিস কী? এত তুই জানলি কী করে? আমি তো সেদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটা বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে নামটা কী করে হল জানলাম।'

আমি হাসছিলাম। জীবনে এই প্রথমবার ঋজুদাকে অন্তত একটা ব্যাপারে সমানে সমানে টেক্কা দিতে পারায় আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

আমি কনফেস করলাম। বললাম, 'আমি পড়িনি, ছোড়দি একটা বইয়ে পড়েছিল। আমি তোমার সঙ্গে এখানে আসছি শুনে ছোড়দিই আমাকে বলেছিল।'

ঋজুদার বলল, 'এই যে গড় দেখছিস, এই গড়ের পেছনেই উরঙ্গা নদী। বর্ষাকালে উরঙ্গাতে যখন বান ডাকে তখন উরঙ্গার বুকের কালো কালো পাথরগুলো দাঁতের মতো উঁচু হয়ে থাকে। চেরোদের দুর্গ ছিল এটা। দুর্গের উপর থেকে উরঙ্গাকে দেখে চেরোরা বলত, দাঁত-বের-করা-নদী। ওরা দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিল-দ্রাবিড় ছিল ওদের ভাষা। পল-আম্ম-উ-এই তিনটি শব্দ মিলে হল পলাম্ম্যু। সাহেবরা তাকে চিবিয়ে করে দিল প্যালাম্যু। আমরা বলি, পালামৌ।'

আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছি, এমন সময় টাঁউ টাঁউ টাঁউ করে ডাকতে ডাকতে একদল চিতল হরিণ পুরোনো দুর্গটার দিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এদিকে চলে এল রাস্তা পেরিয়ে।

আমরা চুপ করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম।

ততক্ষণে বেলা পড়ে এসেছিল। গরম আর নেই তখন। বেশ একটা ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজ। সন্ধ্যাতারাটা শান্ত নীল নরম হয়ে ধীরে ধীরে দিগন্তরেখার উপরে উঠল। কয়েকদিন পরই পূর্ণিমা। একটু পরেই চাঁদ উঠবে।

ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন মনে হচ্ছিল। ঝিরঝিরে মন্থর বাতাসে মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধ। শাল ফুলের গন্ধও যেন মিশে গিয়েছিল ওইসব গন্ধের সঙ্গে। আধো-অন্ধকার জঙ্গলের আঁচলের গভীর ছায়ায় মধ্যে মধ্যে হাটিট্টি-টি-টি-করে হট্টিটি পাখি ডেকে ফিরছিল।

কত কী ভাবনা মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছে-লাট্টুর গায়ে লেত্তির মতো। এমন সময় ঋজুদার আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চল রে রুদ্র, এবার নামি। জিপটা তো একেবারে উদোম জায়গায় একেবারে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। নীচে নেমে হয়তো দেখবি একজোড়া ভাল্লুক বসে আছে সামনের সিটে।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'বলা যায় না। জিপটা আবার রেখেও এলাম তো একটা ঝাঁকড়া মহুয়া গাছের নীচে।'

নীচে যখন নামলাম আমরা, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

জিপটার কাছে পৌঁছেছি, এমন সময় জিপের একেবারে পাশ থেকে একটা হুতোম প্যাঁচা দূরগুমd দূরগুম দূরগুম করে ডেকে উঠল।

আমি টর্চ জ্বালতেই প্যাঁচাটা আলোর চারপাশে আমাদের মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল।

এমন সময় কমলদহের দিক থেকে একটা কীরকম গম্ভীর বুক-কাঁপানো আওয়াজ ভেসে এল। আওয়াজটা গড়ের দেওয়ালে, পাহাড়ে, বনে-জঙ্গলে গুমগুমানি তুলে প্রতিধ্বনিত হল।

আমি কানখাড়া করে শুধোলাম, 'কীসের ডাক ঋজুদা?'

ঋজুদার বলল, 'চুপ কর। আবার শুনতে পাবি।'

ঠিক। একটু পরেই ডাকটা আবার শোনা গেল। পর পর কয়েকবার।

ঋজুদার হাসল। বলল, 'এবার তুই সরে বোস, আমিই চালাই। দেখি বাঘ-বাবাজির সঙ্গে তোর মোলাকাত করানো যায় কি না।'

এতক্ষণ বেশ ভালোই ছিলাম-কিন্তু ঋজুদার যে আমারই সঙ্গে বাঘ-বাবাজির মোলাকাত করানোর এত শখ কেন, তা বুঝলাম না। সত্যি কথা বলতে কী, আমার

কেমন অস্বস্তি লাগল, যদিও ঋজুদার সঙ্গে টুম্বকাতে-বাই ফ্লুক-ইতিপূর্বে একটা চিতাবাঘ মেরেও ফেলেছিলাম। সে ব্যাটা বাঘ আত্মহত্যা করবেই-আমি ছাড়া তাকে মারবে এমন শিকারি সে পাবে কোথায়? দুঃখ এই যে, বেচারির মরেও স্বর্গলাভ হবে না। আমার মতো রংরুট শিকারি যাকে মারল, তার স্বর্গে যাওয়ার সব রুটই বন্ধ।'

কমলদহের দিকে এগিয়ে চলছি আমরা। জিপটা থার্ড গিয়ারে চলছে। কাঁচা কাঁকরময় পাথুরে লাল ধুলোর রাস্তায় চাকাতে একটা কির কির শব্দ তুলে সে এগিয়ে চলেছে। হাওয়াতে ঝলক ঝলক গন্ধ আসছে নানা ফুলের।

কমলদহের পাশে জিপটা থামিয়ে, আমার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে, ঋজুদার এদিকে-ওদিকে ফেলতে লাগল। তারপর একটা কোটরা হরিণ বাঁ-দিকের পাহাড় থেকে ডেকে উঠতেই ঋজুদার আমার কাঁধে হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে নামতে বলেই, টর্চটা হাতে করে, কিন্তু না জ্বালিয়ে একটা সরু পথ ধরে কমলদহের দিকে কুঁজো হয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। আমিও পেছন পেছন চলতে লাগলাম।

হঠাৎ ঋজুদার পায়ের সামনে দিয়ে কী একটা প্রাণী সড় সড় করে শুকনো পাতার ভিতরে ভিতরে বাঁ-পাশ থেকে ডান পাশে চলে গেল। যেতে অনেক সময় লাগল।

ঋজুদার বাঁ-হাত পিছনে এগিয়ে আমাকে দাঁড়াতে বলে, নিজেও একটু থমকে দাঁড়াল। না-দেখা প্রাণীটা চলে যেতেই ঋজুদার আবার এগোল।

কমলদহের পারে এসে দাঁড়াতেই, ঋজুদার দশ-পনেরো ডিগ্রি বাঁ-দিকে টর্চ ফেলল। কমলদহের দুধ-সাদা বালির পটভূমিতে কালো কালো বড়ো বড়ো পাথরগুলো আলোটাকে শুষে নিল যেন। দেখলাম সেই পাথরের উপরে বারোয়াডির দিকে মুখ করে একটা প্রকাণ্ড বড়ো পাট কিলেরঙা রয়াল বেঙ্গল টাইগার এক-গাল এক-গলা গোঁফ-দাড়ি নিয়ে বসে আছে।

আলো পড়তে বিরক্ত মুখে বাঘটা একবার আমাদের দিকে তাকাল। তারপর হুলো বিড়ালের মতো গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড়-গড়গড় শব্দ করল। তবে শব্দটা অ্যামপ্লিফায়ারের সামনে বেড়াল গড়গড় করলে যেমন আওয়াজ হয়, তেমন।

ঋজুদার আলোটা বাঘের গা থেকে সরিয়ে নিল। ফিসফিস করে বলল, 'খালি হাতে বাঘের সঙ্গে ইয়ার্কি করা ভালো নয়।'

আরেকবার আলোটা জ্বালিয়ে ঋজুদার বলল, 'দেখ ভালো করে দেখে নে রুদ্র।'

একটু পরে আলোটা নিবিয়ে আমরা ফিরে আসতে লাগলাম জিপের কাছে। মাঝামাঝি এসেছি, এমন সময় কমলদহের ডান দিক থেকে কীরকম জোর দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ শুনলাম। অনেকগুলো দীর্ঘশ্বাসের।

ঋজুদার বলল, 'বুঝেছি।'

বলেই, তাড়াতাড়ি জিপের দিকে এগিয়ে গেল। জিপে বসেই জিপ স্টার্ট করে একটু এগিয়ে গিয়ে জিপ থামিয়ে বাঁ-দিকে আলো ফেলল। আলোতে দেখি একদল বড়ো বড়ো বাইসন মাথা উঁচিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পায়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বালিতে একটা বাইসনের বাচ্চা পড়ে আছে। তার পেটের কাছ থেকে, পায়ের কাছ থেকে বাঘ মাংস খেয়ে নিয়েছে। বাচ্চাটার কপালের কাছে, হাঁটুর কাছে, সাদা জায়গাগুলো রক্তে লাল হয়ে গেছে। আরও একটা জ্যান্ত বাচ্চা ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে বড়োদের পায়ের মধ্যে। ঋজুদার বলল, 'বাঘ ওই পাথর ছেড়ে নেমে এলে ওর কপালে দুঃখ আছে। কাছে পেলে বাইসনেরা ওকে ছেড়ে দেবে না।'

তারপরই বলল, 'ব্যাপারটা বুঝলি?'

ব্যাপারটা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তাই ঋজুদার আবার বলল, 'আজই সন্ধ্যের মুখে হয়তো বাঘটা বাচ্চাটিকে একলা পেয়ে মেরে দিয়েছিল। বাইসনের দল কাছেই ছিল; তারা সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে এসে বাঘকে ধাওয়া করে। বাঘ বুদ্ধিমান লোক। এতগুলো বাইসন দেখে ও আপাতত পাথরের উপর গিয়ে বসে গোঁফে তা দিতে দিতে মগজ হাতড়ে, কী করা যায় সেই বুদ্ধি বের করছে।'

আমি শুধোলাম, 'অতগুলো বাইসনের মধ্যে থেকে ও অর্ধভুক্ত বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে পারবে?'

'বাঘের পক্ষে সবই সম্ভব। তবে ঝামেলা হবে বিস্তর। বাঘের পেটও ফেঁসে যেতে পারে। পেট থাকলে জীবনে অনেক খাবে, পেট ফেঁসে গেলে তো আর খেতে হবে না।'

আমি বললাম, 'এরকম অবস্থায় ওরা কতক্ষণ থাকবে?'

ঋজুদার হাসল। বলল, 'ওরাই জানে। ওদের তো আর তোর বাবার মতো অফিসের তাড়া, কি তোর মতো স্কুলের তাড়া নেই-ওদের হাতে অফুরন্ত সময়-এই-ই ওদের রোজগার, খাওয়াদাওয়া সব। ওদের বেঁচে থাকলেই লড়তে হবে, লড়তে গেলেই মরতে হবে; খিদে পেলেই কষ্ট করতে হবে; ওদের বেঁচে থাকাটাই একটা প্রধান কাজ-এবং বেশ কঠিন কাজ-সে হরিণই হোক আর বাঘই হোক।'

একটু এগিয়ে গিয়ে পাইপ ধরাবার জন্য, ঋজুদার জিপটা একটু থামাল।

এই ফাঁকে আমি শুধোলাম, 'তোমার পায়ের সামনে দিয়ে সড়সড় করে চলে গেল, ওটা কী জিনিস ঋজুদা?'

ঋজুদার অবাক গলায় বলল, 'সে কী রে? এখনও বুঝিসনি? সাপ।'

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'বুঝেছিলাম যে সাপ, কিন্তু অতবড়ো?'

ঋজুদার এবার স্বগতোক্তির মতো বলল, 'হ্যাঁরে, অতবড়ো গহুমন সাপ আমিও বেশি দেখিনি।'

আমি চোখ বড়ো বড়ো করে বললাম, 'তোমাকে কামড়াল না?'

ঋজুদার পাইপ-মুখেই হেসে উঠল। বলল, 'খামোখা কামড়াতে যাবে কেন? আমি কি চ্যুয়িংগাম না চকোলেট?'

আমি বললাম, 'ধেৎ।'

এরপর জিপটা ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা ফের বাংলোর দিকে চললাম।

পথে যে কত জানোয়ার দেখলাম তা কী বলব। ঝাঁকে ঝাঁকে চিতল হরিণ। দুটো কোটরা। একদল শম্বর। একটা বড়ো দাঁতাল একরা শুয়োর। খরগোশ। একটা শজারু। শজারুকে ওরা এখানে বলে সাহিল।

বেতলার চেকনাকার কাছে প্রায় চলে এসেছি, এমন সময় সামনে রাস্তার পাশে মড়মড় শব্দ হল।

ঋজুদার জিপটা দাঁড় করাল।

রাস্তার পাশেই, জঙ্গলের মধ্যে সেই দাঁতাল হাতিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাল ভেঙে খাচ্ছে। রাস্তার উপরেও ভাঙা ডাল এসে পড়েছে।

ঋজুদার বলল, 'ঝামেলা করল। খালি হাতে এসব ঝামেলা আমার বরদাস্ত হয় না।'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে কোনো অস্ত্রই আনতে দেয় না?'

ঋজুদার বলল, 'না। পিস্তলও না।'

যদি হাতি কাউকে মেরে দেয়?

'মেরে দেবে। যারা শখ করে জানোয়ার দেখতে আসবে তাদের এই ঝুঁকি নিয়েই আসতে হবে। যাদের ভয় লাগে তাদের না আসাই ভালো।'

আমাদের ফিসফিসানি শুনতে পেয়ে হাতিটা জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই শুঁড় উঁচু করে বিকট এক প্যাঁ-অ্যা-অ্যা আওয়াজ করল। চারদিকের বন-পাহাড়ে সে-আওয়াজ ছড়িয়ে গেল।

পরক্ষণেই কী হল বোঝবার আগেই, দেখি, হাতিটা শুঁড় তুলে সোজা জিপের দিকে চার্জ করে আসছে।

তখন আর ব্যাক করে পালিয়ে যাওয়ারও সময় নেই।

আমি শুধু শুনলাম, 'রুদ্র, শক্ত করে ধরে বোস জিপ; পড়ে যাস না।' তারপরই শুনলাম, 'তবে রে...।'

'তবে রে' বলেই ঋজুদার জিপের হেডলাইট দুটো ডিমার থেকে ব্রাইটার করে সেকেন্ড গিয়ারে দিয়ে অ্যাকসিলারেটর প্রচণ্ড জোরে চেপে ইঞ্জিনের একটা কান-ফাটানো গোঁ গোঁ আওয়াজ করে তার সঙ্গে পুরো হর্ন টিপে হাতির দিকে সোজা জিপ চালিয়ে দিল। মনে হল, হাতিটা যে শক্তের ভক্ত, নরমের যম, একথা ঋজুদার বুঝে ফেলেছে।

আমার মনে হল, জিপটাও একটা হাতি হয়ে গেছে। তফাতের মধ্যে খালি শুঁড় আর ল্যাজটা নেই।

হাতিও দৌড়ে আসছে, জিপটাও দৌড়ে যাচ্ছে। হাতির প্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা আর জিপের প্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা মিলিয়ে সমস্ত বেতলার জঙ্গল বেতালা আওয়াজে ভরে গেছে।

আড়চোখে দেখলাম, ঋজুদার শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। পাইপটাতে এমন কামড় দিয়েছে যে, মনে হচ্ছে এখুনি ভেঙে যাবে বুঝি পাইপটা। আর সোজা তাকিয়ে আছে হাতিটার দিকে। ঋজুদার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, খুব বিরক্ত হয়েছে ঋজুদা।

একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন আর আমাদের বেঁচে থাকার কোনোই সম্ভাবনা নেই-হাতির গায়ে জিপসুদ্ধু বডি-থ্রো দেবার ঠিক আগে এক অদ্ভুত কাণ্ড করল ঋজুদা।

হঠাৎ-একেবারেই হঠাৎ গিয়ার চেঞ্জ করে, থার্ড গিয়ারে দিয়েই ডান দিকে বাঁই-বাঁই করে পুরো স্টিয়ারিং কাটিয়ে রাস্তা ছেড়ে পাশের শুকনো জঙ্গলে নেমে গেল। একরাশ ধুলো উড়ে গেল। ধুলো আগে থেকেই উড়ছিল। ধুলোয় মাথা-মুখ ঢেকে গেল, অতবড়ো হাতিটা ধুলোর মেঘে ঢেকে গেল।

আমি আমার সামনের হ্যান্ডেল দু-হাতে ধরে পিছনে তাকিয়ে যা দেখলাম, তা বলার নয়। দেখি অতবড়ো হাতিটা অতজোরে দৌড়ে আসার পর তার আক্রমণের বস্তুটি হঠাৎ হাওয়া হয়ে যাওয়ায় সামনের ও পিছনের পায়ে প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষল। ব্রেক কষতেই সমস্ত শরীরটা সামনে ঝুঁকেই নড়ে উঠল। পরক্ষণেই হাতিটা অ্যাবাউট টার্ন করে জিপের পিছনে আবার তেড়ে এল। এবার মনে হল দাঁতাল সত্যিই খেপে গেছে।

ঋজুদার এদিকে গাছ কাটিয়ে কাটিয়ে বড়ো রাস্তায় ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বাঁ-দিকে স্টিয়ারিং কাটিয়ে প্রায় বড়ো রাস্তায় উঠে এসেছেও, এমন সময় দেখি একটা পাহাড়ি নালা। নালাটায় জল নেই, কিন্তু বড়ো বড়ো পাথর, কাঁটাঝোঁপ বালি এবং ওদিকে পাড় বেশ খাড়া।

এদিকে হাতি এসে গেছে কাছে। এসে যাচ্ছে। এসে গেল।

সার্কাসে মরণকূপে মোটরসাইকেল চালানো দেখেছিলাম, ছোটোবেলায়! মনে হল, আজ ঋজুদাই মোটর সাইক্লিস্ট। আজ আর বাঁচা নেই কপালে। এত জঙ্গলের, এত জানোয়ার ঘেঁটে এসে শেষে কিনা এই খেলাচ্ছলে দেখতে আসা অভয়ারণ্যের মধ্যেই ঋজুদার প্রাণ যাবে! সঙ্গে আমারটাও!

মায়ের মুখটা একেবারে ভেসে উঠল চোখের সামনে! ছোড়দির মুখটা। ঋজুদার চোখের সামনে কার মুখ ভেসে উঠেছিল জানি না। হয়তো হাতির শুঁড়টাই। কিন্তু দেখলাম মুহূর্তের মধ্যে ঋজুদার স্পেশাল গিয়ার চড়াল জিপে, চড়িয়েই এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। নালা পেরোবার চেষ্টা না করে-নালা ধরে জঙ্গলের গভীরে চলতে লাগল।

আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম।

হাতিটা নালার পাশে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে আবার ব্রেক কষল। ব্রেক কষেই, নালায় নেমে আমাদের পিছনে ধেয়ে এল।

ঋজুদার দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল, 'এমন বদমাশ হাতিকে মেরে দেওয়া উচিত।'

আমার তখন কানে কিছু শোনার বা দেখার অবস্থা ছিল না।

ঋজুদার কাঁটাঝোপের উপর দিয়ে, ঘাস-পাথর-বালির উপর দিয়ে জিপ চালিয়ে যাচ্ছে। সাইলেন্সার পাইপে সড়সড় আওয়াজ হচ্ছে। একবার বোধ হয় পাথর লাগল নীচে কোথাও।

বিচ্ছিরি চিৎকার করছে হাতিটা-নানারকম ঘোঁত ঘোঁত ফোঁৎ ফোঁৎ আওয়াজ।

ঋজুদার চোখ বাঁ-দিকে ছিল। হাতিটা আর জিপের মধ্যে বড়োজোর কুড়ি গজ ফাঁক এখন হঠাৎ পুরো বাঁ-দিকে স্টিয়ারিং কাটিয়ে ঋজুদার নালা পেরিয়ে জঙ্গলে উঠে এল অনেকগুলো শালের চারা পটাপট করে ভেঙে। উঠে না এসে গড়িয়েও নীচে পড়তে পারত জিপ, হাতির ঘাড়ে। প্রায় নব্বুই ডিগ্রি কোনে জিপ আকাশের দিকে মুখ করে কোনোক্রমে পরের ল্যাজ-ধরে ওঠার মতো করে উঠল।

জঙ্গলে উঠেই এবার বাঁ-দিকে গাছ কাটিয়ে, পাথর বাঁচিয়ে ঋজুদার যে-পথ ছেড়ে আমরা নেমেছিলাম, সেই পথের দিকে আন্দাজে আন্দাজে অন্ধের মতো এগোতে থাকল।

ইঞ্জিন গরম হয়ে ধোঁয়া বেরোতে লাগল। একে গরমের দিন, তারপর ইঞ্জিন ও গাড়ির উপর এই অত্যাচার। রেডিয়েটরে জল ফুটছিল বগ বগ করে।

আমি ভেবেছিলাম যে, হাতিটা নালা পেরিয়ে আর এপাশে আসবে না।

ঋজুদার তাড়াতাড়ি বলল, 'তুই পিছনে দেখ রুদ্র। দেখ তো এখনও আসছে কি না?'

আমি তাকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

ঋজুদার বিশ্বাস করল না। বলল, 'বলিস কী রে? এখনও?'

আমি ভয় ভয় গলায় বললাম, 'কী হবে?'

ঋজুদাও তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে। দেখলাম, তিনি তবুও আসছেন হন্তদন্ত হয়ে- একটা এসপার-ওসপার করবার জন্যে।

ঋজুদার সামনে রাস্তাটা দেখতে পেয়েছিল। রাস্তার পাশেই জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি সমান ফাঁকা জমি। খোয়াই-টোয়াই নেই। দুটো-একটা শালের চারা আছে শুধু।

ঋজুদার বলল, 'আমরা এমন করে যদি পালিয়ে যাই, তবে ভবিষ্যতে ও জিপ দেখলেই এমনি করে ঝামেলা পাকাবে। যাওয়ার আগে ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে।'

ঋজুদার উপর আমার খুব রাগ হল।

আমার গলায় ততক্ষণে ভয়ে থুথু আটকে গেছিল। এ যাত্রা প্রাণ বেঁচেছি ফের বাংলোয় গিয়ে কোথায় পোলাউ, মাংস, রইতা এসব খাব, মোহনদারা সকলে আসবেন বলেছেন ডালটনগঞ্জ থেকে, শান্টুদার চাপাদোহর থেকে, এখন হাতিকে শিক্ষা দেওয়ার কী দরকার? তুমি কি হাতির দিদিমণি?

কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলাম না। বলার সময়ও ছিল না। তিনি আসছেন। এবার আর দৌড়ে দৌড়ে নয়, গজদন্ত সামনে নিয়ে গজগমনে গজপতি আসছেন।

ঋজুদার ওই সমান জায়গাটাতে হাতির দিকে পিছন ফিরিয়ে জিপ দাঁড় করিয়ে দিল।

আমাকে বলল, 'যখন একেবারে কাছে এসে যাবে, প্রায় ঘাড়ে পড়ার মতন, তখন বলবি।'

দেখলাম স্পেশাল গিয়ার ছাড়িয়ে নিয়েছে ঋজুদা, ফার্স্ট গিয়ারে রেখেছে জিপটাকে আর স্টিয়ারিংটা পুরো ডান দিকে কাটিয়ে তৈরি হয়ে বসেছে।

হাতিটা আমাদের দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে এবার গজগমন ছেড়ে দুলকি চালে পা তুলে তুলে জোরে এগিয়ে আসতে লাগল। এসে গেছে; এসে গেছে; শুঁড় তুলেছে সামনে। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'ঋজুদা...!'

ঋজুদার সঙ্গেসঙ্গে জিপ চালিয়ে দিল। হতভম্ব হাতিটার সামনে, আলো জ্বালানো, হর্ন বাজানো ঘুরন্ত জিপটা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে লাগল। পুরো স্টিয়ারিং কাটানো অবস্থায় জিপটাকে চক্রাকারে অল্প জায়গায় মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বৃত্তটাকে বড়ো করতে করতে গিয়ার বদলে যেতে লাগল ঋজুদা। একে একে ফার্স্ট থেকে টপ গিয়ারে এল। এখন জিপটা ঘুরছে একটা উল্কাপিণ্ডের মতো। জিপে বসে আমাদেরই মাথা ঘুরে যাচ্ছে; তা দেখে হাতির মাথা তো ঘুরবেই।

হাতিটা একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

এই যন্ত্রকে চিরদিন সামনে, এবং কখনো কখনো পিছনে যেতে দেখেছে ও। কিন্তু এই ইঞ্জিনের এবং হর্নের বিকট আওয়াজে, হেডলাইটের ঘুরন্ত আলোয় এবং পুরো যন্ত্রটার ক্রমান্বয়ে গুবরে পোকার মতো পাক খাওয়া ব্যাপারটা তার সমস্ত বুদ্ধি দিয়েও হাতিটা বুঝতে পারল না। তা ছাড়া জিনিসটা এত তাড়াতাড়ি ঘুরছে ও এত আওয়াজ করছে যে, কোনখানটায় কেমন করে যে সে শুঁড় দিয়ে বাগে আনবে তাই তার মগজেই আসছিল না।

এদিকে বৃত্তটা বড়ো করতে করতে ঋজুদার হাতিটাকে পিছু হটিয়ে দিচ্ছে-এক-পা, এক-পা করে এই ঘূর্ণমান জানোয়ারের কবলে পড়ে হাতি ব্যাকওয়ার্ড মার্চ করছে। এইভাবে যে কখন সে নালার খাড়াপাড়ে এসে পৌঁছেছে-তা হাতিও বোঝেনি, ঋজুদাও না।

হঠাৎ এক কাণ্ড হল। পিছন দিকে হাঁটতে হাঁটতে হাতি চিতপটাং হয়ে নালার মধ্যে পড়ে গেল। হাতির চিতপটাং পড়ে যাওয়া যে না দেখেছে, সে কখনো জানতে পারবে না যে, তা দেখে না হেসে উপায় নেই।

ওই বিপদের মধ্যেও আমি হি-হি করে হেসে উঠলাম।

হাতিটা নালায় পড়ে যেতেই-ঋজুদা জিপের মুখ রাস্তার দিকে সোজা করে রাখল।

অঃধপতিত অবস্থা থেকে নিজচেষ্টায় উত্থিত হয়েই হাতিটা আর ঝামেলা না করে প্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা করে ডাকতে ডাকতে জঙ্গলে দৌড়ে গেল উলটোদিকে। অতবড়ো জানোয়ারের পেছনে একটা কেলে টিকটিকির মতো ল্যাজটা নড়তে নড়তে গেল।

এবার ঋজুদার হাঁফ ছেড়ে বেতলার দিকে এগিয়ে চলল।

বড়ো রাস্তায় পড়েই সামনে বেতলার চেকপোস্ট দেখা গেল।

হেডলাইটের আলোতে দেখলাম সেখানে রীতিমতো গাড়ির প্রসেশান দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই নাকি ওখান থেকে আমাদের এবং হাতির এই বিনাটিকিটের সার্কাস দেখে খুবই মজা পেয়েছেন। ভিড়ের মধ্যে মোহনদা, শান্টুদা, রমেনদা এবং নিমাইদাকে দেখে খুবই ভালো লাগল।

একজন ফরেস্ট গার্ড এসে বলল ঋজুদাকে, 'আপনি হর্ন বাজাচ্ছিলেন কেন জঙ্গলে? জানেন না এটা বেআইনি?'

ঋজুদার হেসে বলল, 'এখানে হর্ন না বাজালে যে স্বর্গে গিয়ে বাজাতে হত বাবা!'

গার্ড বলল, 'নহি, নহি। আপ ঠিক কাম নেহি কিয়া। হাম বড়া সাব কা রিপোর্ট করে গা।'

ঋজুদার পার্স থেকে একটা কার্ড বের করে বলল, 'তুম মেরা পেয়ার রাখখো, ওর ই কার্ড রাখখো বড়া সাব কা লিয়ে।'

ইতিমধ্যে মোহনদা এসে পড়লেন। ডালটনগঞ্জের মোহন বিশ্বাসকে এখানে সকলেই চেনেন।

মোহনদাকে গার্ড বলল, 'আপনি এঁকে চেনেন হুজৌর?'

মোহনদা বললেন, 'আমারই জিপ চালাচ্ছেন আর আমি না চিনব কী করে?'

তারপর মোহনদা ঋজুদাকে দেখিয়ে গার্ডকে বললেন, 'ওঁকে সকলেই চেনেন। তুমি ওকে জঙ্গলের নিয়মকানুন শেখাতে যেয়ো না-বড়োসাহেবের কানে গেলে তুমিই বকুনি খাবে।'

ঋজুদার বলল, 'ছাড়ো ছাড়ো মোহন। ক্যান্টিনে চলো, সবাই মিলে একটু চা খাওয়া যাক।'

ঋজুদার সঙ্গে সিমলিপালে

ভরদুপুর। টাইগার প্রোজেক্টের ডিরেক্টর সাঙ্খালাসাহেব, যশীপুরের খৈরী-খ্যাত চৌধুরী সাহেব ও আর-একজন দক্ষিণ ভারতীয় ইকোলজিস্ট, ওড়িশার ন্যাশনাল পার্ক, সিমলি-পালের পাহাড়ের মধ্যে বড়াকামড়ার ছোটো বাংলোর বারান্দায় বসে লাঞ্চ খাচ্ছিলেন।

ঋজুদার তাঁদের টা টা করে বেরিয়ে পড়লেন। জেনাবিলের দিকে। জিপের মুখটা ঘুরল, কিন্তু ট্রেলারটা ঘুরল না। ট্রেলারগুলো বড়োই বেয়াদব হয়। জিপ ডাইনে ঘুরলে বাঁয়ে ঘোরে, বাঁয়ে ঘুরলে ডাইনে। আমি আর বাচ্চু হ্যাট হ্যাট করে হালের বলদ তাড়াবার মতো করে নেমে পড়ে হাত দিয়ে পা দিয়ে ট্রেলারকে বাধ্য করলাম জিপের কথা শুনতে।

তারপর বড়াকামড়ার বাংলোর গড়ের উপরের সাঁকো পেরিয়ে এসে জিপ মুখ ঘোরাল ডান দিকে।

এই সিমলিপালের জঙ্গলে ঋজুদার একা আসেননি। সঙ্গে ঋজুদার জঙ্গলতুতো দাদা কানুদা এবং তার জঙ্গলপাগল স্ত্রী ও শালি, খুকুদি ও মণিদি। সঙ্গে দিদি ও জামাইবাবু-অন্তপ্রাণ বাচ্চু।

এত লোক সঙ্গে থাকায় আমি ঋজুদাকে মোটেই একা পাচ্ছি না। আমাকে এইসব নতুন লোকেরা মোটেই পাত্তাও দিচ্ছেন না। মনমরা হয়ে ট্রেলারে মালপত্রের উপরে বসে আছি। 'খিদমদগার' বাচ্চু এবং 'ইউসলেস' আমার জায়গা ডাঁই-করা মালপত্রভরা ট্রেলারের উপর।

পাহাড়ি রাস্তা। জিপ যখন উতরাইয়ে নামে তখন আমরা এ-ওর ঘাড়ের উপর পড়ে একেবারে ট্রেলারের সামনে এসে পড়ে জিপের চাকার তলায় পড়ে যাই আর কি! আবার জিপ যেই চড়াইয়ে ওঠে, তখন আবার সড়াৎ করে ট্রেলারের পেছনে চলে গিয়ে গড়িয়ে চিতপটাং হয়ে পড়ো পড়ো, পাথরে। অনেক পাপ করলে মানুষকে জিপের ট্রেলারে চড়তে হয়।

বড়াকামড়ার বাংলোর সামনেই শবরদের একটা বস্তি। সার সার খড়ের ঘর, নদীর ওপারে ঝুঁকে-পড়া পাহাড়ের গায়ে। বাঁক নেওয়া বর্ষার ভরন্ত পাহাড়ি নদীর পাশে, নরম সবুজ প্রান্তরের উপর। দূর থেকে যেন পাণ্ডবদের বনবাসের পর্ণকুটির বলেই মনে হয়। এখন চৈত্রের শেষ। লক্ষ লক্ষ শাল গাছে মঞ্জরি এসেছে। মেঘলা আকাশ। মেঘলা আকাশের পটভূমিতে পুষ্পভারাবনত শাল গাছগুলিতে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে তা বোঝবার মতো ভাষা আমার নেই। কাল সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ ভোরে থেমে গেছে। বৃষ্টির পর লাল মাটির কাঁচা রাস্তা, পুষ্পশোভিত কচি কলাপাতারঙা শাল বন, ওয়াশের কাজের মতো পাহাড়শ্রেণির নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে ট্রেলারে চড়ে জঙ্গলে ঘোরার মারাত্মক ঝুঁকি ও শারীরিক কষ্টও যেন ভুলে গেলাম।

হঠাৎ মণিদি বললেন, 'হাতি! হাতি!'

কানুদা বললেন, 'দিনদুপুরে হাতি না ছাই। স্বপ্ন দেখছিস।'

ওমা! চেয়ে দেখি, সত্যিই হাতি। দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতি ঝাঁটি-জঙ্গলে ভরা ছোটো টিলা পেরিয়ে ওপরের উঁচু টিলাতে যাচ্ছে হেলতে-দুলতে আর তাদের পায়ে পায়ে একটা গাবলু-গুবলু বাচ্চা। গোলগাল, গোবর গণেশ, একহাত শুঁড়টাকে নাড়াতে নাড়াতে চলেছে।

বাচ্চু একদৃষ্টে চেয়ে ছিল, আমরা সকলেই। হঠাৎ বাচ্চু বলল, 'রুদ্র, হাতির মাংস কখনো খেয়েছ? বোধ হয় পাঁঠার চেয়েও নরম হবে। দৌড়ে গিয়ে ধরি?'

বলেই, কারও পারমিশানের অপেক্ষা না করে ট্রেলার থেকে এক লাফে নেমে হাতিদের দিকে দৌড় লাগাল ও।

জিপের মধ্যে সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হল? কী হল?'

কী হল, তা জানতে এতটুকু উৎসাহ না দেখিয়ে কানুদা উৎসারিত কণ্ঠে বললেন, 'আমার ক্যামেরা! ক্যামেরা!' বলেই সামনের সিটে বসে পিছন দিকে জোরে গলফ-খেলা তাগড়া হাত ছুড়লেন।

হাতটা এসে লাগল মণিদির নাকে।

মণিদি বললেন, 'উঁ বাঁবাঁরেঁ।'

ঋজুদার চুপ করেছিলেন, পাইপের ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ হচ্ছিল।

কানুদা শালিকে ধমকে বললেন, 'মণি, ক্যামেরা কোথায়? শিগগির দে। এখন ন্যাকামি করিস না।'

'ন্যাঁকাঁমি নাঁ। নেঁই।' বলেই মণিদি নাকিসুরে কেঁদে উঠলেন।

ঠিক সেই সময়ে কানুদা বললেন, 'নেই মানে? ইয়ার্কি পেয়েছিস?'

আমি ঘোড়ার পিঠে বসার মতো করে ট্রেলারের দু-দিকে দু-পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে, বাচ্চুর কার্যকলাপ রিলে করছিলাম।

বললাম, 'এইবার সেরেছে। সর্বনাশ।'

সকলে চেয়ে দেখলেন, বড়ো হাতিটা বাচ্চুর দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাচ্চু নির্বিকার। ও হাতির বাচ্চার রোস্ট খাবেই।

কানুদা আবার বললেন, 'মণি, ক্যামেরা।'

মণিদি বললেন, 'ডাঁলমুঁটের ঠোঁঙার মধ্যে রেখেঁছিলাঁম। ডাঁলমুঁটের ঠোঁঙাটা কাঁঠের বাঁক্সে। কাঁঠের বাঁক্সটা ট্রেঁলারে।'

কানুদা একটা চাপা কিন্তু তীব্র ধমক দিলেন মণিদিকে। সংক্ষিপ্তসার, ইডিয়ট।

মণিদি ভ্যাঁ-অ্যা করে কেঁদে দিলেন।

ওদিকে হাতি ডেকে উঠল, প্যাঁঅ্যাঅ্যাঅ্যা। বলেই, শুঁড় তুলে ডান পায়ে শূন্যে ফুটবলে লাথি মেরে এগিয়ে এল। শর্টসপরা ও হাওয়াইয়ান চপ্পলপরা বাচ্চু দৌড়ে পালিয়ে আসতে গিয়ে একটা হোঁচটা খেয়ে পড়ল ধপাস করে। তারপর উঠে দৌড়ে এসেই দূর থেকে লং-জাম্প দিয়ে সোজা এসে ট্রেলারে পড়ল। প্রায় আমার ঘাড়ে। ও-ও ধপ করে পড়ল, কানুদাও বললেন, 'গেল।'

বাচ্চু লজ্জিত হয়ে পিছনে না তাকিয়েই বলল, 'কী গেল? হাতি? চলে গেল?'

তারপর সঙ্গেসঙ্গে বলল, 'আমার একপাটি চপ্পলও!'

মণিদি বললেন, 'নাঁ-আঁ-আঁ। বোঁধ হঁয় ভেঙেঁ গেল। কাঁনুদার ক্যাঁমেঁরা উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-।'

কানুদা আবার বললেন, 'ইডিয়ট।'

ঋজুদার জিপটা জোরে চালিয়ে দিয়ে বলল, 'কে? বাচ্চু, না মণিদি?'

'দু-জনেই।' কানুদা রেগে বললেন।

এরপর জিপের আরোহীরা নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে মণিদির নাক টানার শব্দ।

কিন্তু রাস্তার দৃশ্যের তুলনা নেই। কানুদার মতো ঋজুদার ক্যামেরাতে বিশ্বাস করে না। চোখের টু-পয়েন্ট লেন্সে এইসব নিসর্গ-ছবি তুলে নিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যের অন্ধকার ল্যাবরেটরিতে লুকিয়ে রেখে দেয় অবচেতনের ভাঁড়ারে। যখন যেমন দরকার পড়ে, তখন তেমন সেইসব মুহূর্তের, দৃশ্যের, পরিবেশের শব্দ, গন্ধ, রূপের সামগ্রিক চেহারাটা তার কলমের মুখ থেকে সাদা পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের

মস্তিষ্ক যা পারে, যা ধরে রাখে; পৃথিবীর কোনো ক্যামেরা বা টেপ রেকর্ডারই তা পারে না। মানুষ যেদিন গন্ধ-ধরা যন্ত্রও বের করবে-সেদিনও পারবে না।

পথের বাঁকের হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা বুনো চাঁপার গন্ধ, বা মেঘলা আকাশের মৃদু মৃদু হাওয়ায় আলতো হয়ে ভাসতে থাকা শাল ফুলের গন্ধকে কি কোনো যন্ত্র ধরতে পারে?

আমরা ময়ূরভঞ্জের রাজার শিকারের বাংলো ভঞ্জবাসার পথ ছেড়ে এসেছি। পথটা বড়াকামড়া বাংলো থেকে নদী পেরিয়ে লাল মাটির লালিমা মেখে ছুটে গেছে সবুজ জঙ্গলের গভীরে। গতকাল আমরা রাজার বাড়ি চাহালাতে ছিলাম। চাহালা নামটার একটা ইতিহাস আছে। এখানে রাজা প্রত্যেকবার শিকারে আসতেন। একবার হাঁকা শিকারের সময় রাজা এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা অনেক জানোয়ার মারলেন। আর সঙ্গেসঙ্গে আরম্ভ হল শিলাবৃষ্টি। সে কী শিলাবৃষ্টি! রাজার ক-জন বন্ধু মারা গেলেন, মারা গেল অনেক হাঁকাওয়ালা। রাজাও নাকি আহত হয়েছিলেন। লোকে বলতে লাগল যে, ভগবানের আসন টলে গেল। মরণোন্মুখ ও আহত পশুপাখির কান্নায় ও চিৎকারে ভগবানের আসন টলে গেছিল সেদিন। সেই থেকে নাম চাহালা। সেই দিন থেকে চাহালাতে শিকার বন্ধ। এমনকী, গাছ পর্যন্ত কাটা হত না রাজার আমলে। এখনও অনেক বন বিভাগের অফিসার সেকথা মেনে চলেন। বাংলোর হাতায় একটা পিয়াশাল গাছ আছে কুয়োয় যাওয়ার পথে, তার চারদিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রেখেছেন রেঞ্জার মিশ্রবাবু। পাছে ভুল করে গাছটার কেউ ক্ষতি করে।

এখানে প্রকৃতির পুত্র-কন্যাদের উপর বিন্দুমাত্র অন্যায় হলে আবারও ভগবানের আসন টলতে পারে। সকলেই এই ভয় বুকে নিয়ে বাঁচেন এখানে।

চাহালা বেশ উঁচু। গরমের দিনেও ঠান্ডা। অনেকগুলো ইউক্যালিপ্টাস গাছ আছে হাতার মধ্যে বৃত্তাকারে লাগানো। বসন্ত সকালের সোনা রোদ যখন ইউক্যালিপ্টাসের মসৃণ পাতায় চমকাতে থাকে, সুনীল আকাশের নীচে তখন নীলকণ্ঠ পাখি বুকের মধ্যে চমক তুলে ডেকে ডেকে ওড়ে। টিয়ার ঝাঁক শিহর তুলে একদল ছোট্ট সবুজ জেট-প্লেনের মতো ছুটে যায় নক্ষত্র জয়ের জন্য নীলোৎপল আকাশে।

একটা পথ বাংলোর ডাইনে বেরিয়ে গেছে হালদিয়ার দিকে। বারো কিলোমিটার। অন্য পথ, কাইরাকাচার দিকে। এই দু-জায়গায়ই বন বিভাগের ছোট্ট মাটির ঘর আছে। খড়ে-ছাওয়া বাংলো। তার চারপাশে হাতি যাতে না আসতে পারে, সেজন্যে গভীর গড় কাটা। ছোট্ট নিকোনো মাটির উঠোন। ছোট্ট বারান্দা। স্বপ্নে দেখা ছবির মতো। পাশেই ঝরনা। বড়ো বড়ো গাছ ঝুঁকে পড়েছে চারধার থেকে। মাটির উঠোনে টুপ টাপ পাতা পড়ে ঝরে ঝরে। নির্জন দুপুরে কাচপোকা ওড়ে বুঁ-বুঁবুঁ-বুঁই-ই-ই আওয়াজ করে। জংলি হাইবিস্কাস-এর সরু ডালে বসে নানারঙা মৌটুসি পাখি শিস

দেয়। দূর থেকে হাতির দলের বৃংহণ ভেসে আসে, কোটরা হরিণ ডেকে ওঠে ব্বাক, ব্বাক, ব্বাক করে। তার উদাত্ত আওয়াজ অনুরণিত হয় পাহাড়ে পাহাড়ে; বনে বনে। উঁচু গাছের ডাল থেকে অর্কিড দোলে মন্থর খেয়ালি হাওয়ায়। গন্ধ ওড়ে।

চাহালা থেকে আরও একটা রাস্তা গেছে ন-আনা হয়ে, বড়াই পানি জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে। যে প্রপাত থেকে বুড়াবালাম নদীর সৃষ্টি। তারপর পৌঁছেছে গিয়ে ধুধরুচমগাতে। কী দারুণ নামটা, না? ধুধরুচমগা। এখানে আরও সব সুন্দর সুন্দর নামের জায়গা আছে। যেমন বাছুরিচরা। ধুধরুচমগাতে পৌঁছোলে মনে হয় খাসিয়া পাহাড়ের কোনো নিভৃত জায়গায় এসেছি, অথবা কুমায়ুনের। চিড় আর চিড়। শুধু চিড়ের বন। ময়ূরভঞ্জের রাজা বহু বহু বছর আগে এই উঁচু মালভূমিতে পাইন গাছ এনে লাগিয়েছিলেন। ঘন গহন পাইন বন। লোক নেই, জন নেই, দোকান নেই, শুধু বন আর বন। হাওয়া ওঠে যখন পাইনের বনে, তখন এমন এক মর্মরধ্বনি ওঠে যে কী বলব। পাইনের গন্ধ ভাসে হাওয়ায়। চিড়ের ফলগুলো ঝরা চিড় পাতার মখমল গালচের উপরে নিঃশব্দে গড়িয়ে যায়। গা শিরশির করে ভালো লাগায়। তার সঙ্গে মিশে যায় কত না নাম-জানা এবং না-জানা ফুলের গন্ধ।

প্রত্যেক জঙ্গলের গায়েরই একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। প্রত্যেক মানুষের গায়ের গন্ধের মতো। গন্ধ ঋতুতে ঋতুতে বদলায়। যেমন বদলায় শব্দ; যেমন বদলায় রূপ। চৈত্রের হাওয়ায় বনের বুকে যে-কথা জাগে, সে-কথার সঙ্গে শ্রাবণের কথা বা মাঘের কথার কত তফাত! সে-রূপেরই-বা কত তফাত! যার চোখ আছে, সে দেখে, যার কান আছে সেই শোনে, যার হৃদয় আছে সে-ই শুধু হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করে।

অনেকেই জঙ্গলে যান, হইহই করেন, পিকনিক করে চলে আসেন, কিন্তু জঙ্গল তাঁদের জন্যে নয়। পিকনিক করার অনেক জায়গা আছে। জঙ্গলে গেলে নিজেরা কথা না বলে জঙ্গলের কী বলার আছে তা শুনতে হয়।

ন-আনা জায়গাটার নামটাও ভারি মজার, তাই না? এর একটা ইতিহাস আছে। রাজার খাজনা ছিল এখানে ন-আনা। তাই জায়গাটার নাম ন-আনা।

ন-আনা জায়গাটাও ভারি সুন্দর। ধুধরুচমগা বা জেনাবিলের মতো এখানকার বাংলো কাঠের দোতলা নয়। পাকা বাংলো। চাহালাতেও বাংলোটা একটা টিলার মাথায়-বহুদূর চোখ যায়। অনেকখানি জায়গা জঙ্গল কেটে ফাঁকা করা আছে। পাহাড়ি নদী গেছে এঁকেবেঁকে। ধুধু উদোম টাঁড়-কিন্তু রুক্ষ নয়।

এই চৈত্রশেষের বৃষ্টিতেও চারিদিক সতেজ সবুজ দেখাচ্ছে। আমরা যখন ন-আনায় যাচ্ছিলাম তখন আমাদের সঙ্গে একজন গোন্দ দম্পতির দেখা হয়ে গেছিল। তির-ধনুক হাতে নিয়ে চলেছিল কালো ছিপছিপে বাবরি-চুলের ছেলেটি আর হলুদ রঙে ছোপানো শাড়িপরা মেয়েটি। মেঘলা আকাশের নীচে।

কানুদাকে শুধোলেন ঋজুদা, 'রাতে কোথায় থাকা হবে?'

'জেনাবিলে।' কানুদা বললেন।

বাচ্চু বলল, 'এই সেরেছে।'

আমি বললাম, 'কেন? অসুবিধা কীসের?'

ও বলল, 'না। পরে বলব।'

দেখতে দেখতে আমরা দেও নদীতে এসে পড়লাম। বড়ো বড়ো মাছ আছে নদীটাতে। একটা দহের মতো হয়েছে। বর্ষার লাল মাটি ধোওয়া ঘোলাজল ভরে রয়েছে কানায় কানায়।

হঠাৎ বাচ্চু আমাকে বলল, 'কানায় কানায় ইংরেজি কী?'

আমি অনেক ভাবলাম। তারপর বললাম, 'জানি না।'

কানুদা বললেন, 'মণি, নাক কেমন?'

মণিদি বললেন, 'ভাঁলোঁ। এঁকটুঁ রঁক্তঁ বেঁরিয়েঁছে।'

খুকুদি বললেন, 'তোর একটুতেই বাড়াবাড়ি।'

মণিদি বললেন, 'হু তোঁর নিঁজেঁর বঁর কিঁনা! হুঁ...!'

ঋজুদার বললেন, 'ওঁ মণিপদ্মে হুম।'

কানুদা বললেন, 'বাঁ-দিকে নয়; ডান দিকে।'

ভুল করে ঋজুদার বাঁ-দিকে চলে যাচ্ছিল। কানুদা স্টিয়ারিং ডান দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

দেও নদী পেরিয়ে আমরা দেবস্থলীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। জনমানব নেই, লোকালয় নেই-জঙ্গল আর জঙ্গল। মাইলের পর মাইল থমথমে নিস্তব্ধতা। দেবস্থলীতে একটা ছোটো খড়ের ঘর-চারধারে গড় কাটা হাতির জন্যে। টাইগার প্রোজেক্টের বাংলো। কোনো ফরেস্ট গার্ড থাকেন বোধ হয়। এখন কাউকে দেখলাম না।

বাচ্চু বলল, 'রুদ্র, তুই কখনো বাঘের মাংস খেয়েছিস?'

আমি বললাম, 'না। তবে প্রায় সব জানোয়ারেরই খেয়েছি-এক গাধা ছাড়া।'

বাচ্চু বলল, 'কাক কখনো কাকের মাংস খায়?'

আমি বললাম, 'কী বললি?'

বলতেই সামনে থেকে ওঁরা সকলে হেসে উঠলেন।

আমার কান লাল হয়ে উঠল। এই জন্যেই অল্প-চেনা লোকদের সঙ্গে আসতে চাই না কোথাও। ঋজুদাটা আর মেশার লোক পেল না। ভালো লাগে না।

দূর থেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের সমান প্রান্তরে ছবির মতো জেনাবিল গ্রামটা চোখে পড়ল। একটা হাতির কঙ্কাল পড়ে আছে। দুটো হাতি নাকি লড়াই করেছিল এখানে, সিমলিপালের রিপোর্টার কানুদা বললেন।

মণিদি বললেন, 'নাঁ। লঁড়াই নাঁ। আঁদর।'

বাচ্চু বলল, 'বাঁদর।'

কানুদা বললেন, 'কোথায়?'

ঋজুদার বললেন, 'ট্রেলারে।'

অনেকগুলো বাঁদর পথ পেরিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে গেল।

কানুদা বললেন, 'পারফেক্ট হেলথ।'

জেনাবিলের কাঠের বাংলোটা হাতিরা ধাক্কাধাক্কি করে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। বাংলোটা হেলে গেছে। বড়ো বড়ো কাঠের গুঁড়িগুলোকে সোজা করে বসাবার জন্যে ও পাশে পাশে ঠেকনো দেওয়ার জন্যে বিরাট বিরাট গর্ত খোঁড়া হয়েছে। বাংলো পুরোপুরি সারাবার আগে বহু লোকের যে পা ভাঙবে, মাথা ফাটবে এই গর্তে পড়ে, তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলোটার সব ভালো। কিন্তু বাথরুম নেই। কোনো ফার্নিচারও নেই। একটা চেয়ার পর্যন্ত নয়। মাটিতে শোওয়া, মাটিতে বসা। নীচে গার্ডের ঘরে রান্না করা। বেশ দূরের ঝরনাতে চান, হাত-মুখ ধোওয়া। সিমলিপালের বেশিরভাগ বাংলোতেই রান্নাবান্না সব নিজেদেরই করতে হয়। সেজন্যে অসুবিধা নেই। কিন্তু বাঘ-হাতির জঙ্গলে রাতবিরেতে প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিতে জঙ্গলে যাওয়া একটু অসুবিধের!

বাংলোয় পৌঁছেই খুকুদি বললেন, 'মণি, তাড়াতাড়ি স্টোভটা বের কর। চা বানাই। তারপর খিচুড়ির বন্দোবস্ত করে বেরিয়ে পড়ব এক চক্কর। সন্ধ্যের মুখে মুখেই তো জানোয়ার বেরোয়।' তারপরই বললেন, 'মুগের ডাল আছে?'

ঋজুদার এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এখন জিপ থেকে নেমে গার্ডের ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে পাইপে নতুন করে তামাক ভরতে ভরতে বলল, 'খুকুদি, তাড়াতাড়ি চা।'

চা খেয়ে খেয়ে খুকুদি ডিসপেপটিক। ঋজুদার মতো চা-ভক্ত লোক পেয়ে খুশি।

মণিদি স্টোভ বের করলেন। খুকুদি বললেন, 'মুগের ডাল দিয়ে খিচুড়িটা ভালো করে রাঁধতে হবে রাতে। সকাল বেলা ভালো হয়নি।'

বাচ্চু আতঙ্কিত গলায় বলল, 'আবারও খিচুড়ি?'

খুকুদি বললেন, 'না তো কী! এই জঙ্গলে তোমার জন্যে বিরিয়ানি পাব কোত্থেকে?'

বাচ্চু বলল, 'না, তা বলছি না। মানে, একটু অসুবিধা ছিল।' তারপরই বলল, 'ওষুধের বাক্সে কি কিছু আছে?'

'ও! তোর বুঝি পেট খারাপ হয়েছে?' খুকুদি বললেন।

বাচ্চু বলল, 'দশ দিন হল এবেলা খিচুড়ি, ওবেলা খিচুড়ি তো।' তারপর চারধারের জঙ্গলে চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলল, 'আমি নেই। যা খেয়েছি সকালে, অনেক খেয়েছি। আর খাওয়াদাওয়ার মধ্যে নেই।'

আমি বললাম, 'ভয় কীসের? যেদিকে তাকাবি, সেদিকেই তো উদার, উন্মুক্ত।'

বাচ্চু রেগে বলল, 'তুই যা না, যতবার খুশি।'

মণিদি বললেন, 'বাঁদর।'

আমি ও বাচ্চু দু-জনেই একসঙ্গে তাকালাম। তারপর বুঝলাম যে আমরা নই।

একটা বড়ো বাঁদর গার্ডের ঘরের পাশের গাছে বসে আছে।

তাড়াতাড়ি করে চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একটা বড়ো চক্কর ঘুরে আসবার জন্যে। জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে জিপের ট্রেলার খুলে রেখে। জেনাবিল থেকে ধুধরুচমগা যাওয়ার এই স্বল্প-ব্যবহৃত পথটাতে যে কত জীবজন্তু দেখেছিলাম আমরা আসার সময়, তা বলার নয়। দিনের বেলা দলে দলে হাতি, ময়ূর, হিমালয়ান স্কুইরেল, বাঁদর, বার্কিং ডিয়ার।

প্রায় পাঁচ কিলোমিটার মতো গেছি, একদল বুনো কুকুর লাফাতে লাফাতে রাস্তা পেরোল। মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করছিল ওরা।

ঋজুদার বলল, 'বুনো কুকুর এসেছে যখন, তখন এখানে এখন কিছু দেখা যাবে না।'

কানুদা বললেন, 'চলোই না একটু ভিতরে।'

আসন্ন সন্ধ্যার আধা-অন্ধকারে ময়ূর ডাকছে, মুরগি ডাকছে, বাঁদর হুপ-হুপ-হুপ-হুপ করে উঠছে গভীর জঙ্গল থেকে। হাতির দল দূর দিয়ে দিনের শেষে ঘুমের দেশে চলেছে সারি বেঁধে, গায়ে লাল মাটি মেখে। মনে হয় স্বপ্ন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না সত্যি বলে।

হঠাৎ ঋজুদার জিপটা হল্ট করিয়ে দিয়ে বলল, 'মামা।'

বাচ্চু বলল, 'কার মামা?'

খুকুদির লম্বা হাতটা জিপের পেছনের আধো-অন্ধকারে এসে বাচ্চুর কানে আঠা হয়ে সেঁটে গেল। খুকুদির হাতটা বাচ্চুর কানে পড়তেই বাচ্চুর ও আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

পথের ডান দিকে খাদ-বাঁ-দিকে পাহাড়। সূর্য ডুবে এসেছে। মামা আসছে গোঁফে তাড়া দিয়ে সোজা হেঁটে জিপের একেবারে মুখোমুখি।

সকলে স্ট্যাচু হয়ে গেছে জিপের মধ্যে। শুধু ঋজুদার পাইপের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

প্রকাণ্ড বড়ো চিতা। চমৎকার চিক্কণ চেহারা। গোঁফ দিয়ে জেল্লা বেরোচ্ছে। এ-জঙ্গলে মানুষ বোধ হয় একেবারেই আসে না, নইলে চিতার এমন ব্যবহার আমি কখনো দেখিনি।

জিপের থেকে হাত-কুড়ি দূরে চিতাটা সোজা বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। দিনের শেষ আলোর ফালি এসে পড়ল ওর গায়ে। সে এক দারুণ সৌন্দর্য ও স্তব্ধতার মুহূর্ত।

সেই নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে হঠাৎ কানুদা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'মণি, ক্যামেরা!' বলেই সকালের মতো আবারও হাত ছুড়লেন।

'মাঁ-গোঁ-ও!' বলে মণিদি জিপের মধ্যেই বসে পড়লেন।

চিতাটা ভীষণ ভয় পেয়ে চমকে উঠে এক লাফে খাদের দিকে দৌড়ে গেল। তারপর কী করে নামল খাদ বেয়ে, তা সে চিতাই জানে। ডিগবাজি খেয়ে নিশ্চয়ই ওরও নাক ভাঙল।

খুকুদি বললেন, 'এটা বাড়াবাড়ি কানু, তোমার ক্যামেরা তুমি ঠিক করে রাখতে পার না? মেয়েটার নাক দিয়ে এখনও রক্ত ঝরছে, তার ওপর আবার আঘাত?'

কানুদা বললেন, 'ক্যামেরা কোথায়?'

'কাঁজুবাঁদামেঁর টিঁনে।' মণিদি কোঁকাতে কোঁকাতে বললেন।

কানুদা চিতাবাঘটা লাফানোর আগে যেমন ধনুকের মতো বেঁকে গেছিল, তেমনি রাগে বেঁকে গিয়ে বললেন, 'দেয়ারস আ লিমিট। ডালমুটের ঠোঙা থেকে বের করে কাজুবাদামের টিনে-ক্যামেরা?'

মণিদি জামাইবাবুকে খুব ভালোবাসেন।

বললেন, 'তুঁমিঁই নাঁ বঁলেছিলে বৃষ্টিতে লেন্সে ফাঙ্গাঁস পড়ে যাবে? আঁমি তাঁই যঁত্ন কঁরে-এঁ-এঁ-এঁ। উঁ-হুঁ-হুঁ-।'

ঋজুদার জিপ থেকে নেমে বললেন, 'এইরকম কোনো জায়গাতেই শূর্পণখার নাক কাটা গেছিল। এখানে প্রত্যেকের নাক সাবধানে রাখা উচিত।' বলে রুমাল বের করে নিজের নাক মুছল।

খুকুদি বললেন, 'বাচ্চু, মণির নাকে ওয়াটার-বটল থেকে একটু জল দে তো।'

কোথায় বাচ্চু?

তাকিয়ে দেখি বাচ্চু নেই। কখন যে হাওয়া হয়েছে, কেউই লক্ষ করিনি।

বাঘও ডান দিকে খাদে লাফিয়েছে, বাচ্চুও বাঘকে ডোন্টকেয়ার করে বাঁ-দিকে পাহাড়ে চড়েছে। ও বলেইছিল যে, ওর একটু অসুবিধা আছে। কিন্তু বাঘের চেয়েও যে বেশি ভয়াবহ কিছু আছে একথাটা সেবারেই প্রথম জানলাম। বাঘ তো বাঘই; কিন্তু খিচুড়ি-ঘোঘ।

ডিমেংকারি

১

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা বলতে বসেছি। হাজারিবাগে গোপালদের ছবির মতো বাড়িতে উঠেছি গিয়ে গোপালের সঙ্গে। গোপালের ভালো নাম মিহির সেন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এবং শিকারি। পনেরো দিন থাকব। একশো টাকা ক্যাপিটাল। এবেলা এবং ওবেলা চমনলাল খিচুড়ি রাঁধে। মুরগি, তিতির, খরগোশ শিকার হলে আমিষ। নইলে নিরামিষ।

এখন শীত। শীত মানে, হাজারিবাগি শীত। সন্ধ্যে হতে-না-হতেই দু-কান পাকড়ে থাপ্পড় মারে।

আমাদের গাড়িও নেই, জিপও নেই। জোগাড় করার ক্ষমতা বা প্রতিপত্তিও নেই। পায়ে হেঁটে এদিক-ওদিক ঘুরি বন্দুক-কাঁধে। অথবা সাইকেল-রিকশা করে সীমারিয়ার রাস্তাতে বানাদাগ অবধি গিয়ে, সাইকেল-রিকশা ছেড়ে দিয়ে বন্দুক এবং ঝোলাঝুলি কাঁধে হন্টন মারি ক্বোসমার উদ্দেশে। নাগেশ্বরোয়ার ঘর তেঁতুল গাছতলায়। নয়া তালাও-এর কাছে। সেই ঘরের লাগোয়া নাজিমসাহেবের তিন দিক বন্ধ আর এক দিক একেবারে উদোম-খোলা মাটির ঘরটি। জাংগল-কটেজ। সেই ঘরই আমাদের আস্তানা। রাতে, উদোম দিকটার সামনে আগুন জ্বেলে, আলুকা ভাত্তা, ঘি এবং খিচুড়ি খেয়ে ঘরের মাটির মেঝে-খোঁড়া ধিকিধিকি জ্বলা উনুনের পাশে প্রথম প্রহরে কাদা-ঘুম ঘুমিয়ে উঠে একেবারে সূর্যোদয় অবধি পালসা শিকার করি। পায়ে হেঁটে-টর্চ নিয়ে। দু-দিন আগে খুব বড়ো একটা হুন্ডার মেরেছিলাম আমি। আর গোপাল মেরেছিল একটা বড়কা দাঁতাল শুয়োর।

শ্রীসত্যচরণ চ্যাটার্জি, মানে সুব্রতর বাবা তখন হাজারিবাগের পুলিশ সুপার। এস.পি.র অফিসিয়াল কোয়ার্টারে থাকতেন তিনি তখন। গোপালই একদিন বলল, 'জিপ না হলে বড়ো শিকার কিছুই হবার নয়। রোজ রোজ কি সাইকেল-রিকশা করে সীতাগড়াতে গিয়ে মানুষখেকো বাঘের রাহান-সাহান-এর খোঁজ করে আবার ফিরে আসা যায় শহরে? এভাবে অসম্ভব। তার চেয়ে এক কাজ করো, তুমি বাংলায় একটা জম্পেশ করে চিঠি লেখো এস.পি.সাহেবের ছেলেকে। লেখো যে, তার শিকারের উৎসাহর কথা শুনছি আমরা বহুদিন ধরে, তাই আলাপ করার বড়োই ইচ্ছে, তা ছাড়া সীতাগড়া পাহাড়ে একটি মানুষখেকো বাঘ অপারেট করছে। আমরা তাকে মারবার চেষ্টাও করছি। যদি সে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চায়, তো দিতে পারে। আমাদের একটুও আপত্তি নেই। এমন করে চিঠিটা লেখো যাতে এক চিঠিতেই পার্টি কাত হয়। রিয়েল স্পোর্টসম্যান-স্পোর্টসম্যান গন্ধ বেরোয় যেন চিঠি থেকে। আসল কেসটা ধরে না ফেলে।'

এক বিকেলে পূর্বাচলের পশ্চিমের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে অনেক পাঁয়তারা করে একখানি চিঠি লিখে ফেললাম। মালির হাত দিয়ে সে চিঠি গোপাল পাঠিয়ে দিল এস. পি.সাহেবের বাংলোয়। জিপ-টিপ আর কোনো সমস্যাই নয়। যতক্ষণ না মালি উত্তর নিয়ে ফেরে, ততক্ষণ টেনস হয়ে, ভুরু কুঁচকে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেতে লাগল গোপাল।

সূর্যও ডুবল, আর করম মালি ফিরে এল সাইকেলে কির কির আওয়াজ তুলে। এবং প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই একটা গাড়ি বাংলোর গেটে ঢুকল। গাড়ি পার্ক করিয়ে লেংথ-উইদাউট-ব্রেথ কিন্তু প্রচণ্ড রাশভারী, কুড়ি বছরের তেজি শৌখিন গোঁফের সুব্রত চাটুজ্জে নামল গাড়ি থেকে।

গোপাল ফুলহাতা সোয়েটারের ওপরে একটা জাপানি কিমোনো পরে বসে ছিল। নীচে খাকি ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার। তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই বলল, 'নমস্কার।'

সুব্রতর সঙ্গে আমাদের আলাপ বিলক্ষণই হল। কিন্তু তাৎক্ষণিক সুবিধে বিশেষ হল না। ও বলল যে, বাবার সঙ্গে ঝুমরিতিলাইয়াতে যাচ্ছে, দিন-সাতেক পরে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে। কিন্তু আরও দিন-সাতেক আমরা থাকতে পারব কি না তারই ঠিক নেই।

যাই হোক, সুব্রত তার ফিনফিনে তালঢ্যাঙা ফর্সা চেহারার সঙ্গে একেবারেই বেমানান কালো, ঢাউস মার্কারি-ফোর্ড গাড়িখানা চালিয়ে যখন চলে গেল তখন গোপাল কিমোনোর দু-হাতের মধ্যে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'এ পার্টি বহুতই চালু আছে। জিপ তো পাওয়া যাবেই না, মধ্যে দিয়ে আমাদের সীতাগড়ের বাঘটাও বোধ হয় বেহাত হয়ে যাবে।'

'বেহাত হবে মানে? বাঘটা কি তোমার হাতের পাঁচ? আজ অবধি ল্যাজটি পর্যন্ত দেখাল না আমাদের! খালি থাবার ছাপ দেখিয়েই ঘুরিয়ে মারছে, চোখ-বাঁধা বলদের মতো।'

'উহারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে! একেই বলে যোগাযোগ! তবে আমাদের হাত থেকে ফসকেই গেল।'

কিমোনো থেকে বাঁ-হাত হঠাৎ বের করে বাঁ-গালে চটাস করে একটা মশা মেরে ও বলল, 'তোমার মাথায় গ্রে ম্যাটার বিলক্ষণ কম আছে। হাজারিবাগ জেলার এস. পি. সাহেবের ছেলে যদি কোনো হাজারিবাগি বাঘকে মারতে চায়, তাহলে সে সুধন্য বাঘ কি অন্য কারও কাছেই গুলিখোর হবে? মরণে মহান হলে, কাগজে ছবি ছাপা হবে তার শিকারির সঙ্গে। এমন সুযোগ কোনো বোকা মানুষই ছাড়ত না, আর এমন চালাক বাঘ ছাড়বে? না, সাংঘাতিক স্ট্র্যাটেজিক ভুল হয়ে গেল। বুঝেছ?'

সেই মানুষখেকো বাঘটাকে পরে সুব্রত মেরেছিল সীতাগড়া পাহাড়ের নীচে। টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল হকও সঙ্গে ছিল। ইজাহার আর আজকে বেঁচে নেই। সুব্রত এখন গোমিয়ার ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস-এর ভারী অফিসার। কয়েক বছর আগে কোথা থেকে এসে একটা গুলিখেকো রয়াল বেঙ্গল টাইগার গোমিয়ার এক্সপ্লোসিভস ফ্যাক্টরির উঁচু পাঁচিল টপকে ভিতরের পুটুস আর ঝাঁটিজঙ্গল-ভরা এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। গত জন্মে বোধ হয় ও সুব্রতর কাছে ঘুষ খেয়েছিল, তাই এজন্মে কৃতজ্ঞতায় সুব্রতর রাইফেলের মিষ্টি গুলি না খেয়ে মরবে না মনস্থ করে আত্মহত্যা করতে এসেছিল সুব্রতর সৎসঙ্গে। নাজিমসাহেবকে হাজারিবাগ থেকে ডাকিয়ে নিয়ে সেই মহান বাঘকে ঋণমুক্ত করেছিল সুব্রত এবং তার আত্মাকে বিষুনপুরের মোড়ে নিয়ে গিয়ে বাসে চড়িয়ে দিয়ে, গয়ায় পাঠিয়েছিল স্বপিণ্ডদানের জন্যে।

ভূতো-পার্টি ঠিক সেই সময় এসে লাফিয়ে নামল সাইকেল-রিকশা থেকে। এই এক ছেলে! একরত্তি কিন্তু ভয়-ডর, শীত-গ্রীষ্ম, আরাম-বিরাম বলতে কিছুমাত্র নেই। দারুণ গাড়ি চালায় আর যেকোনো গাড়ি বা জিপ ওর সঙ্গে কথা বলে। সবসময় গোপালের চামচেগিরি করছে এক-ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে।

ওকে পাঠানো হয়েছিল কোনো গাড়ি-টাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় কি না, তারই খোঁজে।

এই শীতে, নিম্নাঙ্গে শুধুমাত্র জিনস। ঊর্ধ্বাঙ্গে সোয়েটারহীন মালটিকালারড প্যারালাল স্ট্রাইপসের গেঞ্জি। শ্রীচরণে এক জোড়া হাফ-ক্ষয়ে-যাওয়া হাওয়াইয়ান চপ্পল। ঝাঁকি মেরে মেরে, হাঁটতে হাঁটতে ভূতো এসে সিরিয়াস মুখে বলল, 'হবে।'

আমি শুধোলাম, 'কী হবে?'

'গাড়ির বন্দোবস্ত। দেখে এলাম মসজিদের পেছনে থাকে থাকে সাজানো ইটের উপর বসে আছে নাইনটিন থার্টি-টুর হুডখোলা টি-মডেল ফোর্ড। হাঁস যেমন করে বসে ডিমে তা দেয়, তেমন করেই ইটে তা দিচ্ছে। তিরিশ টাকা ভাড়া এক রাতের। কাড়ুয়া তেলেও চলে, সুরগুজার তেলেও চলে, আবার পেট্রোলেও চলে। তবে তেলের কোয়ালিটি যত ভালো হবে ততই ভালো হবে পিক-আপ। বুক করতে হলে ক্লিয়ার ফর্টি-এইট আওয়ার্সের নোটিশ দিতে হবে মালিক-কাম-ড্রাইভারকে, কারণ, ইট-ফিট সরিয়ে, ইঞ্জিনের মধ্যে বাসা-বাঁধা নেংটি ইঁদুরদের তাড়িয়ে সব ঠিকঠাক করতে টাইম লাগবে তো!'

গোপাল অনেকক্ষণ ভূতোর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কী ভেবে, হঠাৎই ধমক দিয়ে বলল, 'মগের মুলুক পেয়েছ? তিরিশ টাকা কম টাকা হল নাকি? কম-টম করে কি না, কাল গিয়ে একটু হ্যাগলিং করে দেখে এসো। তিরিশ টাকা যেন তোমার গায়েই লাগছে না?'

ভূতো তীব্র আপত্তি করে জানাল যে, হ্যাগলিং-ফ্যাগলিং-এর মধ্যে সে আর নেই।

পরশু রাতে ছাড়োয়া ড্যামের কাছে এক গাদি শুয়োর মেরে এনে আমরা ভূতোকে পাঠিয়েছিলাম সর্দারজির হোটেলে। ভূতো, প্রায় মাঝরাতে জনা-পাঁচেক তাগড়া সর্দারজিকে নিয়ে গিয়ে ছাড়োয়া ড্যামের জঙ্গলের মধ্যে টর্চ ফেলে ফেলে মরা শুয়োর দেখাচ্ছিল আর হ্যাগলিং করছিল। একজন দৈত্যপ্রমাণ সর্দারজি ওকে কিছুতেই কায়দা করতে না পেরে, শেষে বগলচাপা করে রেখে দিয়েছিল অনেকক্ষণ। অত্যন্ত বেকায়দায়। এখনও নাকি সর্দারজির গায়ের প্যাঁজ-রসুনের গন্ধ যায়নি ওর নাক থেকে। হ্যাগলিং-এর নাম শুনেই ভূতো পেছিয়ে গেল।

তবে, তিরিশ টাকা তখনকার দিনে অনেক এবং আমাদের তো ওই অবস্থা। সুতরাং ভাড়াগাড়িও জুটল না। গোপালের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ চেষ্টা করাই সাব্যস্ত হল। পেট্রোল পাম্প থেকে ডালটনগঞ্জে একটা ফোন বুক করে দিয়ে ধুকপুক বুক নিয়ে আমরা বসে রইলাম মবিলের আঠাতে চ্যাটচেটে টেবিলের উপর। আশ্চর্য! সেদিন দশ মিনিটের মধ্যেই লাইন মিলে গেল। ডালটনগঞ্জের মোহন বিশ্বাস বলল, 'দু-দিনের জন্যে, নো-প্রবলেম। বে-ফিক্কর থাকুন। কাল দুপুরের মধ্যেই জিপ পৌঁছে যাবে হাজারিবাগের বাড়িতে।'

আমাদের আর পায় কে! পাম্প থেকে সোজা একেবারে নাজিম মিঞার বাড়িতে। ইদে জবাই হবার অপেক্ষায় পেতলের চেনে-বাঁধা মসৃণ, সফেদ খাসি উজ্জ্বল চোখে রোদ পোয়াচ্ছিল নাজিমসাহেবের বাড়ির বারান্দায়। তার পাশেই নাজিমসাহেবও স্বয়ং। খবরটা পেয়েই তো উনি লাফিয়ে উঠলেন। 'জিপ পাওয়া যাচ্ছে? কিন্তু কোন

দিকে যাওয়া যায়? আর কে কে যাবে?' বলেই বললেন, 'এক্কেবারে হল্লাগুল্লা নয়। গোপালবাবু, ভুচু, আমি আর আপনি।'

নাজিমসাহেব ভূতোকে প্রথম দিন থেকেই ভুচু বলে ডাকতেন। কেন, তা উনিই জানেন আর ভূতোই জানে। রহস্যটা এ পর্যন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

ভূতো নাজিমসাহেবকে ধমকে বলল, 'সে নাহয় হল, কিন্তু যাবেন কোন দিকে?'

আমরা নাজিমসাহেবকে খুবই সমীহ করতাম। কিন্তু হাজারিবাগে নবাগত, গোপালেরই অতিথি ভূতো (ওরফে ভুচু) প্রথম দিন থেকেই যে নাজিমসাহেবকে এমন ডেঁটে কথা বলত কোন সাহসে তা সত্যিই আমাদের বুদ্ধির বাইরে ছিল। পরে অবশ্য বিস্তারিত জানা গেছিল সে-রহস্য। সেকথা, অন্যখানে বলা যাবেখন।

নাজিমসাহেব বললেন, 'তাই-ই তো ভাবছি। কোথায় যাওয়া যায়?'

'টুটিলাওয়া হয়ে ওল্ড চাতরা রোড ধরে চাতরা যাবেন?' আমি বললাম।

গোপাল বলল, 'কাটকামচারী চলুন না, নাজিমসাব?'

ফচকে 'ভুচু' বলল, 'দানুয়া-ভুলুয়ার জঙ্গলে?'

নাজিমসাহেব ইদের খাসির মতোই অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পর ধ্যান ভেঙে বললেন, 'নেহি। উ সব ছোড়িয়ে। কাল চলেঙ্গে হান্টারগঞ্জ। মশহুর জাগা। হান্টার লোঁগোকা বেহেস্ত।'

আমরা সবিস্ময়ে, সহর্ষে, সমস্বরে বললাম, 'হান্টারগঞ্জ! ওয়া! ওয়াহ।'

২

পরদিন বেলা বারোটা নাগাদ ডালটনগঞ্জ থেকে চাঁদোয়া-টোড়ি, বাঘড়া মোড়, সীমারিয়া, টুটিলাওয়া হয়ে মোহনের জিপ সত্যিই হাজারিবাগে এসে পৌঁছোল। ড্রাইভারের নাম সাকির মিঞা। এই প্রচণ্ড শীতে এতখানি জঙ্গলের পথ আসতে ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল বেচারা। তার শরীরটা বেঁকে গিয়ে গাড়ির শক-অ্যাবসরবারের মতো দেখাচ্ছিল। সাকির মিঞাও আজ বেঁচে নেই।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ নাজিমসাহেব এসে পৌঁছোলেন দুই হ্যান্ডেল থেকে লাল-নীল প্লাস্টিকের ফিতে ঝোলানো তাঁর ঝিংচ্যাক সাইকেলে, রিং টিং বেল বাজিয়ে। আমরা বন্দুক মুছে, তেল দিয়ে, ফিনসে মুছে গুলি-টুলি ঠিকঠাক করে, ওভারকোট, টুপি, মাফলার, ওয়াটার বটল সব একজায়গায় জমিয়ে রেডি হয়েই বসেছিলাম।

নাজিমসাহেব এসেই গোপালকে বললেন, 'চমনকো বুলাইয়ে।'

চমন এসে দাঁড়াল গোপালের ডাকে। আমাদের চমনলাল সত্যিই গ্রেট লোক ছিল। কারও কথা শোনার সময় চমনের কান দুটো গ্লাইডারের ব্লেডের মতো নড়াচড়া করত। ওর আর যে গুণটি ছিল, তা কোনো মডার্ন সাবমেরিনের হাইড্রো-সোনার

সিস্টেমেরও নেই। ইচ্ছাশ্রুতির মানুষ ছিল সে। যেকথা সে শুনতে চাইত না, সেকথা শুনতেই পেত না।

নাজিমসাহেব চমনকে বললেন, চিতলের কাটলেট হবে। শুধু খিচুড়িটা রেঁধে রাখলেই চলবে চমনের। কিন্তু মশলা-টশলা বেটে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে মাংসের জন্যে। বাকি রান্না নাজিমসাহেব ফিরে এসে স্বয়ং ফটাফট করে ফেলবেন। নাজিমসাহেবের রান্নার হাতের জবাব ছিল না।

ভূতো কিছুক্ষণ বোকার মতো চেয়ে থেকে বলল, 'হান্টারগঞ্জের বাজারে বুঝি চিতল মাছ পাওয়া যায়? হাজারিবাগে তো পাওয়া যায় না!'

নাজিমসাহেব খিক খিক করে হেসে উঠলেন। পানের পিক আর কালা পিলাপাত্তি জর্দা ছিটকে এল দাঁতের ফাঁক দিয়ে। ঠাট্টার গলায় বললেন, 'আরে ভুচু, ঈ চিতল তুমহারা কুলকাত্তাকে চিতল নেহি হ্যায়।'

ভূতোকে বললাম, 'চিতল মানে স্পটেড ডিয়ার।'

আমাদের গোপালও দারুণ ভালো কুক। হাজারিবাগের বাড়ির নিরবচ্ছিন্ন নিরিবিলিতে ইংরেজি, মোগলাই, বাঙালি, চাইনিজ এবং নানারকম পদ নিয়েই এক্সপেরিমেন্ট চালাত ও। চমনলাল আর আমাকে দিয়ে সেসব এক্সপেরিমেন্টাল অখাদ্য খাওয়াত। খাওয়াদাওয়ার মধ্যে ও নিজে কোনোদিনই ছিল না। ও খালি শুঁকত। চিরদিনই নিখাকিবাবা। তবে, গোপালের রান্নার হাত এখন যে-রকম তাতে অনেক বড়ো বড়ো হোটেলের শেফও লজ্জা পাবে।

ড্রাইভার সাকির মিঞাকে উদ্দেশ করে নাজিমসাহেব বললেন, 'অব চলা যায় ড্রাইভারসাহাব।'

সাকির মিঞা বলল, 'জি, জনাব।'

আমি আর গোপাল সামনে বসলাম। পেছনে ভূতো আর নাজিমসাহেব। একমাত্র ভূতোরই গায়ে কোনো গরম জামা নেই। কারোই কোনো কথা শোনে না ও। নাজিমসাহেব বলতেই বলল, 'কলকাতায় তো শীত পাওয়া যায় না। এখানে পাচ্ছি, বিনাপয়সায় তাই খেয়ে নিচ্ছি খালি গায়ে। শীতটা ভালো। আপনাদের মশাগুলো খারাপ।'

জিপ ছেড়ে দিল। মুখ বাড়িয়ে গোপাল চমনকে বলল যে, আমরা খুব বেশি দেরি করলে রাত এগারোটা করব। খিচুড়ি যেন রেঁধে রাখে।

পদ্মার রাজার বাড়ির দিকে জিপ ছুটল। রাস্তাটা খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে। বড়ো বড়ো গর্ত। পথের দু-পাশের কাঁচা রাস্তাতে আরও বড়ো বড়ো গাড্ডা। কিন্তু সাকির মিঞা আড়াই পাক ফলস আর্মি জিপের স্টিয়ারিংটা শক্ত করে ধরে সটান সামনে

চেয়ে বসে রইল তো রইলই। ওই ঠান্ডায় হাত-নাড়ানাড়ির ঝামেলার মধ্যে সে একেবারেই যেতে চায় না বলেই মনে হল।

ওকে একটু লক্ষ করার পর নাজিমসাহেব বললেন, 'ক্যা, মিঞাসাব? নিম্মন গীতিয়া না গায়েব; না, সরকারনে পাকড়ায়েব?'

সাকির মিঞা গুঁ এবং গাঁর মাঝামাঝি একটা চাপা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ করল। স্টিয়ারিং ওইভাবেই ধরে থেকে। কী যে বলতে চাইল তার কিছুমাত্রও বুঝলাম না আমরা।

'ব্যাপারটা কী?' ভূতো শুধোল।

'ব্যাপার বুঝে আর কাজ নেই। যার বোঝার সে ঠিকই বুঝেছে। শরীরের সমস্ত যন্ত্রপাতির ঠিকানাই বদলে যাচ্ছে। আর জনাব বে-ফিক্কর। শেষমেশ ভুচুকেই চালাতে হবে জিপ। এভাবে যাওয়া...'

'কেন? এখন কুলকাত্তার ড্রাইভারকে তলব কেন? আপনার হাজারিবাগের সবই তো একেবারে উঁমদা! সুইজারল্যান্ডের চেয়েও ভালো জায়গা।'

ভূতো চিবিয়ে দিল নাজিমসাহেবকে। গোপাল বলল, 'বরহিতে তেল দেখে নিতে হবে ভূতো। ভুলো না।'

ন্যাশনাল পার্কের পাশে পৌঁছোবার আগেই ভূতোকে এসে স্টিয়ারিংয়ে বসতে হল। আমাদের হাড়গোড় নইলে সত্যিই আর আস্ত থাকবে না। সাকির মিঞা শেয়ালরঙা চাদরে তার শরীর এবং সম্মান আপাদমস্তক ঢেকে ফেলে পেছনের সিটে নির্বিকারে ঘুমোতে লাগল।

ভূতো জিপ চালাচ্ছে। তবুও, মাঝে মাঝেই, নাজিমসাহেবের বিরক্তিসূচক 'ঃআ, ঃউ, ক্যা হো রহা হ্যায়?' ইত্যাদি আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল পেছন থেকে।

গোপাল বলল, 'ক্যা হুয়া নাজিমসাব?'

'হোগা ঔর ক্যাঁ? ড্রাইভারজাদা তো আমাকে ইজিচেয়ার করেছেন। ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমুতে ঘুমুতে চলেছেন। পুরো শরীরের ভার আমারই গায়ে।'

মিনিট দশেক পর হঠাৎ কেঁয়াও বলে চেঁচিয়ে উঠলেন নাজিমসাহেব।

ভূতোও সেটাকে ভূতুড়ে আওয়াজ মনে করে আচমকাই ব্রেক-শুতে মারল ডান পায়ে এক জোর লাথি। মারতেই, এক্কেবারে কেলো! ঘুমন্ত, আত্মবিস্মৃত সাকির মিঞা সিট থেকে এক ঝটকায় নাজিমসাহেবের কোলে। এবং নাজিমসাহেব তাকে দু-ঊরুর উপরে নিয়ে ঘুঘুরসই করতে করতে জিপের মেঝেতে। ইনস্ট্যানটেনাসলি, আমাদের মাথা ঠুকে গেল উইন্ডস্ক্রিনে। কিন্তু এততেও যতি হল না। মনে হল, আমার ঘাড়েরই উপর দু-টি মামদো ভূতে গামদাগামদি করছে। তার উপর হঠাৎ কাঁচা

ডিমের ফাটা গন্ধ আর তার সঙ্গে উঁ-উ-উ, আঁ-আঁ, ইঁ-ইঁ-ইঁ, ঈঁ-ঈঁ-ঈঁ, গিঁস-গিঁস, টিঁস-টিঁস-নানারকম সব উদ্ভট আওয়াজ।

ভূতো একঝলক ব্যাপারটা দেখে নিয়েই স্টিয়ারিং ছেড়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে বাঁ-দিকের গাছতলায় দাঁড়িয়ে পেটে হাত দিয়ে কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে হাসতে লাগল। সে হাসি আর থামে না। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে আমরাও ঘাবড়ে গিয়ে নেমে পড়তেই দেখি, একেবারে ডুনুন-ডুনুন কাণ্ড! আনডাউটেডলি আন্ডা-হল্ট।

গোপাল সাকির মিঞাকে ধমকে বলল, 'আন্ডা কাঁহাসে লেতে আয়া আপ?'

সাকির মিঞা এবং নাজিমসাব দু-জনের কারোই কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। জিপের সিটের নীচে রাখা এক ঝুড়ি ডিমের মধ্যে বডি-থ্রো দিয়েছিলেন দু-জনে জাপটাজাপটি করতে করতে।

সাকির মিঞা যা বলল, তাতে বোঝা গেল যে, চিপাদোহরের ডেরায় রোড-আইল্যান্ড আর লেগ-হর্ন মুরগির অনেক ডিম হওয়াতে মোহনের মেজোকাকা ঝুড়ি-ভরতি ডিম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শাল পাতা দিয়ে প্যাক করে এই জিপে করেই। সাকির মিঞা ডিমের ঝুড়িটা নামাতে একেবারেই ভুলে গেছিল ডালটনগঞ্জে।

ভূতো একবার বাঁ-পা ছুড়ে ডান হাত তুলে, আর একবার ডান পা ছুড়ে বাঁ-হাত তুলে, 'ও বাব্বা রে! ও মাম্মা রে! কী গন্ধ রে!' বলে তখনও লাফাচ্ছিল ক্রমাগত।

সত্যিই, কাঁচা ডিমে ভারি বদ গন্ধ! তাও আবার এক ঝুড়ি বিলিতি মুরগির ডিমের একগাদা বিজাতীয় গন্ধ। ওয়াটার বটল দুটোর সব জলই শেষ হয়ে গেল ওদের দু-জনকে ডিম-ফুটিয়ে বের করতে। ভূতো নিজের হিপ পকেট থেকে ধূপকাঠির প্যাকেট নিকালকে চারগাছি ধূপকাঠি জ্বেলে জিপের ড্যাশবোর্ডে গুঁজে দিয়ে নাজিমসাহেবকে বলল, 'ক্যা আন্ডাবাবা? চলনা হ্যায় তো হান্টারগঞ্জ? হান্টারলোঁগোকা বেহেস্তমে?'

'হাঁ। হাঁ। চলো ভুচু। চলো। জরুর যানা!' গলায় কাঁচা ডিমের কুসুমের সঙ্গে কুসুম কুসুম উৎসাহ মাখিয়ে নাজিমসাহেব বললেন।

সাকির মিঞার বাতচিত বিলকুল বন্ধ। কারণ, ডিম ফাটাফাটি যা হবার তা তো হয়েছিলই, তার উপরে নাজিমসাহেবের বন্দুকটার বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা ব্যারেল একেবারে গদার মতো গিয়ে গদ্দাম করে তার চাঁদিতে পড়ায় তার মাথা ফাটাফাটিরও উপক্রম হয়েছিল।

আমার মন বলছিল যে, পুরো ব্যাপারটাই ভূতোর প্রি-প্লান্ড। যখন পেছনে বসেছিল ও তখনই নিশ্চয়ই ডিম আবিষ্কার করেছিল।

বরহিতে পৌঁছে তেল নেওয়া হল। চার গ্যালন মতো খেল তেল। সাকির মিঞা নেমে ড্রাইভিং সিট তুলে একটা বাঁশের টুকরো পেট্রোল ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে

দিয়েই, তুলে নিয়ে, তার গন্ধ শুঁকে বলল, 'হাঁ! পুরা ফুল হ্যায় ট্যাঙ্কি!'

সাকির মিঞা এবং নাজিমসাহেব দু-জনেই পানের দোকানে গিয়ে কষে কালা-পিলাপাত্তি জর্দা দিয়ে পান খেলেন, গন্ধ তাড়াতে। ভূতো বলল, 'গোপালদা, এই ফাটা ডিমের ঝুড়ি ধাবার সর্দারজিকে দান করে দিন, নইলে বিপদ হবে। ডিমের মতো অযাত্রা আর নেই। তার উপর শিকারে!'

আমি বললাম, 'সব ডিম তো ভাঙেনি। রোড-আইল্যান্ড আর লেগ-হর্নের ডিম। তা ছাড়া, পরের ডিম। দিয়ে দেবে?'

ভূতো চটে বলল, 'নিজের ডিম হলেও দেওয়া উচিত। ডিম ফটাফট ফাটবে এখানে; আর ওমলেট ফুলবে ডালটনগঞ্জের তাওয়ায়, তা তো হয় না। না দিতে চান তো সবগুলো ডিম গুলে একটা বারকোশের সাইজের ওমলেট বানাতে বলে দিয়ে, নামিয়ে দিন ড্রাইভারকে সর্দারজির ধাবায়। খাকগে সে বসে বসে।'

গোপাল বলল, 'মাথা গরম করে না ভূতো। দেখছ না, পরের ডিম।'

ভূতো গোপালের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করল।

বরহি থেকে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে দোভিতে এলাম আমরা। দোভি থেকে ডান দিকে গেলেই বুদ্ধগয়া হয়ে গয়া আর বাঁ-দিকে গেলে চাতরা। ওই রাস্তাতেই কয়েক মাইল গিয়ে ডান দিকের পাহাড়ের উপরে চলে গেছে একটি রাস্তা-হান্টারগঞ্জে। গয়ার অঃন্তসলিলা ফল্গুর শাখানদী ইলাজান বয়ে গেছে সেখানে এঁকেবেঁকে। ভারি সুন্দর নদী। দোভিতে এসে বাঁ-দিকে মোড় নেব আমরা। শীতটা বাড়ছে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ওখানে চা খেয়ে গা গরম করে নিলাম। ওঁরা দু-জনে আবারও জর্দাপান খেলেন।

'ওয়াটার বটলগুলোতে এখানে জল ভরে নেওয়া যাক ভূতো। সব জল তো ডিম ধুতেই গেল।' আমি বললাম।

নাজিমসাহেব বললেন, 'ছোড়িয়ে তো। ঝুটমুট দের হো রহা হ্যায়। ঔর দের করনেসে শিকার-উকার কুছ নেহি মিলেগা। ঝুটা পরিসানি হোগা।'

ভূতো জিপ স্টার্ট করে বলল, 'আপনারা কি কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র-ছাত্রী নাকি? যেখানেই যান, জলের বোতল গলায় ঝুলিয়ে...'

গোপাল চটে উঠে বলল, 'সবটাতে ইয়ার্কি কোরো না। বন-পাহাড়ে ঘুরে ঘুরেই এই অভ্যেস হয়েছে। কিছু খারাপ অভ্যেস নয়। জল হচ্ছে প্রাণ। জঙ্গলে গেলে জল সবসময়ই নেওয়া উচিত।'

ভূতো বলল, 'যত্ত সব বাতিক আপনাদের। রাতে এই ঠান্ডাতে কেউ আবার ঘড়া ঘড়া জল খায় নাকি? এমনিতেই তো শীতের দিনে ঘাম হয় না বলে বাথরুম করতে করতে হয়রান অবস্থা। তার উপর...। আমরা কি ফায়ার ব্রিগেডের লোক?'

ভূতোর সঙ্গে কথায় পারা ভার।

নাজিমসাহেব, যাঁর ভয়ে আমি আর গোপাল কেঁচো, তিনিই পারেন না; তায় আমরা কোন ছার।

এবার চাতরার রাস্তা ছেড়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠছি। এইসব অঞ্চল, হান্টারগঞ্জ-পরতাপপুর-জৌরী খুবই নামি শিকারের জায়গা ছিল একসময়। যখনকার কথা বলছি, তখনও ছিল-মানে বছর পঁচিশ-তিরিশেক আগে। বেশ ভালো জঙ্গল দু-দিকে। হান্টারগঞ্জে নাজিমসাহেবের চেলা আছে একজন। সেখানে গিয়ে পৌঁছোলে নাকি আর ভাবতেই হবে না। ওর সঙ্গে মাইল খানেক, এমনকী আধ-মাইলটাক হেঁটে গেলেই নিশ্চয়ই শিকার। গুলি ভরো আর মারো, মারো আর ভরো, খচাখচ-গোলি অন্দর; জান বাহার।

পাহাড়ের উপরের মালভূমিতে এবং ঢালে ঢালে ফসল লেগে আছে সব। কুলথি, সুরগুজা, মকাই, জিনোর, অড়হর, মটরছিম্মি। খেতে খেতে এখন শম্বর, চিতল হরিণদের ফিস্টি। আলু, কচু ইত্যাদির লোভে আসে শুয়োরের ধাড়ি-কচির দল। শজারু আর ভাল্লুক। আর তাদের পিছন পিছন চুপিসারে, আড়ে আড়ে আসে বড়ো বাঘ ও চিতা।

ভূতো কিন্তু দারুণ জিপ চালাচ্ছে। পাহাড়ি রাস্তা। খুব কম ব্রেক ব্যবহার করে শুধু গিয়ারেই এত ভালো গাড়ি চালায় ভূতো যে, শেখবার আছে ওর কাছে। গাড়ি তো চালায় অনেকেই, কিন্তু ঠিকমতো গাড়ি চালাতে খুব কম লোকই জানে। নাজিমসাহেব আমাদের সবসময় বলতেন যে, একজন মানুষের সঙ্গে অন্যজনের তফাত হল-ব্যস এটুকুতেই। বলতেন, যা-কিছুই করো না কেন জীবনে এমন করে করার চেষ্টা করবে যেন তোমার চেয়ে ভালো করে আর কেউই সেই কাজটা না করতে পারে। যখন যা করবে, তাতেই সেরা হবার সাধনা করবে। বলতেন, এই জেদটুকু থাকলে তবেই না মানুষ মানুষ হয়। মানুষের শরীর তো সব মানুষেরই আছে। কিন্তু তা বলে সবাই-ই কি মানুষ?

আমরা এখন পাহাড়ের অনেক উপরে উঠে এসেছি। লাল সুরকিরঙা মাটির কাঁচা পথ। ধারে পাহাড়-জঙ্গল। ধুলো উড়ছে না বেশি। ধুলোরাও যেন শীতের রাতে শিশিরের কাঁথা মুড়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে। বাঁকের মুখে হঠাৎ একটা পাটকিলেরঙা ধেড়ে খরগোশ দেখা গেল। পথের একবারে উপরেই।

নাজিমসাহেব বললেন, 'মানহুস।'

অর্থাৎ, মহা-অপয়া। বড়ো শিকারে বেরিয়ে খরগোশ মারা বারণ ছিল। জঙ্গলে ঢুকে প্রথমেই খরগোশ দেখলে সেদিন শিকার পাওয়া যাবে না বলেই বিশ্বাস

করতেন এই অঞ্চলের শিকারিরা। এব্যাপারে এক-এক জায়গায় এক-একরকম কুসংস্কার। শিকারিদের মতো কুসংস্কার বোধ হয় গ্রামের মেয়েদেরও নেই।

ভূতো বলল, 'দুস-স-স-স...'

খরগোশটা টুইস্ট নাচতে নাচতে চলল কিছুক্ষণ জিপের সামনে সামনে। তারপর হঠাৎ তড়াক করে বাঁয়ে লাফিয়ে গেল। খাদে পড়ল কি কাঁটাঝোপে বিঁধল, বোঝা গেল না। খরগোশটার দিক থেকে চোখ ফেরাতেই দেখি এক প্রকাণ্ড চিতা, শীতের চকচকে জেল্লাদার চামড়াখানা গায়ে ফেলে দিব্যি গোঁফে চুমকুড়ি দিতে দিতে একেবারে বড়ো রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে কোমর আর ল্যাজ দুলিয়ে লটর-পটর করতে করতে রোঁদে বেরিয়ে এদিকেই আসছে।

ভূতো এর আগে কখনো বাঘ দেখেনি জঙ্গলে; চিতাও নয়। জঙ্গল বলতেও দেখেছে মামাবাড়ির আম বাগান। হাজারিবাগেও এই প্রথম আসা ওর। শিকার বা বনজঙ্গল সম্বন্ধে ওর অভিজ্ঞতা তখন কিছুই ছিল না বলেই উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপনা খুবই বেশি ছিল। ক্যালকেশিয়ান ভূতোকে মানা করার আগেই সে দু-হাতে হর্ন টিপে ধরে হর্নের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, 'ওরে বাবা গো! বাঘে খেলে গো!' বলে চিৎকার করে উঠল। কত পার্সেন্ট ভয়ে, আর কত পার্সেন্ট পেজোমিতে, তা

ওই-ই জানে।

বাঘই বেশি ভয় পেয়েছিল, না ভূতো, তাও ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু আচমকা হর্ন বাজার সঙ্গেসঙ্গেই বাঘ ঘাবড়ে গিয়ে 'ঘাবুড়' বলে এক হাঁক ছেড়ে লাফ মেরে জঙ্গলের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল।

বাঘকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে আমরা কায়দা করে হড়হড়িয়ে নামতে যাচ্ছিলাম জিপ থেকে। সামনের কাচ ও হুড নামানো ছিল বলে জিপে বসে তাকে কবজা করা মুশকিল ছিল। নাজিমসাহেবও তার চামড়ার কেস থেকে বন্দুকটা আর্ধেক বের করে ফেলেছিলেন, কিন্তু চিতা-মহারাজের হাওয়া হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোঁ-কোঁওও-কোঁ-চোঁ-চোঁওও-একটা বদখত আওয়াজ করে উঠল জিপটা।

ভূতো স্টিয়ারিংয়ে বসেই বাঘের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বেদম হাসতে লাগল।

সাকির মিঞা রেগে বলল, 'কেয়া লড়প্পনবাজি কর রহা হ্যায় আপ?'

'লড়প্পন তো হ্যায়ই হ্যায়।' বলেই নাজিমসাহেব ড্রাইভারকে বললেন, 'আপ উতারকে জারা দেখিয়ে না জনাব ক্যা হুয়া!'

সাকির মিঞা নামার আগেই ভূতো বলল, 'ট্যাঙ্কে তেল শেষ গোপালদা। জিপ আর যাবে না। চিতলকা কাটলিস? ক্যা আন্ডাবাবা?'

'যাঃ। তা কী করে হয়?' গোপাল অবিশ্বাসের গলায় বলল।

'অনেক কিছুই হয়। হবার হলে।'

নাজিমসাহেব বললেন, 'এই ভুচু, মজাক মত করনা। ইয়ে মজাক কা বাত নেহি। ওয়াক্ত ভি নেহি!'

'মজাক-উজাক নেহি। পেট্রোল কা ট্যাঙ্কিমে পেতনি ঘুষ গ্যয়া।' ভূতো নাকি সুরে বলল।

বিরক্ত মুখে নাজিমসাহেব বললেন, 'পেতনি? পেতনি, কা চিজ?'

'কা চিজ? বাঙালি, জানানা ভূত। যিসকা পাকড়তা ওহি জানতা কা চিজ। অব বোলিয়ে নাজিম মিঞা ক্যা কিয়া যায়?'

আমরা সকলেই নামলাম। ড্রাইভিং সিট তুলে আবার সাকির মিঞা বাঁশ বাগিয়ে তেল মাপল। আশ্চর্য! সত্যিই একটুও তেল নেই।

ভূতো বলল, 'আপকা ট্যাঙ্কিমে জরুর ছ্যাঁদা হো গ্যয়া।'

সাকির মিঞা নট-নড়নচড়ন নট-কিচ্ছু, স্থিরনেত্র হয়ে তাকিয়ে রইল।

নাজিমসাহেব যেকোনো বিপদেই মাথা ঠান্ডা রাখেন। আর বাক্যব্যয় না করে জিপ থেকে ধীরে-সুস্থে নেমে, ভাঙা কাঠকুটো জোগাড় করে জিপের একটু দূরেই দেশলাই জ্বেলে আগুন করলেন। আমরাও নেমে কাঠকুটো জোগাড় করে এনে তার পাশে জমা করে রাখতে লাগলাম। হয়তো সারারাতই এখানে পড়ে থাকতে হবে। কে জানে?

আগুনের সামনে সকলে গোল হয়ে বসতেই নাজিমসাহেব পেটে হাত দিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, 'না-দানা, না-পানি। ক্যা হায়রানি! ঔর বহতই খাতরা। পাকড়া গিয়া তো কা হোগা? পইলে ডান্ডা, পিছে বাত। হান্টারগঞ্জকা শুটিং পারমিট লেকে হামলোগ থোড়ি আয়া! ইয়া আল্লা। ক্যা বদনসিবি!'

গোপাল উঠে ওয়াটার বটল দুটো নেড়েচেড়ে দেখল।

নাঃ, এক ফোঁটা জলও নেই সঙ্গে। শিকারে বেরোলেই নাজিমসাহেবের সঙ্গে আমেরিকান আর্মির ডিসপোজালের একটা রাকস্যাকও থাকতই থাকত। ছোটো, কিন্তু তার মধ্যে থেকে রাতবিরেতে জায়গায়-অজায়গায় কতবার বাখরখানি রোটি, শান্ডিলা লাড্ডু, গরমে বা বর্ষায় পাটনাই ল্যাংড়া বা দশেরি আম, তিতির-বাটরের কাবাব ইত্যাদি অবিশ্বাস্যভাবে বেরিয়ে পড়ত। আমরা বলতাম প্যান্ডোরাজ বকস। কিন্তু ঠিক আজকেই সেই রাকস্যাকটি সঙ্গে নেই। ঘড়িতে এখন রাত ন-টা। হান্টারগঞ্জ-পরতাপপুর থেকে একটা বাস নাকি ছাড়ে ভোর চারটেতে-যায় দোডি হয়ে অন্য জায়গায়। সেই বাসেই পাহাড় থেকে নেমে দোডিতে পেট্রোল কিনে আমাদের ফিরে আসতে হবে। নাজিমসাহেব জানালেন।

মনমেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একে শিকার পণ্ড, তায় এই বিপদ।

ঠিক হল, গোপাল এবং সাকির মিঞা বাসে করে কাল ভোরেই গিয়ে তেল, আমাদের জন্যে খাবার এবং পেট্রোল ট্যাঙ্কের জন্যে সাবান নিয়ে আসবে। কোনো রকমে ট্যাঙ্কের ছ্যাঁদা সাবান দিয়ে বন্ধ করে দোডি বা চাতরা পর্যন্ত চলে গেলেই ট্যাঙ্ক ঝালাইয়ের ব্যবস্থা একটা হবেই।

কাল ভোরের তো এখনও অনেকই দেরি। এখন তো সময় আর এগোচ্ছে না। দশটা, এগারোটা, বারোটা, তারপর একটা। ফুট ফাট করে কাঠ পুড়ছে। যতরকম গল্প জানা ছিল আমাদের সব গল্প জমা করেও সময় চলছে না। পেটের মধ্যে ধেড়ে ধেড়ে পাটকিলে খরগোশ কনটিন্যুয়াসলি লাফাচ্ছে। হায় চমনলাল! আহা! তোমার খিচুড়ির জবাব নেই।

আমি আর গোপাল নাজিমসাহেবের পাশে আগুনের সামনে বসে আছি। পাশেই বন্দুক রাখা আছে। গুলিভরা। এ জঙ্গলে খুব ভাল্লুক। নাজিমসাহেব বলছিলেন। চিতাবাঘের দেখা তো পাওয়াই গেল একটু আগেই। বড়ো বাঘও আছে। তবে মানুষখেকো না হলে বাঘকে নিয়ে ঝামেলা নেই। ভাল্লুকগুলোই গায়ে পড়ে ঝামেলা বাধায়, নাক-চোখ খুবলে নেয়, ভারি যাচ্ছেতাই। কিন্তু খালি হাতে থাকলে তবেই ভয়। গায়ে-পড়া স্বভাবের জন্তুজানোয়ারই তো আমাদের পছন্দ। বন্দুক তুলব আর চিতপটাং। ভূতো আর সাকির মিঞা জিপের মধ্যেই ঘুমোচ্ছে। এই ঠান্ডায় কী করে যে ঘুমোচ্ছে খালি গায়ে, তা ভূতোই জানে! ওর নাক ডাকার ফঁফর-ফঁর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোপাল আর আমিও আগুনের পাশে বসে বসেই ঢুলছিলাম। ঘুমোন না কেবল নাজিমসাহেব। আমরা তাঁর কাছে সহোদরপ্রতিম বলে, বিপদ ঘটলেই সেল্ফ-অ্যাপয়েন্টেড লোকাল গার্জেন হয়ে যান তিনি সব জায়গাতে।

হঠাৎ ভ্যাঁ-পোঁ, ভ্যাঁ-পোঁ বাসের হর্নে আমরা চমকে উঠলাম। চমকে উঠে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সত্যিই ভোর হয়ে এসেছে। এই রাত কী করে ভোর হবে তাই ভাবছিলাম, কিন্তু ভাবনা শেষ হবার আগেই ভোর হয়ে গেল। সব রাতই শেষ হয় একসময়, সুখের রাত, দুখের রাত। চারটে বেজে গেছে। বাস এসে গেছে পরতাপপুর থেকে। কুল্লে জনা-পাঁচেক যাত্রী তাতে আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকে পা-মুড়ে বসে আছে। অতিকষ্টে ঠেলেঠুলে জিপটাকে আমরা সাইড করে দিলাম। বাস পাস করলে গোপাল সাকির মিঞাকে সঙ্গে নিয়ে বাসে উঠে চলে গেল। বলল, 'সকাল আটটা-ন-টার মধ্যেই ফিরে আসছি পেট্রোল এবং খাবারদাবার নিয়ে। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।'

বাস চলে গেল। শীতের রাতে জেগে থাকলে ভোরের দিকে ভীষণ ঘুম পায়। শীতও তখন প্রচণ্ড জ্বালায়। গোপালের অভয়বাণী শুনে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে, টুপিটা ঘাড় অবধি দিয়ে। ওভারকোটের কলারের উপর

নামিয়ে। একসময় প্রথম সকালের মুরগি-ময়ূর ডেকে উঠল কঁকর-ক্ক, কেঁয়া-ক্কেঁয়া করে। শিকার-টিকারের ইচ্ছা বা উপায় তখন ছিল না। ভূতো জিপ থেকে নেমে দু-বার আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে হাত-পা ছুড়ে নাজিমসাহেবকে বলল, 'গুড মর্নিং নাজিমসাহেব। ব্রেকফাস্টমে কেয়া খাইয়েগা? ফরমাইয়ে!'

নাজিমসাহেব ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভুচু, ভুচু... ভুচু-উ-উ'...

মানে, ভুচু সাবধান।

বেশ রোদ উঠে গেছে। চারধারের জঙ্গল জেগে উঠেছে। রাতে খালি রাতচরা পাখিদের ডাক আর শম্বর চিতলের শব্দ ছিল। এখন কত পাখি, প্রজাপতি, পোকামাকড়। শীতের রোদ-পড়া চকচকে সকালের জঙ্গল গমগম করছে প্রাণের শব্দে চারপাশে। হঠাৎ একটি দেহাতি ছেলেকে আসতে দেখা গেল পাহাড়তলি থেকে। লোহার নাল-লাগানো নাগরা জুতো পায়ে চটাং ফটাং শব্দ করতে করতে পাথর-ভরা পথে সে আসছিল। তার কাঁধে একটা মস্ত লাঠি। লাঠির ডগায় একটা কাপড়ের পুঁটলি।

আমি বললাম, 'পুঁটলিতে খাবার-টাবার থাকতেও পারে। কী নাজিমসাহেব? বাজিয়ে দেখুন না একটু। অবস্থা যে কাহিল!'

নাজিমসাহেব ডাকলেন, 'আরে ও বাব্বুয়া! ইন্নে আ বাবা; ইন্নে আ...'

বাবুয়া কাছে এসে হাঁ করে দাঁড়াল।

'তেরা গাঁঠরিমে ক্যা বা?'

ছেলেটি হাসল।

ভূতো বলল, 'ছাতু-ফাতু হবে। এখন আবার বাছবিচার। একে মায়ে রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা! ম্যানেজ করুন না পুঁটলিটা কোনোক্রমে। কোই কাম কা নেহি আপ।'

নাজিমসাহেব পটিয়ে-পাটিয়ে ওকে দিয়ে পুঁটলিটা নামিয়ে খুব যত্ন করে নাকের কাছে এনে শুঁকলেন। কী বুঝলেন, উনিই জানেন।

ভূতো বলল, 'গন্ধগোকুল! ছাতু-ফাতু হলে আমি খাব না। আমার কাতুকুতু লাগে ছাতু খেলে। মানে, ছাতু মাখতে গেলেই!'

তারপর পুঁটলিটা খুললেন নাজিমসাহেব সযত্নে, নিজে হাতে পরম ধৈর্যর সঙ্গে।

চোখ গোল করে চেয়ে রইলাম ভূতো আর আমি। পুঁটলি খোলা হতেই দেখা গেল, দু-জোড়া নতুন নাল-বসানো প্রমাণ সাইজের নাগরা জুতো তাতে।

ভূতো বলল, 'ও লালাদা! গোল্ড রাশে চার্লি চ্যাপলিন জুতো খেয়েছিলেন, তাই না? তবে সে তো সুস্বাদু সেদ্ধ জুতো। এ জুতো খেলে সাক্ষাৎ বদহজম। খাওয়া উচিত হবে না। কী বলেন?'

নাজিমসাহেবের মুখটা কালো হয়ে গেছিল। ছেলেটি নীরবে হেসে আবার পুঁটলি উঠিয়ে চলে গেল।

ভূতো ছেলেটির দিকে চেয়ে বাংলায় বলল, 'খুব ঠকালি, না? আচ্ছা! এখন যা! তোকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে যখন ধর্মতলার মোড়ে দাঁড় করিয়ে দেব তখন বুঝবি, কত প্যাডিতে কত রাইস। তিন দিন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেও রাস্তা পেরোতে পারবি না ট্রাফিকের ভিড়ে। টিট-ফর-ট্যাট করে দেব!'

পেছন দিকে অনেক দূর থেকে মাদলের ধুতুর ধাতুর ধিতাং ধিতাক, ধুতুর ধাতুর আওয়াজ আসতে লাগল। আমাদের পেছনেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে ইলাজান নদী ঘুরে গেছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে নদী ছবির মতো। ভূতো বলল, 'চলুন, ওই দিকেই ঘুরে আসি। মাদল বাজছে যখন, তখন কোনো ব্যাপার আছে। লোকজন থাকলে খাবারও পাওয়া যেতে পারে। চলিয়ে, নাজিমসাব।'

নাজিমসাহেব বললেন, 'আমি বুড়হা-পুরানা আদমি। আমি কোথাওই যাব না। বন্দুকগুলোও পাহারা দিতে হবে।' বলেই আমাকে বললেন, 'আপ ভি মত যাইয়েগা। কোতোয়ালিমে ভর দেনেসে বাতচিত করনে কা লিয়ে ভি তো কই দোস্ত চাহিয়ে!'

তবু, নিজের বন্দুকটা হাতে নিয়ে আমি ভূতোর সঙ্গে ওকে একটু এগিয়ে দিতে গেলাম। নাজিমসাহেব ভাল্লুক সম্বন্ধে বারবার সাবধান করে দিলেন ওকে। বললেন, 'নোচ লেগা। বড়ি খতরনাগ হ্যায়। ইয়ে জঙ্গল তুমহারা মামাবাড়ি কা আম কা বাগিচা মত শোচনা।'

নদীতে পৌঁছে হাত-মুখ ধুয়ে জল খেলাম। দাঁত জমে গেল। এখনও ভীষণ ঠান্ডা। ফ্রিজ খুললে যেমন ধোঁয়া বেরোয় তেমন ধোঁয়া বেরোচ্ছে জল থেকে। ভূতো বলল, 'ওই দেখুন, নদীর ওপারে যেন কার বিয়ে হচ্ছে। শ্রাদ্ধ হলেই-বা কী এল গেল। গেলেই খেতে দেবে। চলুন চলুন। ধিতাং ধিতাং বোলে, মাদলে তাল তোলে-' বলেই গান জুড়ে দিল ভূতো বেসুরে, কোমর দুলিয়ে।

আমি বললাম, 'নেমন্তন্ন ছাড়াই যাবে? মানসম্মান নেই?'

'আর মানসম্মান! পড়েছি আপনাদের খপ্পরে। আপনি বাঁচলে চাচার নাম।'

বলেই, ছপাং ছপাং করে হাওয়াইন চপ্পল পরে জিনস ভিজিয়ে নদীর মধ্যে দিয়ে ওপারের দিকে যেতে লাগল ভূতো। ওয়াটার বটলে ভরতি করে নাজিমসাহেবের জন্যে খাবার জল নিয়ে ফিরে এলাম আমি নদী থেকে। এখন এগারোটা বাজে। কাল দুপুরেই শেষ খেয়েছিলাম আমরা। ব্যস! বিকেলে হাজারিবাগে চা। রাতে দোভিতেও শুধু চা। গরমাগরম রোদ এসে পড়ছিল ঘাড়ে। আরাম লাগছিল খুব। জল খেয়ে আমি আর নাজিমসাহেব চওড়া চ্যাটালো পাথরের উপর শুয়ে পড়লাম।

অনেকক্ষণ পর ভূতোর ডাকে চোখ খুলল।

ভূতো বলল, 'নাপিতের বাড়ি বিয়ে ছিল। খুবই খাতির-যত্ন করল। দই আর লাড্ডু খেয়েছি। মাছ খেয়েছি; চালোয়া। মাড়ুয়ার রুটি দিয়ে।' বলেই, হেকুত শব্দ করে একটা ঢেকুর তুলল।

ঢেকুরের শব্দ যে এত মিষ্টি, আগে তা কখনো খেয়াল করিনি।

ঘড়িতে এখন দুটো বাজে। শীতের বনে বনে রোদ ঝকঝক করছে। এতক্ষণ কী করছে গোপালরা দোভিতে? ভারি রাগ হতে লাগল আমাদের। দুটো থেকে তিনটে, তিনটে থেকে চারটে। আবারও রাত ঘনিয়ে আসতে লাগল। সারাটা দিন পরের খোলা জিপ, পরের ডিম, পরের বন্দুক ছেড়ে যেতেও পারিনি কোথাও। আর নিশ্চিন্ত করে যারা গেল তারা কখন যে দয়া করে এসে পড়ে তাও তো অজানা। খিদের কথা ছেড়েই দিলাম, কখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক এসে ক্যাঁক করে ধরে সেই ভয়ে সবসময়ই টেনস হয়ে বসে আছি। একটুও রিল্যাক্স করতে পারলাম না এমন সুন্দর পরিবেশেও। শিকারের কথা ভাবছিই না...

ময়ূর-মুরগি ডাকতে লাগল। তারপর দেখতে দেখতে অন্ধকারও ডাকতে ডাকতে এসে হাজির হল। নাজিমসাহেব সূর্য ডোবার আগে ওরই মধ্যে একবার নামাজ পড়ে নিলেন। প্রার্থনাতে কী কী বললেন তা আর বুঝতে বাকি রইল না। আমাদের দু-জনের অবস্থাই বেশ কাহিল। ভূতো কেবল এখনও লাফিয়ে বেড়াচ্ছে একা।

নাজিমসাহেব কালকের আগুনের জায়গাতেই বাসি বিয়ের আসনের মতো যত্ন করে আগুন জ্বালালেন নতুন করে। কে জানে, এই আগুনই চিতার আগুন হবে কি না! আগুনের কাঁপা কাঁপা লাল আলোয় আমরা তিন জনে তিন জনের মুখ দেখতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ বাসের ইঞ্জিনের আওয়াজ এবং ভ্যাঁ-পোঁ, ভ্যাঁ-পোঁ হর্ন শোনা গেল।

আমরা চমকে উঠলাম, অবিশ্বাসে।

নাজিমসাহেব বললেন, 'গোপালবাবু যদি এই বাসেও না আসেন?'

ভূতো বলল, 'যদি না আসেন? তাহলে কোর্ট মার্শাল করা হবে। ফায়ারিং-স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হবে।'

কিন্তু ওরা নামল শেষ পর্যন্ত ওই বাস থেকেই। গোপালের হাতে একটা মাটির হাঁড়ি, সাকির মিঞার হাতে শাল পাতার ঠোঙায় অনেকগুলো রুটি। বাসের কনডাক্টর তেলের জেরিক্যানটাকে একজন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে ধরাধরি করে নামিয়ে দিয়ে বাসের গায়ে দুটো জব্বর চাঁটি মেরে বলল, 'হাঁ উস্তাদ! টিকিয়া উড়ান।'

গোপাল বলল, 'নাও, শিগগিরি খেয়ে নাও দেখি! কী কাণ্ড! তোমাদের জন্যে ভোরে গিয়েই খাবার কিনেছিলাম। তখন কি জানি যে পেট্রোল নিয়ে কোনো ট্রাকই এদিকে আসতে চাইবে না। সাইকেল-রিকশাতে খুচুর খুচুর করে এত মাইল এসে

বসে আছি পাহাড়ের নীচে সারাদিন হা-পিত্যেশে! এই বাসও তো পেট্রোল বইতে চাইছিল না। নেহাতই যাবার সময় ওরা তোমাদের দেখে গেছে পথে বসে আছ, তাই দয়া করল। যাকগে, কথা পরে শুনবে, খেয়ে নাও আগে। খাও, খাও।'

কথা শোনার মতো সময় বা অবস্থা আমাদেরও একেবারেই ছিল না।

তাড়াতাড়ি রুটি ছিঁড়ে, ডিমের হাঁড়িতে হড়হড়িয়ে হাত ঢোকাতে যাব হঠাৎ পাশ থেকে শুনি আঁ-আঁ-আঁ-আঁক।

শুকনো রুটি আর ডিম আটকে গেছে নাজিমসাহেবের গলার মধ্যে। দুপুর বেলায় দাঁড়কাকের মতো হাঁ করে রয়েছেন তিনি।

গোপাল ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'দেখেছ, কী খারাপ ধাবাওয়ালাটা! নতুন মাটির হাঁড়িতে করে ডিমের কারি দিয়ে দিয়েছে। তাও সেই সক্কালবেলায়। ঝোল সব তো খেয়ে নিয়েছে হাঁড়িই। ইসস-স-স-স-ইসস-স...'

আমার খাওয়া মাথায় উঠল। চেঁচিয়ে বললাম, 'অ্যাই ভূতো! নাজিমসাহেবকে জল দাও। শিগগিরি জল। মারা যাবেন যে। ওয়াটার বটল।'

'জল কোথায়? জল নেই।' ননশালান্টলি ভূতো বলল, 'একটু আগেই তো আমি জঙ্গলে গেছিলাম। অন্ধকারের মধ্যে নদীতে গিয়ে তো আর পশ্চাৎদেশে ভাল্লুকের খামচানি...। মাড়ুয়ার রুটি-পেটের মধ্যে সাংঘাতিক গঞ্জাম। হান্টিং করতে নিয়ে এসেছে নাজিম বুড়ো হান্টারগঞ্জে। আর জায়গা পেলে না। মরুক গে যাক বুড়ো গলায় ডিম বিঁধে।'

গোপাল, নাজিমসাহেবের হাঁ-করা মুখের এবং জিপের হেডলাইটের মতো ড্যাবড্যাবে জ্বলজ্বলে চোখ-জোড়ার দিকে চেয়ে আতঙ্কিত গলায় বলল, 'ডিমই এ-যাত্রা ডোবাল আমাদের। কেলেঙ্কারি!'

ভূতো ওরই মধ্যে ফিচিক করে হেসে উঠে বলল, 'ইসস-স-স, ইক্কেরে ইনফিনিচুড ডিমেংকারি!'

লাওয়ালঙের বাঘ

ঋজুদার সঙ্গে সীমারিয়ার ডাকবাংলোয় আজ রাতের মতো এসে উঠেছি। আমরা যাচ্ছিলাম কাড়গুতে, চাতরার রাস্তায়; কিন্তু কলকাতা থেকে একটানা জিপ চালিয়ে এসে গরমে সবাই কাবু হয়ে পড়েছিল বলে রাতের মতো এখানেই থাকা হবে বলে ঠিক করল ঋজুদা।

সবাই বলতে, ঋজুদা, অমৃতলাল আর আমি।

এখন রাত আটটা হবে। শুক্লপক্ষ। বাইরে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। চৌকিদার হ্যারিকেন জ্বালাবার তোড়জোড় করছিল, ঋজুদার বলল, 'তুমি বাবা আমাদের একটু খিচুড়ি আর ডিমভাজা বানিয়ে দাও।' অমৃতলালও গিয়ে বাবুর্চিখানায় জুটেছে। আলুকা ভাত্তা বড়ো ভালো বানায় অমৃতলাল, ওর নানির কাছ থেকে শিখেছিল। আলুসিদ্ধ, তার মধ্যে ঘি, কুচিকুচি কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে এমন করে রগড়ে রগড়ে মাখত যে, তার নাম শুনলেই আমার জিভে জল আসত।

ঋজুদার ঝাঁকড়া সেগুন গাছের নীচের কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে নিজেই লাটাখাম্বাতে জল তুলে ঝপাং ঝপাং করে বালতি বালতি জল ঢেলে চান করছিল। চাঁদের আলোর বন্যা-বয়ে-যাওয়া বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিলাম আমি একা। ঋজুদার বলেছিল, 'তোর আর রাতে চান করে দরকার নেই। কোলকাত্তিয়া বাবু, শেষে সর্দি-ফর্দি লাগিয়ে ঝামেলা বাধাবি।'

সামনে লালমাটির পথটা চলে গেছে ডাইনে টুটিলাওয়া-বানদাগ হয়ে হাজারিবাগ শহরে। বাঁয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে গেলেই বাঘড়া মোড়। সেখান থেকে বাঁ-দিকে গেলে পালামৌর চাঁদোয়া-টোড়ি। ডান দিকে গেলে চাতরা। এই সীমারিয়া থেকেই

একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে চাতরাতে। আরও একটা পথ টুটিলাওয়া আর সীমারিয়ার মাঝামাঝি মূল পথ থেকে বেরিয়ে গেছে লাওয়ালং।

বাইরে নানারকম রাতচরা পাখি ডাকছে। সকলের নাম জানি না আমি। ঋজুদার জানে। আমি শুধু টী-টী পাখির ডাক চিনি। আসবার সময় সন্ধ্যে হওয়ার আগে জঙ্গলের মধ্যে যে জায়গাটায় জিপ খারাপ হয়ে গিয়েছিল ঠিক সেখানে একদল চাতক পাখি ফটিক-জল, ফটিক-জল করে ঘুরে ঘুরে একটা পাতাঝরা, ফুলেভরা শিমুল গাছের উপরে উড়ছিল। ওই শিমুল গাছের সঙ্গে ওদের আত্মীয়তাটা কীসের তা বুঝতে পারিনি। আত্মীয়তা নিশ্চয়ই কিছু ছিল।

এরকম হঠাৎ-থামা, হঠাৎ-থাকা জায়গাগুলোর ভারি একটা আকর্ষণ আছে আমার কাছে। এরা যেন পাওয়ার হিসেবের মধ্যে ছিল না, এরা যেন ঝড়ের আমের মতো পড়ে-পাওয়া। অথচ কত টুকরো টুকরো ভালোলাগা। এই সমস্ত হঠাৎ পাওয়া-ঝিনুকের মধ্যে নিটোল সুন্দর মুক্তোর মতো।

একটা হাওয়া ছেড়েছে বনের মধ্যে। শুকনো শাল পাতা উড়িয়ে নিয়ে, গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে নালায়-টিলায়; ঝোপে-ঝাড়ে। দূরের পাহাড়ে দাবানল লেগেছে। আলোর মালা জ্বলছে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে দেখা যায় পাহাড়ে পাহাড়ে মালাবদল হচ্ছে। এমনি করে কি পাহাড়দের বিয়ে হয়? কে জানে?

হাওয়ায় হাওয়ায়, ঝরে যাওয়া পাতায়, না-ঝরা পাতায় কত কী ফিসফিসানি উঠছে। চাঁদের আলোয় আর হাওয়ায় কাঁপা ছায়ায় কত কী নাচ নাচছে এই রাত-সাদা-কালোয়, ছায়া-আলোয়। কত কী গান উঠছে। গাছেদের তো প্রাণ আছে, ওদের গানও আছে, কিন্তু ওদের ভাষা তো আমরা জানি না-কোনো স্কুলে তো ওদের ভাষা শেখায় না। কেন যে শেখায় না! ভারি খারাপ লাগে ভাবলে।

ঋজুদার স্নান করছে তো করছেই। কতক্ষণ ধরে যে চান করে ঋজুদাটা। যখন ঋজুদার স্নান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে-বাবুর্চিখানা থেকে অমৃতলালের গুরমুখি গানের নীচু গুনগুনানি ভেসে আসছে খিচুড়ি রান্নার শব্দ ও গন্ধের সঙ্গে, এমন সময় মশাল হাতে একদল লোককে আসতে দেখা গেল টুটিলাওয়ার দিক থেকে। লোকগুলো হাজারিবাগি-টাঁড়োয়া-গাড়োয়া ভাষায় উঁচু গলায় কীসব বলতে বলতে আসছিল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে, উৎকর্ণ হয়ে ওই দিকে চেয়ে রইলাম।

লোকগুলো যখন বাংলোর সামনাসামনি এল, তখন ঋজুদার বারান্দায় এসে ওদের হিন্দিতে শুধোল, 'কী হয়েছে ভাই?'

ওরা সমস্বরে বলল, 'বড়কা বাঘোয়া।'

ব্যাপারটা শোনা গেল।

বড়ো একটা বাঘ, গোরু-চরাতে-যাওয়া একটা পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেকে ঠিক সন্ধ্যের আগে আগে একটা নালার মধ্যে ধরে নিয়ে গেছে।

গোরুগুলো ভয়ে দৌড়ে গ্রামে ফিরতেই ওরা ব্যাপার বুঝতে পেরে ছেলেটার খোঁজে যায়। গাঁয়ের শিকারি তার গাদাবন্দুক নিয়ে জনাকুড়ি লোক সঙ্গে নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে রক্তের দাগ দেখে দেখে নালার কাছে যেতেই বাঘটা বিরাট গর্জন করে তেড়ে আসে নালার ভিতর থেকে। তাকে ওই শিকারি গুলি করে। গুলি নাকি লাগেও বাঘের গায়ে-কিন্তু বাঘটা ওই শিকারির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথাটা একেবারে তিলের নাড়ুর মতো চিবিয়ে, সকলের সামনে তাকে মেরে ফেলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার নালার অন্ধকারে ফিরে যায়।

ওরা বলল, ছেলেটাকে তো এতক্ষণে মেরে ফেলেছেই, খেয়েও ফেলেছে হয়তো। ওরা কী করবে ভেবে না পেয়ে এখানে ফরেস্টারবাবুকে খবর দিতে এসেছে।

ঋজুদার চুপ করে ওদের কথা শুনছিল। জনা-কয় লোক বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, অন্যরা ফরেস্টারবাবুর বাংলোর দিকে চলে গেল।

আমার আর তর সইল না। আমি ঋজুদাকে দেখিয়ে ওদের বলে ফেললাম, 'কোই ডর নেহি-ই বাবু বহত জবরদস্ত শিকারি হ্যায়।'

একথা বলতে-না-বলতেই ওদের মধ্যে কিছু লোক ফরেস্ট অফিসে দৌড়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ফরেস্টারবাবুকে সঙ্গে করে ফিরে এল সকলে। ওঁরা সকলে মিলে ঋজুদাকে বারবার অনুরোধ করলেন। ছেলেটা গ্রামের মাহাতোর ভাতিজা। মৃতদেহের কিছু অংশ না পেলে দাহ করা যাবে না এবং তাহলে ছেলেটার আত্মা চিরদিন নাকি জঙ্গলে-পাহাড়ে, টাঁড়ে টাঁড়ে ঘুরে বেড়াবে, ভূত হয়ে যাবে।

আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। ঋজুদার সঙ্গে এ-পর্যন্ত ওড়িশার জঙ্গলে অনেক ঘুরলেও কখনো এমন সদ্য মানুষ-মারা বাঘের সঙ্গে মোলাকাতের অভিজ্ঞতা হয়নি।

গোলমালটা হল ঋজুদাকে নিয়েই। ঋজুদার বলল, 'রুদ্র, তুমি যাবে না। তুমি আর অমৃতলাল দু-জনেই থাকবে এখানে।'

অমৃতলাল বলল, 'নেহি বাবু, ই ঠিক নেই হ্যায়। এক্কেলা যানা নেই চাহিয়ে। দুসরা বন্দুক রহনা জরুরি হ্যায়।'

তখন ঋজুদার অধৈর্যগলায় অমৃতলালকে বলল, 'কিন্তু রুদ্র যে বড়ো ছেলেমানুষ-ওর কিছু হলে ওর বাবা-মাকে কী বলব আমি?'

আমি সকলের সামনেই ঋজুদার পা জড়িয়ে ধরে বললাম, 'ঋজুদা আমাকে নিয়ে চলো, প্লিজ। তুমি তো সঙ্গেই থাকবে। তোমার যা হবে আমারও তাই হবে।'

ঋজুদার কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। বলল, 'তুই ভারি অবাধ্য হয়েছিস।' তারপরই বলল, 'আচ্ছা চল।'

জিপে যে ক-জন লোক ধরে, তাদের নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, লাওয়ালঙের রাস্তায়। অমৃতলাল জিপ চালাচ্ছিল তখন। ঋজুদার ফোর-ফিফটি-ফোর হানড্রেড দোনলা রাইফেলটা নিয়েছিল। আমার হাতে দোনলা বারো বোরের বন্দুক। দুটো অ্যালফাম্যাকস এল.জি. আর দুটো লেথাল বল নিয়েছি সঙ্গে।

গরমের দিন। জঙ্গল একেবারে পাতলা হয়ে গেছে পাতা ঝরে। বর্ষার শেষে বড়ো বড়ো গাছের নীচে নীচে যেসব আগাছা, ঝোপঝাড়, লতাপাতা গজিয়ে ওঠে এবং শীতে যেগুলো ঘন হয়ে থাকে-যাদের ঋজুদার বলে 'আন্ডার গ্রোথ'-সেসব এখন একেবারেই নেই। জিপের আলোর দু-পাশে প্রায় একশো আশি ডিগ্রি চোখ চলে এখন।

একটা খরগোশ রাস্তা পেরোল ডান দিক থেকে বাঁ-দিকে। পর পর দুটো লুমরির জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ দেখা গেল। একটু পরেই আমরা পথ ছেড়ে একটা ছোটো পায়ে-চলা পথে ঢুকে গ্রামটাতে এসে পৌঁছোলাম। জিপের আওয়াজ শুনেই লোকজন ঘরের বাইরে এল। জিপটা ওখানেই রেখে দেওয়া হল। তারপর গ্রামের যে মাহাতো, তাকে ঋজুদার বলল পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের।

যে শিকারিকে বাঘ মেরে ফেলেছে, তাকে খাটিয়ার উপর একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। মাটির দেওয়াল আর খাপরার চালের বাড়িগুলো থেকে মেয়ে ও বাচ্চাদের কান্না শোনা যাচ্ছিল। ঋজুদার সেই মৃতদেহের কাছে গিয়ে চাদর সরিয়ে লণ্ঠন দিয়ে কী যেন দেখল ভালো করে। তারপর ফিরে এসে বলল, 'চল রুদ্র।'

গ্রামের লোকেদের যথাসম্ভব কম কথা বলতে ও আওয়াজ করতে অনুরোধ করে ঋজুদার আর আমি মাহাতোর সঙ্গে এগোলাম। উত্তেজনায় আমার গা দিয়ে তখনই দরদর করে ঘাম বেরোচ্ছিল, হাতের তেলা ঘেমে যাচ্ছিল। বারবার খাকি বুশ শার্টের গায়ে ঘাম মুছে নিচ্ছিলাম।

জঙ্গলে বেশিরভাগই শাল। মাঝে মাঝে আসন, কেঁদ, গমহার এসবও আছে। আমলকী গাছ আছে অনেক। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এক-এক ফালি চাষের জমি। হয়তো শীতে কিতারি, অড়হর, কুলথি বা গেঁহু লাগিয়েছিল। এখন কোনো চিহ্ন নেই তার। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে আছে।

আলো না জ্বালিয়ে, আমরা নিঃশব্দে শুকনো পাতা না মাড়িয়ে, পাথর এড়িয়ে হাঁটছি। বন্দুকে গুলি ভরে নিয়েছি। ঋজুদার কথামতো দু-নলেই এল.জি. পুরে নিয়েছি। খুব কাছাকাছি গুলি করতে হলে নাকি এল.জি.ই ভালো। ঋজুদাও

রাইফেলের দু-ব্যারেলে সফট নোজড বুলেট পুরে নিয়েছে। ঋজুদার রাইফেলের সঙ্গে একটা ক্ল্যামপে ছোটো একটা টর্চ লাগানো আছে-ক্ল্যামপের সঙ্গে আটকানো একটা লোহার পাতে নিশানা নেবার সময় বাঁ-হাতের আঙুল ছোঁয়ালেই টর্চটা জ্বলে ওঠে। আমার বন্দুকে আলো নেই। এমন জ্যোৎস্নারাতে বন্দুক ছুড়তে আলো লাগে না। বন্দুক ছোড়া রাইফেল ছোড়ার চেয়ে অনেক সহজ।

কিছুদূর গিয়েই আমরা একটা উপত্যকায় এসে পৌঁছোলাম। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে শান্ত উদোম উপত্যকা। দূরে পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা করে রাতের বনে শিহর তুলে পাখিটা ডাকছে। কী চমৎকার সুন্দর পরিবেশ। ভাবাই যায় না যে, এই আলোর মধ্যের ছায়ার আড়ালে মৃত্যু লুকিয়ে আছে...অমন মর্মান্তিক মৃত্যু। দু-দু-জন লোক আজ সন্ধ্যে থেকে এখানে মারা গেছে, বলতে গেলে খুন হয়েছে, অথচ পাখিটা কী সুন্দর ডাকছে; হাওয়ায় মহুয়া আর করৌঞ্জ ফুলের গন্ধ ভাসছে কী দারুণ।

মাহাতো আঙুল দিয়ে দূরে যে জায়গাটা থেকে বাঘ নালা ছেড়ে উঠে এসে শিকারিকে আক্রমণ করেছিল, সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিল। ঋজুদার ফিসফিস করে বলল, 'সামনে যে পিপুল গাছটা আছে, তাতে তুমি চড়ে বসে থাকো। আমরা ডান দিকে গিয়ে বাঘের যে জায়গায় থাকার সম্ভাবনা, সে জায়গা থেকে কম করে তিন-শো গজ দূরে নালায় নামব।'

তারপর আর কিছু না বলে ঋজুদার এগিয়ে চলল। পরক্ষণেই, দাঁড়িয়ে পড়ে, মাহাতোকে বলল, 'দিনের আলো ফোটার আগেও যদি আমরা না ফিরি, তাহলে অমৃতলালকে ও গাঁয়ের লোকদের নিয়ে আমাদের খুঁজতে এসো।'

কথাটা শুনে মাহাতো খুব খুশি হল না, চাঁদের আলোয় তার মুখ দেখেই তা বোঝা গেল।

এরপর ঋজুদার আর আমি সেই চন্দ্রালোকিত উপত্যকায় নিঃশব্দে দু-টি ছায়ার মতো, দূরের শুয়ে-থাকা ঘন কালো ছায়ার মতো নালাটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

ঋজুদার শুধু একবার ফিসফিস করে বলল, 'ভয় পেয়ে পিছন থেকে আমাকে গুলি করিস না যেন। নালায় নেমে আমার পাশে পাশে হাঁটবি-পিছনে নয়। একটুও শব্দ না করে। প্রত্যেকটি পা ফেলার আগে কোথায় পা ফেলছিস, তা দেখে ফেলবি-এক পা এগোবার আগে সামনে ও চারপাশে ভালো করে দেখবি। কান খাড়া রাখবি। নালার মধ্যে চোখের চেয়ে কানের উপরই বেশি নির্ভর করতে হবে। নালার মধ্যে হয়তো অন্ধকার থাকবে। তোর বন্দুকে আলো থাকলে ভালো হত।'

যাই হোক, তখন আর কিছু করার নেই। আশা করতে লাগলাম, পাতাঝরা গাছগুলোর ফাঁকফোঁক দিয়ে নালার মধ্যে কিছুটা আলো হয়তো চুঁইয়ে আসবে। গুলি খাক আর না-ই খাক, বাঘ যে নালার মধ্যেই থাকবে, এমন কোনো কথা নেই। যদি নালার মধ্যে থাকে, তাহলে নালার কোন জায়গায় থাকবে তারও স্থিরতা নেই। তা ঋজুদার ভালো করে জানে বলেই এত সাবধান হয়ে নালার প্রায় শেষ প্রান্তের দিকে আমরা এগোচ্ছি।

দেখতে দেখতে নালার মুখে চলে এলাম। শুকনো বালি, চাঁদের আলোয় ধবধব করছে। আমাকে হুঁশিয়ার থাকতে বলে ঋজুদার হাঁটু গেড়ে বসে নালার বালি পরীক্ষা করে দেখল। নালা থেকে যে বাঘ বেরিয়ে গেছে তেমন কোনো পায়ের চিহ্ন দেখা গেল না। খুব বড়ো একটা বাঘের পায়ের দাগ ছাড়াও শুয়োর, শজারু, কোটরা হরিণ ইত্যাদির অনেক পায়ের দাগ দেখা গেল। বাঘ ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু এদিক দিয়ে বেরোয়নি।

নালায় পৌঁছোনোর আগে অবধি একটা টী-টী পাখি আমাদের মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে টিটির টি-টি-ট্টী-টি-টি করে ডাকতে ডাকতে সারা বনে আমাদের আগমনবার্তা জানিয়ে দিল। আমার মন বলছিল, বাঘ একেবারে খবর পেয়ে তৈরি হয়েই থাকবে।

এবারে আমরা নালার মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

দু-পাশে খাড়া পাড়। কোথাও-বা খোয়াই, পিটিসের ঝোপ, আমলকীর পত্রশূন্য ডালে থোকা থোকা আমলকী ধরে আছে। নালার মধ্যে মধ্যে একটা জলের ধারা বয়ে এসেছে ওপাশ থেকে। কোথাও সে জলে পায়ের পাতা ভেজে-কোথাও-বা তাও নয়-শুধু বালি ভিজে রয়েছে।

কোনো সাড়াশব্দ নেই-শুধু একরকম কটকটে ঝিঁঝির একটানা ঝাঁঝাঁ আওয়াজ ছাড়া।

একটা বাঁক নিলাম। ঋজুদার এক-এক গজ পথ যেতে পাঁচ মিনিট করে সময় নিচ্ছে।

যতই এগোতে লাগলাম, ততই জলের ধারাটা গভীর হতে লাগল। কোথাও কোথাও হাঁটু সমান জল পাথরের গভীরে জমে আছে। তার মধ্যে ব্যাঙাচি, কালো কালো লম্বা গোঁফওয়ালা জলজ পোকা। আমাদের পায়ের শব্দের অনুরণনে একটা ছোটো ব্যাং জলছড়া দিয়ে দৌড়ে গেল জলের মধ্যে।

যতই এগোচ্ছি, ততই নিস্তব্ধতা বাড়ছে। এত জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখলাম নালায় ঢোকার সময় বালিতে কিন্তু কারও সঙ্গেই দেখা হল না এ পর্যন্ত। কোন মন্ত্রবলে তারা যেন সব উধাও হয়ে গেছে।

ঋজুদার কান-চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে আছে-। ঋজুদার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে বাঘ নালার মধ্যেই আছে। বন্দুকটা শুটিং-পজিশনে ধরে, সেফটি-ক্যাচে বুড়ো আঙুল ছুঁইয়েই আছি আমি-যাতে প্রয়োজনে এক মুহূর্তের মধ্যে গুলি করতে পারি।

বোধ হয় এক ঘণ্টা হয়ে গেছে আমরা নালাটার মধ্যে ঢুকেছি। এতক্ষণে বেশ অনেকখানি ভিতরে ঢুকে থাকব। নালার মধ্যেটাকে আলো-ছায়ার কাটাকুটি করা একটা ডোরাকাটা শতরঞ্জ বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ বুকের মধ্যে চমকে দিয়ে কাছ থেকে হুপ হুপ হুপ হুপ করে একসঙ্গে অনেকগুলো হনুমান ডেকে উঠল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে পঁচিশ গজ দূরের একটা বড়ো গাছের উপরের ডালে ডালে হনুমানদের নড়েচড়ে বসার আওয়াজ, ডালপালার আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদার আমার গায়ে হাত ছুঁইয়ে আমাকে নালার বাঁ-দিকের পাড়ের দিকে সরে আসতে ইশারা করল। আমি সরে আসতেই, আমার সামনে ছায়ার মধ্যে একটা বড়ো পাথরের উপর বসে, দু-হাঁটুর উপরে রাইফেলটা রেখে সামনের দিকে চেয়ে রইল ঋজুদার তীক্ষ্ণ চোখে। নালাটা সামনে একটা বাঁক নিয়েছে।

হনুমানদের হুপহাপ আওয়াজ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনে থেকে জল পড়ার আওয়াজ স্পষ্ট হল; ঝরনার মতো। পাথরের উপর বোধ হয় হাতখানেক উঁচু থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে, তারই শব্দ। শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু ঝরনাটা দেখা যাচ্ছিল না। ওটা বোধ হয় বাঁকটার ওপাশেই। এদিকে জলের স্রোতও বেশ জোর-প্রায় ছয় আঙুল মতো জল একটা হাত-পাঁচেক চওড়া ধারায় বয়ে চলেছে।

এখানে ঋজুদার একেবারে স্থাণুর মতো বসে রইল সামনের দিকে চেয়ে। কী জানি, ওই হনুমানদের হুপহাপ শব্দের মধ্যে ঋজুদার কী শুনেছিল-কোন ভাষা। কিন্তু

তার হাবভাব দেখে আমার মনে হল, বাঘটা ওই নালার বাঁকেই যেকোনো মুহূর্তে দেখা দিতে পারে।

ওইভাবে কতক্ষণ কেটে গেল মনে নেই। আমার মনে হল, কয়েক ঘণ্টা, কিন্তু আসলে হয়তো পাঁচ মিনিটও নয়।

এখানে কেন বসে আছে, একথা আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছি, এমন সময়, জলের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। এক মুহূর্ত কান খাড়া করে শুনেই, ভেজাবালিতে হামাগুড়ি দিয়ে নালার বাঁকের দিকে এগোতে লাগল ঋজুদা। শব্দটা আমিও শুনেছিলাম। কুকুরে জল খেলে যেমন চাক চাক চাক শব্দ হয় তেমনই শব্দ, কিন্তু অনেক জোর শব্দ।

শব্দটা তখনও হচ্ছিল। বাঘটা নিশ্চয়ই ঝরনায় জল খাচ্ছিল।

বাঁকটা তখনও হাত-দশেক দূরে। ঋজুদার জোরে এগিয়ে চলেছে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে, রাইফেলটাকে হাতের উপর নিয়ে। আমার বুকের মধ্যে তখন একটা রেলগাড়ি চলতে শুরু করেছে-এত ধক ধক করছে বুকটা, ঘামে সমস্ত শরীর, মাথার চুল সব ভিজে গেছে। আমার তখন খালি মনে হচ্ছিল, ঋজুদার দেখতে পাওয়ার আগে তার জল খাওয়া শেষ করে চলে যাবে না তো বাঘটা?

হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ, আমার বুকের স্পন্দন থেমে গেল।

আমার সামনে ঋজুদার বালিতে শুয়ে পড়েছে-প্রোন-পজিশানে দু-হাতে রাইফেলটা ধরে নিশানা নিচ্ছে।

ততক্ষণে আমি ঋজুদার পাশে পৌঁছে গেছি। পৌঁছেই যে দৃশ্য দেখলাম তা সারাজীবন চোখে আঁকা থাকবে।

ঝরনাটার উপরে ডান দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বাঘটা জল খাচ্ছে। চাঁদের আলোয় তার মাথা, বুক সব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পেছনের দিকটা অন্ধকার। তার প্রকাণ্ড মাথাটা জলের উপর একটা বিরাট পাথর বলে মনে হচ্ছে। আমিও যেই শুয়ে পড়ে বন্দুকটা কাঁধে তুলতে যাব, ঠিক অমনি সময়ে বুকপকেটে রাখা বুলেটটার সঙ্গে বন্দুকের কুঁদোর ঠোকা লাগতেই খুট করে একটু শব্দ হল। তাতেই বাঘ এক ঝটকায় মাথা তুলে এদিকে তাকাল। বাঘটা কানে-তালা-লাগানো গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাকে গুটিয়ে যেন একটা বলের মতো করে ফেলল, এবং মুহূর্তের মধ্যে সোজা আমাদের দিকে লাফাল। লাফাল না বলে উড়ে এল, বলা ভালো। আমার কানের পাশে ঋজুদার ফোর-ফিফটি-ফোরহানড্রেড রাইফেলের আওয়াজে মনে হল বাজ পড়ল। বাঘের গর্জন, হনুমানদের চ্যাঁচামেচি, দাপাদাপি, জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য নানা পাখির চ্যাঁচামেচিতে এবং রাইফেলের গুমগুমানিতে যেন আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দেখলাম, আলো-ছায়ায় মেশা একটা অন্ধকারের স্তূপ উড়ে আসছে আমাদের দিকে

শূন্য থেকে, তার সামনে প্রসারিত করা-নখ সমেত প্রকাণ্ড থাবা দুটো। বোধ হয় ঘোরের মধ্যেই আমি একই সঙ্গে দুটো ট্রিগার টেনে দিয়েছিলাম বন্দুকের। কিন্তু গুলি লাগল কি না লাগল কিছু বোঝা গেল না-বাঘটা জলের মধ্যে ঝপাং করে পড়ল, প্রায় আমার নাকের সামনে। আমার মনে হল, থাবাটা একবার তুলে বাঘটা আমার মাথায় এক থাপ্পড় মারল বুঝি। আমি তখনও শুয়েই ছিলাম, দু-হাতে বন্দুকটাকে সামনে ধরে।

যেন ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে, যেন অনেক দূর থেকে ঋজুদার আমাকে ডাকল, 'রুদ্র, এই রুদ্র।'

তাকিয়ে দেখলাম, আমার পাশে ঋজুদার বাঘটার ঘাড়ের দিকে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি উঠে দাঁড়াবার সঙ্গেসঙ্গেই বাঘটাও যেন একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, সারা শরীর নড়ে উঠল, জল ছপ ছপ করে উঠল, ডন দেবার মতো উঠে দাঁড়াতে গেল বাঘটা। ঋজুদার রাইফেলটা কোমরে ধরা অবস্থাতেই বাঁ-ব্যারেল থেকে আবার গুলি করল। বাঘটার মাথাটা ঝপাং করে জলে পড়ল।

একটাও কথা না বলে ঋজুদার ঝরনার কাছ দিয়ে নালা পেরিয়ে বাইরের উপত্যকায় উঠে এল। এসে ফাঁকা জায়গা দেখে একটা বড়ো পাথরের উপরে বসে পকেট থেকে পাইপটা বের করে পাইপটা ধরাল। বলল, 'গাঁয়ের শিকারির নিশানা ফসকেছিল। তার গুলি সত্যিই বাঘের পায়ে লেগে থাকলে ব্যাপারটা এত সহজে শেষ হত না।' দূরে দেখা গেল-ঝাঁকড়া পিপুল গাছের দিক থেকে একটা লোক আমাদের দিকে জ্যোৎস্নায় ভেসে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছে। মাহাতো।

হঠাৎ ঋজুদার যেন কেমন উদাস হয়ে গেল।

পিউ-কাঁহা পাখিটা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার ডাকতে লাগল দূর থেকে। বাঘ মরে গেছে, এ খবরে আনন্দ কি দুঃখ প্রকাশ করল জানি না, কিন্তু চতুর্দিকের বন-পাহাড়ে আবার নানারকম পশুপাখির ডাক শোনা যেতে লাগল।

আমি শুধোলাম, 'ঋজুদা, ছেলেটা?'

ঋজুদার পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কিছু করার নেই। ওর বাবা-দাদারা আসবে-যাদের আপনজন, তারাই নিয়ে যাবে! কীই-বা করার আছে আমাদের?'

আমি শুধোলাম, 'কোথায় আছে?'

ঋজুদার বলল-এমনভাবে বলল, যেন নিজে দেখেছে। 'ওই ঝরনার ওপাশে, বেশ কিছুটা ওপাশে, নালার মধ্যেই পড়ে আছে।'

আমিও পাথরটার উপরে বসে পড়ে খুশি গলায় বললাম 'যাক, বাঘটাকে মেরেছ ভালোই হয়েছে। বদমাইশ বাঘ।'

ঋজুদার শুকনো হাসি হাসল।

বলল, 'আহা কী দারুণ বাঘটা! বেচারা!'

তারপরই বলল, 'উপায় ছিল না বলেই হয়তো ও ছেলেটাকে মেরেছিল। জন্তুজানোয়ারদের ভালোবাসিস, বুঝলি, রুদ্র। মানুষকে মানুষ তো ভালোবাসেই। কিন্তু ওদের ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে জানে, খুবই কম মানুষ।'

করণপুরার টাঁড়

হাজারিবাগ শহর থেকে বেরিয়ে বড়োবাজারের দিক থেকে এসে গোরস্থানের পাশ দিয়ে গিয়ে লালমাটির উঁচু-নীচু করোগেটেড একটা পথ মেঘের মতো গোন্দা বাঁধকে ডান দিকে রেখে চলে গেছিল টুটিলাওয়া হয়ে সীমারিয়ার দিকে। সেই পথেই হাজারিবাগ থেকে মাইল তিনেক গেলেই একটি লালমাটির পায়ে-চলা পথ ঝাঁটিজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়ে শীর্ণ বোকারো নদী পেরিয়ে পৌঁছে গেছিল কুসুমভা বস্তিতে। বনাদাগ থেকে দু-আড়াই মাইল পথ হবে।

পথের দু-পাশে বেশিই শালের এলোমেলো চারাগাছ আর ঝাঁটিজঙ্গল, যাতে অগণ্য কালি তিতির বর্ষার দুপুরে কোমরসমান উঁচু ঝোপে বসে ডাকত। তিতির এমনিতে জমিতে চরে বেড়াতেই ভালোবাসে, কিন্তু কালি তিতিরদের স্বভাব দেখে মনে হত তারা

ব্যতিক্রম।

এই কুসুমভা গ্রামের কথাই আছে বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ মশায়ের লেখাতে। তাঁর যৌবনে তিনি এই পথেই চাতরার রুটের বাসে কনডাক্টর ছিলেন কিছু সময়ে। তখন যে-পথ দিয়ে বাস চাতরা যেত, তাকে-আমি যে-সময়ের কথা বলছি, প্রায় ৫০ বছর আগের কথা-বলত ওল্ড চাতরা রোড। ওই সমস্ত এলাকাই গভীর জঙ্গলময় ছিল, কিন্তু ওল্ড চাতরা রোড তখন কেউই ব্যবহার করতেন না বলে তার দু-পাশের জঙ্গল ছিল ভয়ানক। সেই চাতরা রোডেই সুবোধবাবু বাসের সামনে একটি বাঘের বাচ্চা দেখতে পেয়ে তাকে তুলে আনেন, পোষেন এবং তার নাম দেন 'বিলি'। এই বিলি পরে বড়ো হয়ে বিপজ্জনক হয়ে ওঠাতে প্রতিবেশীদের অনুরোধে উনি তাকে ওই কুসুমভা গ্রামে এনে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেন, মস্ত একটি অশ্বত্থ

গাছের তলায়। সেই অশ্বত্থ গাছ আমিও দেখেছি ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮০ দশকের শেষ অবধি। তার নীচে একটি বনদেবতার থান ছিল। গাঁয়ের মানুষেরা পুজো দিত। আর তার আগে গ্রামের ভিতরেই ছিল মস্ত একটি তেঁতুল গাছ। যার তলাতেই কাড়ুয়ার সঙ্গে আমার প্রথমবার আলাপ হয়।

কাড়ুয়া ছিল কাকতাড়ুয়ার মতো দেখতে। সাড়ে-পাঁচ ফিট মতো লম্বা, মাথায় কদমছাঁট চুল। কিন্তু পেছনে চার ইঞ্চি একটি টিকি-যা সে দৌড়ে গেলে বা এলে, লাফাতে থাকত। কাড়ুয়ার মুখ ছিল শ্রীহীন। কিন্তু তার ধবধবে দাঁত থার্টি-টু অল-আউট করে সে যখন হাসত, তখন সে-যে ভারি সরল এবং ভালো একজন মানুষ, তা বুঝতে কারোই অসুবিধে হত না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বন, পাহাড়ে, নদীতে, হ্রদে, নানা মানুষের সংস্পর্শে এসেছি গত ৬০ বছরে, কিন্তু কাড়ুয়ার মতো জঙ্গলের মানুষ খুব কমই দেখেছি।

তার পরনে থাকত হাঁটু অবধি খেটো মোটা ধুতি। গা প্রায় খালিই থাকত গরমের সময়ে। বর্ষাতেও। শীতে আমাদেরই কারও দেওয়া পুরোনো জামা বা গেঞ্জি। তার কাঁধে থাকত তার মুঙ্গেরি একনলা নড়বড়ে গাদা বন্দুকটা। তাতে 'হুম্মচকে' বারুদ ঠেসে, তার মুখে সিসের গুলি দিয়ে পেছনে পারকাসান-ক্যাপ লাগিয়ে বন্দুকের ঘোড়া তুলে ঘোড়া দাবত। জন্তুজানোয়ারের 'রাহান-সাহান', হাল-হকিকত তার নখদর্পণে ছিল। মাটির দেওয়াল, খাপরার চালের মাটির মেঝের ঘরে থাকত সে, গ্রামের পথের একপাশের একসার ঘরের, একটি ঘরে। তার স্ত্রী ছিল, ছেলে-মেয়েও ছিল, কিন্তু সে সংসারী আদৌ ছিল না। তার সংসার যে কী করে চলত, তাই ছিল এক রহস্য আমাদের কাছে। তার জমিজমা বলতেও প্রায় কিছুই ছিল না। আমরা যারা ওকে ভালোবাসতাম, তারাও আর সারাবছর তাকে দেখতে পারতাম না। যখন যখন যেতাম তখন তখন যতটুকু পারি করতাম।

কাড়ুয়ার দারিদ্র্য, তার জাগতিক সব অসুবিধের কোনোকিছুই তাকে ছুঁতে পারত না। সে ছিল অরণ্যপুত্র। কুসুমভার সেই বনদেওতার থান পেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই অরণ্যের শ্যামলিমা মনকে স্নিগ্ধ, প্রসন্ন এবং উদাস করে দিত। সেই জঙ্গলে আমরা যে কত কিছুই শিকার করেছি এক সময়ে! রাতে পায়ে হেঁটে ঘুরে এবং দিনে ছোটো ছোটো হাঁকোয়া করে। নানা জাতের হরিণ, শুয়োর, শম্বর, নেকড়ে ও চিতা ছাড়াও তিতির, বটের, বনমুরগির ঘাঁটি ছিল সেই অরণ্য। সেই অরণ্যের শেষে এক দিগন্তবিস্তৃত টাঁড় ছিল। আকাশের সঙ্গে গিয়ে মিশেছিল সে টাঁড়। কাড়ুয়া সেদিকে দেখিয়ে বলত, 'তারও পরে আছে করণপুরার টাঁড়। সে এক স্বর্গরাজ্য।' আমরা কখনো সেখানে যাওয়ার সময় করতে পারিনি। এমনকী কাড়ুয়া নিজেও নয়।

করণপুরার টাঁড় আমাদের কাছে এক স্বপ্নই রয়ে গেছে। করণপুরার টাঁড়ের দিকে তাকিয়ে কাড়ুয়া উদাস হয়ে যেত।

কাড়ুয়ার এক জিগরি দোস্ত ছিল, তার নাম ছিল টাবড়। টাবড়কে একটা মস্ত বড়ো দাঁতাল শুয়োর পেট ফাঁসিয়ে মেরে ফেলেছিল। এক গ্রীষ্মের দিনে সন্ধ্যে নামার আগে আগে কাড়ুয়া যখন বনাদাগ থেকে কুসুমভার দিকে আসছিল, তখন বোকারো নদীটা পায়ে হেঁটে পেরোবার সময়ে সে নাকি এক আশ্চর্য এবং দুঃসাহসী কাড়ুয়ার কাছেও ভয়াবহ এক দৃশ্য দেখেছিল। বোকারো নদীটা সেখানে শীর্ণ এবং তার নাম বোকারো হলেও, বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে যে নদী, এ নদী সে নদী নয়। আমাদের দেশে একই নামের অগণ্য পাহাড় ও নদী আছে বিভিন্ন অঞ্চলে। এই বোকারো দুই উঁচু ও খাড়া পাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছিল। তার দু-দিকেই খোয়াই। ভরা বর্ষা ছাড়া অন্য সময় এ নদী প্রায় শুকনোই থাকত।

আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। তবে সবে উঠেছে। সন্ধ্যে বেলায় তার আলো তেমন জোর হয়নি। কাড়ুয়া-নদীতে নামার সময়েই লক্ষ করল যে, তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হওয়া উলঙ্গ টাবড় একটি শুয়োরের মৃতদেহের উপরে বসে আছে। তার মাথাতে লম্বা লম্বা এলোঝেলো চুল। তার হাতের নোখগুলো বিরাট লম্বা লম্বা আর তার দু-টি চোখ জ্বলছে ভাঁটার মতো। আর তার মাথার উপরে অনেকগুলো প্যাঁচা ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে কিঁচি-কিঁচির করে ডাকছে।

মুহূর্তের জন্যে ভয় পেলেও, কাড়ুয়া টাবড়ের নাম ধরে যেই ডেকে উঠল, অমনি তার চোখের সামনে থেকে সেই দৃশ্য উধাও হয়ে গেল। আর, একটা হায়না খুব জোরে ডাকতে ডাকতে নদীর বুক ধরে দূরে দৌড়ে গেল।

তার বন্ধুর মৃত্যুর বদলা নেওয়ার জন্যে কাড়ুয়া তার মৃত্যুর পর থেকেই হন্যে হয়ে সেই শুয়োরটাকে খুঁজে বেড়াত, কিন্তু তখনও দেখা পায়নি।

বোকারো নদীর বুকে সেই সন্ধ্যার ভৌতিক ঘটনা কাড়ুয়াকে আরও জেদি করে তুলল, বন্ধুর মৃত্যুর বদলা নেওয়ার জন্যে। টাবড়ও নিশ্চয়ই চায় যে, কাড়ুয়া প্রতিশোধ নিক, নইলে শুয়োরের উপরে সে বসে থাকবে কেন? তার মাংস খাবে কেন?

ভাবত কাড়ুয়া। কেবলই ভাবত।

এক বর্ষার রাতে কাড়ুয়া তার মাটির ঘরে শুয়েছিল। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ঠান্ডা, ভেজা হাওয়া বইছে বাইরে বৃষ্টির কণা উড়িয়ে। তার গাদা বন্দুকটি মাটির ঘরের দেওয়ালে একটি গজালের গায়ে ঝুলছিল। হঠাৎই কাড়ুয়ার মনে হল-

কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কান খাড়া করে শুনল কাড়ুয়া। ফিসফিসানিটা আসছিল তার বন্দুকের কাছ থেকে। বন্দুক বলছে, 'এ কাড়ু। কাড়ু হো!'

অবাক হয়ে কাড়ুয়া বন্দুকের দিকে চোখ তুলে তাকাল অন্ধকার ঘরে। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছিল। বন্দুক আবার বলল, 'এ কাড়ু, শটি খেতোয়ামে বড়কা শুয়ার আওলথু। নয়া তালাওকি পাস।'

গাঁয়ের শেষপ্রান্তে একটি নতুন পুকুর খোঁড়া হয়েছিল গত গ্রীষ্মে। তখনও জলে ভরেনি। নতুন বর্ষায় জল জমে তাতে কোমরসমান জল হয়েছে, লালমাটি-ধোওয়া ঘোলা জল। তারই পাশে গাঁয়ের লোকেরা অনেকখানি জায়গা নিয়ে শটি বুনেছে।

কাড়ুয়া আর সময় নষ্ট না করে তার বন্দুকটা নামিয়ে নিয়ে, তাতে চার আঙুল বারুদ গাদল। তারপর একটা মস্তবড়ো সিসের গোল গুলিও গাদল। তারপর একটা পারকাসান-ক্যাপ লাগিয়ে, বন্দুকটা ঘাড়ে নিয়ে, শাল কাঠের দরজার হুড়কো খুলে বেরিয়ে পড়ল নয়াতালাও-এর দিকে।

খুব সন্তর্পণে গুটিগুটি পায়ে সেখানে পৌঁছে দেখল যে তার বন্দুক যা বলেছিল, তাই ঠিক। সেই মস্ত বড়ো শুয়োরটা খেত তছনছ করে শটি খাচ্ছে। মেঘ-ছেঁড়া চাঁদের আলোতে তার বিরাট সাদা দাঁত দু-টি একবার চিকচিক করে উঠল। শুয়োরটা মনোযোগ দিয়ে মুখ নীচু করে শটি খাচ্ছে। অন্য কোনোদিকেই তার নজর ছিল না। কাড়ুয়া বন্দুক বাগিয়ে এক-এক পা করে এগিয়ে গিয়ে, শুয়োরের 'কানপাট্টিয়ামে' নিশানা নিয়ে হুম্মচকে দেগে দিল তার বন্দুক। চিতপটাং হয়ে মাটিতে পড়ে চরকির মতো ঘুরপাক খেতে লাগল শুয়োরটা, ওঠবার বৃথা চেষ্টাতে। আবার তার গাদা বন্দুক ভরতে অনেক সময় লাগত। তবে কানে গুলি লাগাতে শুয়োরের আর ক্ষমতা ছিল না উঠে দাঁড়াবার। যতক্ষণ না শুয়োর নিথর হয়ে যায়, ততক্ষণ কাড়ুয়া সেখানে দাঁড়িয়ে তার বন্ধুর খুনির শেষযাত্রা দেখল খুশি হয়ে। টাবড়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পেরে বড়ো খুশি হল কাড়ুয়া।

একবার আমি আর আমার হাজারিবাগের বন্ধু গোপাল সেন, মহম্মদ নাজিম আর কাড়ুয়ার সঙ্গে হাজারিবাগ থেকে বাসে চাতরা হয়ে এক প্রচণ্ড শীতের শুক্লপক্ষের রাতে গয়া জেলার জৌরিতে এসে নামলাম। শীতার্ত রাতে ছোটো ঘুমন্ত জায়গা জৌরিতে এক গরিব মৌলবির বাড়িতে বাজরার রুটি আর মুরগির ঝোল কবজি ডুবিয়ে খেয়ে, খালি মাদ্রাসাতে খড়ের উপরে শুয়ে রাত কাটিয়ে, ভোর হবার আগেই গোরুর গাড়িতে করে ফল্গু নদীর দুই শাখানদী জাঁম আর ইলাজান পেরিয়ে, সিজুয়াহরা পাহাড়ের উপরে রঘু শাহ-র ভাণ্ডারে গিয়ে পৌঁছোলাম। যেখানে ডেঁটে নাস্তা করে, সারাদিন ছুলোয়া শিকার করলাম, কিন্তু একটিও পশুপাখি শিকার হল

না। সারাদিন পাহাড়ে উপত্যকায় বন্দুক ঘাড়ে করে, প্রায় মাইল দশেক হেঁটে ভাণ্ডারে ফিরে, রাতের খাবার খেয়ে, আবার জৌরির উদ্দেশে রওনা হলাম। ভোরে পৌঁছে বাস ধরব হাজারিবাগের।

আমরা তিন জন গোরুর গাড়ির উপরে আর কাড়ুয়া আমাদের পেছন পেছন তার বন্দুক কাঁধে ওই প্রচণ্ড ঠান্ডাতে খালি গায়ে গান গাইতে গাইতে আসতে লাগল। ইলাজান আর জাঁম নদীর কাছে পৌঁছোবার পরে, রেফ্রিজারেটরের দরজা খুললে যেমন ঠান্ডা ধোঁয়া বেরোয়, তেমন ধোঁওয়া বেরোতে লাগল। সেই দুই নদীও কাড়ুয়া খালি পায়েই পেরোল। ও জুতোতে অভ্যস্ত ছিল না। দু-দু-বার দেওয়া সত্ত্বেও সে পরেনি। খালি পায়েই কাঁকর, কাঁটা উপেক্ষা করে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত সে। গয়া জেলার চাঁদনি রাতের ৫০ বছর আগের সেই সফর যেন মনে হয় গতকালেরই কথা। কাড়ুয়ার সেই গানটি এখনও মনে আছে। ক-দিন আগে জি-টিভি-র 'খোলা মনে' অনুষ্ঠানেও ওই গানের কয়েক কলি গেয়েছি; 'তু কেহরো কচমচ ছাতি... তেরা সুরত দেখি মোরা বসল নজারিয়া হো বসল নজারিয়া...'

ভোররাতে জৌরিতে পৌঁছে কাড়ুয়া বলল, 'কব যাইয়েগা আপলোগ? করণপুরাকি টাঁড়মে?'

আজকে জঙ্গলের সাথ-সঙ্গী কাড়ুয়া নেই। নাজিমসাহেব নেই। আমার বন্ধু গোপালও নেই। কিন্তু চোখ বুঁজলেই যেন দেখতে পাই কাড়ুয়া আমার পাশে দাঁড়িয়ে করণপুরার টাঁড়ের দিকে আঙুল তুলে বলছে, 'ইকদফে টাইম লেকর আইয়ে, চলেগা হামলোগ সব মিলকর করণপুরাকি টাঁড়মে।'

আমার টাইম আজকেও আছে। কিন্তু ওদের টাইম শেষ হয়ে গেছে। প্রত্যেকের জীবনেই এমন কিছু স্বপ্ন থাকে, যা পূরিত হয় না। কিন্তু সেই স্বপ্ন ঠিকই বেঁচে থাকে, যতদিন জীবন থাকে। যদিও জানি, আর হবে না করণপুরার টাঁড়ে যাওয়া। আজ করণপুরার টাঁড়ে হয়তো ঘিঞ্জি জনপদ হয়ে গেছে।

সারা পৃথিবী বড়ো দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কিন্তু কাড়ুয়ার করণপুরার টাঁড়ের স্বপ্নকে তো কেউই কেড়ে নিতে পারবে না। শুধু কাড়ুয়ার একারই-বা কেন? সে-স্বপ্ন তো আমারও ছিল। কাড়ুয়াই দেখিয়েছিল।

সাধের গাডোয়াল

১

সাধের গাডোয়াল!

তবে শুরু থেকেই বলি।

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর আগের কথা। কলকাতার আশেপাশে তখন অনেক জলাজমি, বাদা, আবাদ ও জঙ্গল ছিল। কলকাতা তখন এমন বহুধাবিস্তৃত মানুষ-কিলবিল-করা হতকুৎসিত জায়গা মোটেই ছিল না।

সাইকেলে চড়ে বেহালা, টালিগঞ্জ বা গ্যালিফ স্ট্রিট ট্রাম ডিপো থেকে একটু গেলেই বাঁশঝাড়, ডোবা, পুকুর, পাখি দেখতে পাওয়া যেত। অনেক সুন্দর ছিল তখন কলকাতা। এত মানুষও ছিল না, এমন অশান্তিও ছিল না।

ডা. বিধান রায় যখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন সোনারপুরের বিরাট জলা অঞ্চলকে শুকিয়ে ফেলা হয়। তার আগে ওই আদিগন্ত জলাতে পাখি-শিকারের বড়ো সুবিধে ছিল। কতরকম হাঁস যে উড়ে আসত ওখানে শীতকালে দেশ-বিদেশ থেকে তা বলার নয়। গাডোয়াল, পিন-টেইল, পোচার্ড, অনেক রকমের টিল, নাকটা, রাজহাঁস, আরও কত কী জলের পাখি।

স্কুলে পড়ি। শীতকালে প্রতি রবিবারে সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সেরে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম বন্দুক আর গুলির থলে, জলের বোতল, সামান্য কিছু কমলালেবু, কাজুবাদাম ইত্যাদি নিয়ে। এখন ক্যানিংয়ের রাস্তায় যেখানে মালঞ্চ ফাঁড়ি আছে পুলিশের, তার উলটো দিকে একটা কাঁচা পথ ছিল একেবারে জলার মুখ

অবধি। এক চেনা ভদ্রলোকের বাড়ির পাশে বাবা গাড়িটা রাখতেন। সেই বাড়ির বাইরের ঘরে একজন ভদ্রলোক টেবিল-চেয়ারে বসে ফুলসক্যাপ কাগজে পাতার পর পাতা অঙ্ক কষতেন। প্রত্যেক রবিবারেই ওঁকে দেখতাম আর ভদ্রলোকের উপর ভক্তি বেড়ে যেত। পরে বাবার কাছে শুনেছিলাম যে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পরীক্ষায় বসতে হলে নাকি ওইরকম রিম রিম পাতায়, মাথা-ঝিমঝিম অঙ্ক কষতে হয় সামনে টাইমপিস রেখে। ঘড়ির কাঁটার উপরে এক চোখ সেঁটে।

যাই হোক, বাবার এক বন্ধু, মনোরঞ্জনকাকু শনিবার বিকেলে ফোন করে বাবাকে বললেন, 'দাদা, খবর পেলাম যে গাডোয়াল পড়েছে। আপনার সোনারপুরে। সাধের গাডোয়াল। আমি কোনোদিনও সোনারপুরে যাইনি। আমাকে নিয়ে চলুন, শিকার করে আসি।'

বাবা বললেন, 'সকালে ফেনাভাত খেয়েই বেরিয়ে পড়া যাবে। তুমিও চলে এসো আমাদের এখানেই। একসঙ্গে বেরোব।'

আমার মাসতুতো ভাই গজেন বেড়াতে এসেছিল শনিবারে পাইকপাড়া থেকে। গাডোয়াল শিকারের কথা শুনে ও বলল, 'আমিও যাব।' আমি বাবাকে ওর হয়ে ভয়ে ভয়ে রিকোয়েস্ট করলাম। বাবা রাজি হয়ে গেলেন।

সেই রবিবার সকাল থেকে মায়ের প্রচুর টেনশন। সকাল সকাল ফেনাভাত ডিমসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ, ডালসেদ্ধ সবকিছু বন্দোবস্ত করা। তার উপর বর্মনকাকুও খেয়ে যাবেন।

সকালে আমরা যখন খাওয়ার টেবিলে ফেনাভাত খাচ্ছি, মা বললেন বর্মনকাকুকে, 'কী যে আপনারা নিরপরাধ পাখিগুলোকে মারেন।'

বর্মনকাকু রাইট-ইনে ফুটবল খেলতেন। চট করে রাইট-আউটে বাবাকে বলটা পাস করে দিয়ে বললেন, 'দাদার যত হুজুগ। আমিও বউদি এসব পছন্দ করি না।'

বাবার মুখে ডিমসেদ্ধ থাকায় বাবা প্রতিবাদও করতে পারলেন না।

গজেন বলল, 'তুমি এসব বুঝবে না মাসি। শিকার, সে পাখি-শিকারই হোক আর বাঘ-শিকারই হোক, কী যে উত্তেজনা তোমাকে কী বলব।'

মা বললেন, 'তুই চুপ কর তো! তুই বন্দুক ছুড়েছিস কখনো। দাঁড়া, তোর মাকে ফোন করছি।'

গজেন পাইকপাড়ার ছেলে। সহজে দমবার পাত্র নয়।

সে বলল, 'আমি কখনো ছুড়িনি কিন্তু আজই প্রথম ছুড়ব।'

মা বললেন, 'কখনো ছুড়িসনি তো যাওয়ার দরকার কী। জলে পড়ে-টড়ে গেলে কী হবে?'

গজেন বলল, 'হেদোতে সাঁতার কাটি না আমি? ঠিক পাড়ে আসব। তা ছাড়া আমি তো চামচা-শিকারি তো ওই বসে।' বলেই, আমাকে দেখাল।

গজেনটা একেবারে বখে গেছে। মা-বাবা, বর্মনকাকুর সামনেই এমন করে কথা বলছে! কোনো মান্যিগন্যিই নেই।

বাবা একবার মায়ের দিকে তাকালেন; মা বাবার দিকে। আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম-পাছে গজেনের বখামির অপরাধে আমার শাস্তি হয়।

এমন সময় ফোনটা বাজল।

মা ফোন ধরে কথা বলতে লাগলেন মাসির সঙ্গে। তারপর 'আচ্ছা' বলে রেখে দিলেন। ফোন ছাড়ার আগে বললেন, 'না, না, তোমার কোনো ভয় নেই দিদি। তোমার ভগ্নীপতি সঙ্গে থাকবেন। আবারও বললেন, 'না, না নৌকোয় তো যাবেই না।'

তারপর ফোন রেখেই বাবাকে বললেন, 'দিদি বিশেষ করে মানা করেছেন গজেনকে যেন নৌকোয় না নেওয়া হয়।'

বাবা বললেন, 'তাহলে গজেন গিয়ে কী করবে?'

গজেন বলল, 'মেসোমশায়, নৌকোয় যেতে যদি মা মানা করে থাকেন তাহলে ডাঙা থেকেই শিকার দেখব। ডাঙায় বসে ফড়িং দেখব, পাখি-ওড়া দেখব-তোমার বাইনোকুলারটা আমাকে দিয়ে যাবে।'

বাবা বললেন, 'তা মন্দ বলিসনি।' তারপর মাকে বললেন, 'শুনছ, ও সারাদিন ডাঙায় থাকবে, ওর জন্যে বেশি করে খাবার-টাবার দিয়ে দাও।'

মা বললেন, 'বুঝেছি। দোষ হল আমার বোনপোর, আর খাবে সকলে। অনেক খাবারই দিয়েছি। ডালমুট, সন্দেশ, স্যান্ডউইচ, পাটিসাপটা আর কাজুবাদাম। কমলালেবুও আছে। ফ্লাস্কে তোমাদের জন্যে চা আর ওদের জন্যে দুধ।'

বাবা বললেন, 'ও মা! কাল যে ফ্লুরি থেকে অত কেক আনলাম।'

মা বললেন, 'তাও দিয়েছি যথেষ্ট পরিমাণে।'

বর্মনকাকু ঠাকুরকে ডেকে গাড়োয়ালের রোস্টটা কেমন করে করবে তার ডিরেকশান দিচ্ছিলেন। বাবা ক-টা গাড়োয়াল পাওয়া যাবে শিকারে তার এস্টিমেট আগেই করে ফেলেছিলেন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁদের গাড়োয়ালের রোস্ট খেতে নেমন্তন্ন করবেন তাঁদেরও ফোনে বলে দিচ্ছিলেন। প্রত্যেককে বলছিলেন, 'আসিস কিন্তু নিশ্চয়ই।'

মা বললেন, 'অতজনকে খেতে বলবে যখন, তখন ঠাকুর কেন, আমি নিজেই করব এখন রোস্ট। তোমরা ক-টা নাগাদ ফিরবে বলো?'

বর্মনকাকু বললেন, 'দেরি কীসের। মেরেছি আর ফিরেছি।'

বাবা বললেন, 'না না। এখানে ফিরতে ফিরতে ধরো সন্ধ্যে সাতটা হয়ে যাবে।'

মা বললেন, 'অত অল্প সময়ের মধ্যে কাটাকুটি, ছাল-ছাড়ানো, তোমার বন্ধুদের কাল বলো না?'

বর্মনকাকু বললেন, 'কিছু ভয় পাবেন না বউদি। মশলা-টশলা রেডি রাখুন আমি নিজে তৈরি করে দেব-কাটাকুটির জন্যে ভাববেন না একটুও। খাওয়াদাওয়া কি সোমবারে ভালো জমে? আজই ভালো। আমার দাদার তো জানেনই, উঠল বাই তো কটক যাই।'

২

আমরা যখন সোনারপুরে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন যথারীতি সি.এ. পরীক্ষার ছাত্র ভদ্রলোক মুখ গুঁজে অঙ্ক কষছিলেন। হঠাৎ আমার খেয়াল হল ওঁকে অনেক বছর ধরে ওইরকম দেখছি। প্রতি শীতে।

বর্মনকাকুকে জিজ্ঞেস করতে বাবা বললেন, 'এ পরীক্ষা দিয়ে যাওয়াটাই ছাত্রদের কর্তব্য।' পাশ করা, ফেল করা নাকি তাদের নিজেদের ইচ্ছাধীন বা

হাতের নয়।

গাড়ি পার্ক করিয়ে রাইফেল বন্দুক কাঁধে হেঁটে এলাম আমরা জলের ধার অবধি। গজেন উত্তেজিত। আমার কাঁধে ঝোলানো পয়েন্ট টু-টু রাইফেলটার বাঁটে কেবলই হাত ছোঁয়ায় আর বলে, 'আমাকে ছুড়তে দিবি বলেছিস, দিবি তো? না দিলে কিন্তু পাইকপাড়ায় ঢুকতে পারবি না।'

আমি যতই ইশারা করে ওকে চুপ করে থাকতে বলি ততই ও গ্রাহ্য করে না।

জলের ধারে এসে দেখা গেল মাত্র একটা তালের ডোঙা জলের কিনারায় বাঁধা আছে। তালের ডোঙা কাকে বলে তোমরা অনেকে হয়তো জান না। তাল গাছের শরীর কুরে নিয়ে তার আধখানা খোল দিয়ে ক্যানোর মতো নৌকো। এই নৌকোগুলো ছোটো ছোটো হয় এবং এতে চড়তে আর সার্কাসে ছাতা হাতে তারের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে প্রায় একই রকম ব্যালান্স লাগে। একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ।

বাবা ও বর্মনকাকু দু-জনে মিলে এক কুইন্টাল নব্বই কেজি। আমার ওজন চল্লিশ কেজি। গজেন যাবে না। কিন্তু নৌকো যে বাইবে তারও ওজন আছে। সবসুদ্ধু চার জন।

তালের ডোঙাতে মাত্র একজন শিকারি ওঠেন, আর যে চালায়, সে। কিন্তু একটার বেশি ডোঙা নেই। যে চালাবে সেও নেই।

এমন সময় বর্মনকাকু দূরবিন থেকে চোখ নামিয়ে বললেন, 'দাদা দেখুন! গাডোয়াল!'

দূরে আমি দেখলাম এক ঝাঁক হাঁস পুব থেকে পশ্চিমে উড়ে যাচ্ছে জলার উপর দিয়ে। যেকোনো পাখির মেলে দেওয়া ডানা ও উড্ডীন ঝাঁকের ফরমেশান এবং ওড়ার ছন্দ থেকে সহজেই বোঝা যায় কী পাখি, বহু দূর থেকেই।

বাবা খুশি হয়ে বললেন, গাডোয়ালের ঝাঁকটা দূরবিনে দেখার পর, 'বর্মন, এই প্রথম তুমি আমাকে লেট-ডাউন করনি!'

বর্মনকাকু হাসছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'আমার বড়ো ভয় করছে।'

'কেন? কীসের ভয়?' বাবা শুধোলেন।

'না। যা হাই-ভোল্টেজ রেজিস্টেন্স।'

'কী ব্যাপার?' বাবা অবাক হয়ে শুধোলেন আবার।

বর্মনকাকু বললেন, 'বউদি, বাড়িতে।'

বলেই, দু-জনে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

এমন সময় ঘাটের কাছেই একটা পানকৌড়ি উড়ে এসে বসল একটা বাঁশের খোঁটার উপর। গজেন তখন একটা কাটা তাল গাছের গুঁড়িতে বসেছিল পায়ের উপর পা তুলে বিজ্ঞর মতো। যেন জ্যাঠামশাই।

পানকৌড়িটাকে বসতে দেখেই ও আমার দিকে তাকাল। তাকানোটা বাবার চোখে পড়ল। বাবা বললেন, 'কী রে, গুলি ছুড়বি?'

গজেন নালিশের গলায় বলল, 'দেখ না মেসো, কখন থেকে বলছি।'

বাবা বললেন, 'মার দেখি পানকৌড়িটাকে।'

আমি বললাম, 'শব্দে জলার ভিতরের হাঁস উড়বে না?'

বর্মনকাকু বললেন, 'আজ রবিবার কত শিকারি নেমে গেছে। দুমদাম শব্দ হচ্ছেই। তা ছাড়া এত দূরের শব্দে কিছুই হবে না।'

আমি পয়েন্ট টু-টু রাইফেলটা গজেনকে এগিয়ে দিচ্ছিলাম।

বাবা বললেন, 'না, না, বন্দুকই ছুড়তে দে ওকে। টুয়েলভ বোর।'

আমি বললাম, 'ধাক্কা?'

গজেন বলল, 'ইয়ার্কি মারিসনি। তুই ছুড়তে পারিস আর আমি পারি না? আমি হেদোয় ব্যায়ামও করি।'

বাঁ-ব্যারেলে একটা চার নম্বর ছররা পুরে বাবার বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলের গ্রিনার বন্দুকটা গজেনের হাতে তুলে দিলাম।

ওকে ডিরকেশান দেবার আগেই ওই পায়ের উপর পা-তুলে বসে থাকা অবস্থাতেই আসীন থেকে, আমরা কেউ কিছু বোঝার আগেই গজেনবাবু বন্দুকটা

তুলেই দুম করে মেরে দিল।

একটুর জন্যে আমার কান মিস করে ঝরঝর করে ছররাগুলো গিয়ে দূরে জলে পড়ল। পানকৌড়িটা ভীষণ ভয় পেয়ে খোঁটা হড়কে জলে ডিগবাজি খেয়ে পড়তে পড়তে মনে মনে গজেন ঘোষের শ্রাদ্ধ করতে করতে উড়ে চলে গেল। শব্দে ভয় পেয়ে একদল জলপিপি আর ডুবডুবা জল-ছড়া দিয়ে এদিকে-ওদিকে চলে গেল। দূরের হুইসলিং টিলের ঝাঁক শিস দিতে দিতে গুলির শব্দে কিছুক্ষণ ওড়াউড়ি করে আবার স্থির হয়ে বসল।

এসব ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। এবং পরমুহূর্তেই গজেন প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল, 'মরে গেলাম, রুদ্র একেবারে মরে গেলাম...ওঁ বাঁবাঁ গো-মাঁ রেঁ...'

আমি পানকৌড়ি ছেড়ে ওর দিকে তাকিয়ে দেখি বন্দুকটার নল মাটিতে, হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে যাবে এক্ষুনি।

বাবা ও বর্মনকাকুও দৌড়ে গেলেন ওর দিকে। বললেন, 'কী হল, হল কী?'

গজেন বলল, 'ন্যাজ খসে গেছে, ন্যাজ খসে গেছে...।'

বর্মনকাকু হতভম্ব হয়ে বললেন, 'বলিস কী? তোর ন্যাজ?'

গজেন মুখবিকৃতি করে বলল, 'আমার পায়ের শিরায় টান লেগেছে; পাখির ন্যাজ খসেছে।'

ততক্ষণে আমি কাছে গেছি ওর। ও পায়ের উপর পা দিয়ে বসেছিল। বন্দুকের ট্রিগার তো আর পা দিয়ে টানেনি, কিন্তু টান পড়েছে পায়ের শিরায়।

বন্দুকটা ওর হাত থেকে নিতেই ও এক পায়ে লাফাতে লাফাতে বলতে লাগল, 'ন্যাজ খসে গেছে, টান লেগে গেছে। টান লেগে গেছে; ন্যাজ খসে গেছে।'

তখন ওকে সামলাবেন না শিকারযাত্রা করবেন বাবা এবং বর্মনকাকু তাই নিয়েই সমস্যা দেখা গেল।

ইতিমধ্যে দূর থেকে পনেরো কেজি ওজনের ছিপছিপে চকচকে বাঁশের মতো চেহারার পলান, হাতে লগি নিয়ে এসে হাজির।

বলল, 'চলুন বাবু, পাখিরা সব বিলি মেরে রইয়েছেন। আজ খাদ্যখাদক কিছু করা যেতে পারে। দেরি করলি ওদিকের শিকারিরা সব সাবড়ে দিবে।' বলেই, বর্মনকাকুর দিকে তাকাল পলান। মনে হল বর্মনকাকুর সিগার-মুখে চেহারাটা বিশেষ পছন্দ হল না পলানের।

পরক্ষণে পলান গজেনের দিকে চেয়ে বলল, 'খোকার হলটা কী?'

পাইকপাড়ার মস্তানকে খোকা বলায় গজেন বিস্তর চটল। বলল, 'শির টানটান।'

পলান থুক করে শ্লেষ্মা মেশানো একতাল থুতু ফেলে বলল, 'নিশীথকুয়ারি লতার সঙ্গে হেড়োভাঙ্গা নদীর জল মিশিয়ে একরত্তি গরান ফুলের মধু দে খল-নোড়ায়

মেড়ে খেয়ে লাও দিকিন খোকা-তোমার টানটান শির পলক ফেলার আগেই বে-টান হইয়ে যাবে।'

গজেনের তখন শরীরের দুঃখ গিয়ে শিকারের দুঃখ চেগে উঠেছে।

বলল, 'ন্যাজ খসে গেছে।'

পলান বলল, 'বলো কী গো খোকা? তুমি বাঁদর নাকি?'

গজেন কথা ঘুরিয়ে বলল, 'তোমরা যাও মেসোমশাই-আমি গাছতলায় শতরঞ্জি পেতে থাকব-দূরবিন নিয়ে।'

আমাকে গজগজ করে বলল নীচু গলায়, যাতে বাবা শুনতে না পান, 'এর চেয়ে টারজানের ছবি দেখতে গেলে অনেক ভালো হত।'

পলান নৌকোয় গিয়ে উঠেছে। ধুতিটাকে ভালো করে মালকোঁচা মেরে বেঁধেছে। চোখ কুঁচকে পলান বলল, 'যাবে কে?'

বাবা বললেন, 'সকলেই।'

গজেন বলল, 'আমি ছাড়া।'

পলান বলল, 'আম্মো নাই ই সাংঘাতিক কম্মে।'

বাবা বললেন, 'কী পলান, হবে না?'

পলান বলল, 'হবে না কোন কথা? একবার এই ডোঙাতে একটো ল্যাংড়া মোষকে নিয়ে গেছিনু না। মাঝ বাদায় ডোঙা উলটিলে? সাঁতার জানেন সবাই?'

বাবা ও বর্মনকাকু নিশ্চয় জানেন। আমাকে সাঁতার ক্লাবের মেম্বার করে দিয়েছিলেন বাবা। কিন্তু যে পরিমাণ জল তোলপাড় করে যে হাঁকুপাঁকু প্রক্রিয়ায় যতটুকু এগোতাম আমি তার নাম সাঁতার নয়। কিন্তু বাবা জানেন যে, আমি সকালে সাঁতার যাই। আসলে একা একা লেকের বেঞ্চে বসে প্রায়ই ফুচকা কি আলুর দম খাই। কিন্তু প্রাণ গেলেও এখন বলা যাবে না যে, সাঁতার জানি না।

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সকলেই জানে। ভালোই জানে।'

আমি দেখলাম পলানের চোখের কোনায় এক অনুকম্পার ঝিলিক চমকে উঠল।

বাবা বললেন, 'কী করবি রুদ্র? তুই থেকে যা গজেনের সঙ্গে।'

বর্মনকাকু বললেন, 'আহা ছেলেমানুষ। কাল বিকেল থেকে গাডোয়াল গাডোয়াল করে নাচছে-আসলে আমার ফোনটা তো ও-ই ধরেছিল।'

আসলে সেটা কোনো ব্যাপার নয়। মনে মনে আমি ভাবছিলাম। হাত দিয়ে বন্দুক ছুড়ে যে পায়ের শিরায় টান ধরায়, তার মতো অনপড় আদমির সঙ্গে এক শতরঞ্জিতে বসে থাকতে আমি আসিনি। তা ছাড়া আমি চেয়েছিলাম, গজেন জানুক, দেখুক, আমার হাতের নিশানা, শিকারে আমার অভিজ্ঞতা। ও সঙ্গে গেলে আরও ভালো হত।

তবু, আমি মুখে কিছু না বলে, মুখটা ব্যাজার করে রইলাম।

স্নেহপ্রবণ বাবা, আমার মুখের দিকে তাকালেন একবার দেখলাম।

তারপর বললেন, 'চল পলান। এগোই।'

আমরা একে একে তিন জনে সাবধানে সেই টলমলায়মান ডোঙায় উঠে বসলাম।

গজেন ততক্ষণে ফ্লুরির প্যাকেট খুলে মনোযোগ দিয়ে কেক খেতে লেগেছে। এমন সময় মাথার উপর দিয়ে একটা কাঁক উড়ে গেল, কাঁক কাঁওয়াক করে ডাকতে ডাকতে, লম্বা ঠ্যাং দুটো দোলাতে দোলাতে।

আমি আমার বিদ্যা জাহির করার জন্যে বললাম, 'দেখ গজেন কাঁক, কাঁক।'

আর অমনি পক পক আওয়াজ করে ডোঙাটা দুলে উঠেই ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল। আমি যেই গজেনের দিকে ফিরেছি হাত তুলে ওকে কাঁক দেখাতে গেছি, তাতেই এই বিপত্তি।

বাবা বললেন, 'খুব সাবধানে বসো। একদম নড়াচড়া নয়।'

গজেনকে নিঃশব্দে বাঁ-হাত তুলে টা টা করলাম। আমি সবচেয়ে পিছনে বসেছি। আমার সামনে বাবা, তাঁর সামনে বর্মনকাকু। আর একেবারে সামনে পলান, দাঁড়িয়ে ডোঙা বাইছে। আমরা প্রায় গায়ে গায়ে লেগেই বসেছি। বাবা ও বর্মনকাকুর হাতে ডাবল ব্যারেল বন্দুক। আমার হাতে পয়েন্ট টু-টু রাইফেল। চেকোস্লোভাকিয়ান। ব্যারেলের নীচে লম্বা ম্যাগাজিন-আরেকটা ব্যারেলের মতো। বাবার ফুরিয়ে-যাওয়া সিগারেটের টিনে রাইফেলের গুলি। ভালো চান্স পেলে বড়োরা সিটিং পজিশনে মারবেন ঝাঁক দেখে। তারপর হাঁস উড়লে, তখন অন্য ব্যারেলের গুলি দিয়ে তাঁরা ফ্লাইং মারবেন। তখন আমিও পটাপট রাইফেলের ম্যাগাজিন খালি করব উড়ো হাঁসের উদ্দেশে। উড়ন্ত হাঁসের সঙ্গে আমার রাইফেলের গুলির যোগাযোগ যদি ঘটে যায় তবে তা নেহাতই দুর্ঘটনা বলতে হবে।

আমি না পারলেও বাবা খুব ভালো ফ্লাইং মারতেন। বর্মনকাকুর কথা জানি না। কারণ এর আগে ওঁর সঙ্গে শিকারে যাইনি আমি কখনো।

জলের একটা আলাদা গন্ধ আছে। গন্ধ আছে এই বাদার। মাঝে মাঝে হোগলা, শর নানা ধরনের লতাপাতা জলের উপর। উড়ে যাওয়া পাখির খসে যাওয়া পালক ভাসছে। দূরে জলের উপর সাঁতরে যাচ্ছে সাপ, লম্বা একটা সরল চিকনরেখার মতো। জলের মসৃণ নিস্তরঙ্গ আয়নাকে তীক্ষ্ণ ছুরির মতো কেটে দু-ফালা করছে যেন। স্নাইপ স্নিপেট ল্যাজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে অথবা ছোট্ট ছোট্ট তিরের মতো উড়ে যাচ্ছে দল বেঁধে।

দ্রুত ধাবমান পাখির ঝাঁক যখন উড়তে উড়তে দিক অথবা উচ্চতা পরিবর্তন করে তখন মনে হয় একদল ছোটো ছোটো মেয়ে যেন যুগযুগান্ত ধরে রিহার্সাল দিয়ে

কোনো নাচ দেখিয়ে গেল। এমনি অনবধানের অবহেলার নাচ, চারদিকে গান। এমনকী ব্যাকড্রপ পর্যন্ত। কত যে ছবি, কত যে গান, যারই চোখ আছে সেই-ই দেখতে পায়। যারই কান আছে, সেও পায় শুনতে।

আমরা র্যাপট অ্যাটেনশানে বসে আছি। ডান দিকে বাঁ-দিকে হুইসলিং টিলস, কটন টিলস, কমন টিলসের ঝাঁক পেয়েছিলাম আমরা। শীতের ভরদুপুরের সূর্য মাথার উপরে। তবে চোখে লাগছে না; টুপি আছে। বাদার উপর দিয়ে উত্তুরে হাওয়া বইছে। শীত করছে ছায়ায় গেলেই।

কচুরিপানার মধ্যে মধ্যে লম্বা লম্বা পা নিয়ে দারুণ ময়ূরপঙ্খি নীল শরীর আর লাল ঠোঁটের কাম পাখিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কঁক কঁওক করে ডাকছে। কচুরিপানার গন্ধ, ওদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে এই জলজ আবহাওয়াকে এক ব্যক্তিত্ব দিয়েছে।

এক জোড়া রাজহাঁস সোঁ সোঁ করে হঠাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ে গেল বন্দুকের পাল্লার মধ্যে দিয়েই, কিন্তু আমাদের একেবারে চমকে দিয়ে। কেউই বন্দুক তোলেনি। আচমকা মুখ তুলে একসঙ্গে যে ওদের দিকে তাকিয়েছি তাতেই ডোঙাটা টলমল করে উঠেছে।

আজ আমাদের কোনো দিকে তাকাবার অবসর, ইচ্ছা বা সময় নেই। আমরা গাডোয়ালের ঝাঁকটার দিকে এগিয়ে চলেছি। সাধের গাডোয়াল। এবার হাঁসগুলোকে দেখা যাচ্ছে। পরিষ্কার। পশ্চিমে কিছুটা জঙ্গল আছে জলে।

বাবা বললেন, 'পলান, ওই জঙ্গলের আড়ালে ডোঙা নিয়ে ভেড়াও বাবা। বাঁ-দিকে গুলি করব-তাই নৌকোটা উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে দিবি-যাতে পশ্চিমে গুলি করতে পারি সহজে। যতখানি পারিস স্থির রাখিস-শেষবার দাঁড় বেয়ে তুই বসে পড়বি। ডোঙা যখন আস্তে এগোবে তখন গুলি করব আমরা, যাতে গুলি উপরে-নীচে না চলে যায়।'

পলানও খুব উত্তেজিত আজ। প্রথমত আড়াই কুইন্টাল ওজন নিয়ে নৌকো ভাসিয়ে রাখা সহজ কথা নয়, দ্বিতীয়ত, গাডোয়ালের নেশা।

বাবা বলেছিলেন, এক-একটা গাডোয়ালের জন্যে ওকে এক-এক টাকা বকশিশ দেবেন।

পলান একটা বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দিতে লাগল। আমি সূর্যের দিকে চেয়ে ভাবলাম যে, এতক্ষণে মা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে উঠে ঠাকুরকে দিয়ে মশলা-টশলা বাটিয়ে রাখছেন। আরও ভাবলাম, গজেনের চোখে-মুখে আমার প্রতি ভক্তি কীরকম উপছে পড়বে যখন গাডোয়াল ও অন্যান্য হাঁসগুলো নিয়ে ডোঙা থেকে নামব আমরা।

গাডোয়াল শিকারের পরে, বাবা বলেছেন, আর কোনোই রেস্ট্রিকশান নেই। ফেরার পথে অন্য সব পাখিই মারব আমরা।

পলান বিড়িটা শেষ করে, জলে ছুড়ে ফেলে, নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে ওই জঙ্গলের দিকে করল।

আমরা সকলে টেনস। আস্তে আস্তে এক লগি দু-লগি করে আমরা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছি। এক-একটা মিনিটকে মনে হচ্ছে এক-এক ঘণ্টা! অবশেষে শেষ মুহূর্ত এল।

ঝাঁকের মধ্যের কিছু কিছু হাঁস উড়ে উড়ে বসছে। তাদের জল ছেড়ে ওঠার সময় যে জলবিন্দু ওদের ডানা আর গা থেকে ঝরছে তাতে সূর্যের আলো পড়ে লক্ষ লক্ষ হিরের মতো ঝকমক করছে।

বাবা বললেন, 'ওয়ান, টু, থ্রি।'

সঙ্গেসঙ্গে আমরা তিন জনে বাঁ-দিকে রাইফেল ও বন্দুক একসঙ্গে সুইং করলাম। আমাদের গাডোয়াল-স্বপ্নাতুর চোখে শেষবারের মতো হাজার খানেক গাডোয়ালের ঘনসন্নিবিষ্ট ছবি ঝিলিক মেরে গেল।

পরমুহূর্তেই একটা বিচ্ছিরি ও অতর্কিত আওয়াজ হল-পকাত।

তারপর ডেঞ্জারাস ডোঙা, ডেয়ার-ডেভিল তিন শিকারি এবং অত্যন্ত অনিচ্ছুক পলান বাদার গা-চুলকোনো সাপ, বিছুটি, পাঁক এবং ঝাঁঝিভরা অথৈ জলে সমাধিস্থ হল।

জলে ডোবার আগে প্রথমেই আমার মায়ের মুখটা ভেসে উঠল; তারপরই গজেনের।

জলের নীচেটা কী সুন্দর। নীলচে সবুজ আলোয় ভরে গেছে জলজ অন্ধকার। লতাপাতার শিকড় ঝুলছে উড়ন্ত পাখির পায়ের মতো চারদিকে। নীচের সবুজ ঝাঁঝি কী নরম কার্পেটের মতো। পা পড়তেই স্প্রিংয়ের মতো পা উপরে উঠে এল। আরও অনেকক্ষণ নীচে থাকতে পারলে খুশি হতাম। থাকলে হয়তো জলপরি আর পাতালপুরীর রাজকন্যার সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারত। কিন্তু দম বন্ধ হয়ে এল। প্রাণপণ চেষ্টায় হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে অক্সিজেনের আকুতিতে যখন জলের উপর মাথা তুললাম মাটিতে পা রেখে তখন ভাগ্যক্রমে দেখলাম যে, আমি মরিনি। সেখানে ডুবজল ছিল না ভগবানের দয়ায়। জল আমার কানের নীচে ছিল।

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখলাম, পাশেই বাবা। জল, বাবার কাঁধ অবধি। বাবা ছ-ফুট দু-ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু সেই জোলো নাটকের আর দু-জন অ্যানিমেট এবং একজন ইনঅ্যানিমেট পাত্র মঞ্চে অনুপস্থিত ছিল। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম যে, গুলির কৌটো হারিয়ে গেলেও, রাইফেলটা হাতছাড়া করিনি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই পলানের মাথাটা আমার পাশে ভিজে পানকৌড়ির মতো জল থেকে উঠেই এক ঝাঁকুনিতে জল ছিটিয়ে আবার দ্বিগুণ বেগে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পলানের ডুবে মরার কোনো কথাই ছিল না কিন্তু পলানই কি শেষে ডুবে মরবে?

এমন সময় আমাদের সামনে জলের নীচে তোলপাড় শুরু হল।

এখানে কুমির আছে বলে শুনিনি-। থাকলে, আগে অনেক বার কোমর-জলে সামনে কচুরিপানার বান্ডিল রেখে তার উপর বন্দুক রেখে হেঁটে হেঁটে এখানে হাঁস মারতাম না। জলহস্তী ভারতবর্ষে নেই বলেই জানতাম। তবে এ কোন জানোয়ার এমন জলে তুফান তুলে ঝাঁঝি ও কাদায় হাঁচোর-পাচোর করছে?

কিছুক্ষণ পর পলানের মাথা আবার উঠে এল। মাথা তুলেই পলান দোখনো ভাষায় অশ্রাব্য গালাগালি করতে লাগল।

বাবা বললেন, 'হল কী?'

পলান বলল, 'আপনার বন্ধু। আমাকে এমন জাপটিয়ে ধরল যে, আমিসুদ্ধু, জলে ডুবে মরতাম। কিছুতেই যখন ছাড়ে না তখন তার নাকে লাথি মেরে উপরে আসতে বাধ্য হলাম। আমার দম ফুইরি যেতেছিল।'

বাবা আতঙ্কিত গলায় বললেন, 'বন্ধু কি মরে গেছে?'

পলান বলল, 'মরলে বাঁচি।'

তখন বাবা আমাকে বন্দুকটা ধরতে বলে ডুব দিলেন। বাবা আর ওঠেন না। আমার যে কী ভয় করতে লাগল কী বলব। বাবা ডুবে গেলে?

অনেকক্ষণ পরে বাবা বর্মনকাকুকে ধরে উঠলেন। দেখলাম বর্মনকাকুর মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তাঁর নাক ফেটে গেছে। রক্তে জল লাল হয়ে উঠল।

এখন ডোঙা উঠোনো যায় কী করে? চার জনের অনেকক্ষণের চেষ্টায় তো ডোঙাটাকে উপরে তোলা হল। হাত দিয়ে তারপর সকলে মিলে ডোঙার জল ছেঁচা হল।

যখন আমরা জল ছেঁচে বের করছি তখন গাডোয়ালের ঝাঁকটা আস্তে আস্তে উড়তে উড়তে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। খুব নীচু দিয়ে। যেন মজা দেখার জন্যেই।

ডোঙাটাকে জলমুক্ত করার পরে আসল সমস্যা দেখা দিল। বুক-সমান ডোঙায় জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাতে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়। বাবা প্রথমে উঠতে যেতেই ডোঙাটা আবার ডুবে গেল। আবারও তাকে তোলা হল।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। ডিসেম্বর মাস। হু হু করে উত্তর থেকে হাওয়া আসছে হাড়ের মধ্যে কনকনানি তুলে। এতক্ষণ জলের মধ্যে থেকে প্রত্যেকেই

গুড়ের হাঁড়িতে পড়া নেংটি ইঁদুরের মতো হয়ে গেছি।

শেষে পলান আগে উঠল। মানে, তাকে ঠেলে-ঠুলে ওঠানো হল। তারপর আমাকে। আমরা দু-জনে উঠে ডোঙার দু-দিক ব্যালান্স করে বসলাম। বাবা ও বর্মনকাকু আরও আধঘণ্টা সার্কাস করার পর উঠলেন। সকলে নৌকোবোঝাই হয়ে দেখা গেল ততক্ষণে লগি ভেসে গেছে। সকলে মিলে হাত দিয়ে জল কেটে অভিমানী লগির কাছে গিয়ে তাকে উদ্ধার করা হল। তারপর পাছে ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয় সেই ভয়ে সকলেই হাত দিয়ে জল কেটে কেটে গা গরম করতে লাগলাম।

পাড়ের দিকে ফিরে আসছি, ফিরে এসেছি প্রায়, এমন সময় বর্মনকাকু বললেন, 'দাদা, ওয়াইল্ড ডাকস।'

আমি পড়ন্ত রোদে হোগলা বাদার কাছে তাকিয়ে দেখলাম, কালো ও ছাইরঙা একদল পাতিহাঁস।

বাবা বললেন, 'যাঃ! পোষা।'

বর্মনকাকু কাঁপছিলেন। রেগে বললেন, 'কাশ্মীরে, ভরতপুরে কত শিকার করেছি আমি। আমাকে দেখাচ্ছেন আপনি? পোষা না, ওয়াইল্ড।'

পলান বলল, 'আলো নাই, ঠাহর হয় না ভালো। দাঁড়ান, ঠাহর করি।'

কিন্তু গাডোয়ালের শোকে কাণ্ডজ্ঞানহীন অধৈর্য অবস্থায় পলান ঠাহর করার আগেই বাবা ও বর্মনকাকু যুগপৎ বন্দুক দেগে দিলেন পনেরো-কুড়ি হাত দূর থেকে। চার-পাঁচটা হাঁস উলটে গেল।

আমরা ডাঙার কাছে এসে গেছিলাম। পাড় থেকে কে যেন বলল, 'অ কালীদাসী, তোর হাঁসিগুলোকে গুলিতে যে ভেনে দিল।'

কালীদাসী নাম্নী অদৃশ্য মহিলা বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সুধীর, নেতাই, হরবিলাস, লাঠি নে আয়, শড়কি নে আয়; আজ ব্যাটাদের ছেরাদ্দ করব।'

বর্মনকাকু ও বাবা ততক্ষণে ভুল বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

আমরা দেখলাম, পাড়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। আর অফ অল পার্সনস গজেন, যে শিকারের 'শ' জানে না, সেই-ই দূরবিন দিয়ে আমাদের নিরীক্ষণ করছে।

বিপদ দেখে পলান ডোঙা নিয়ে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় যাবে বলে ডোঙার মুখ ঘোরাচ্ছিল। সেই সময় আমরা অবাক হয়ে দেখলাম গজেন ফ্লুরির প্যাকেট থেকে মারমুখী সকলকে কেক বিতরণ করছে, খাওয়াচ্ছে।

ও একটু পরই চিৎকার করে বলল, 'মে SSO-ম SSA-ই ফিরে ESSO, আমি আছি; এরা কিছু বলবে না। রুদ্র ফিরে আয়, ফিরে আ... য়।'

এরকম বার বার ডাকতে লাগল গজেন।

সাহসে ভর করে ফিরে আসবার সময় পাতিহাঁসগুলোকেও তুলে নিয়ে এলাম আমরা। ডাঙার কাছে আসতেই দেখি, গজেন কালীদাসীর সঙ্গে মরা হাঁসদের দর কষাকষি করছে, ক্যাজুয়ালি। যেন কিছুই হয়নি। পাঁচ টাকা করে এক-একটার রফা করল ও! মাইনাস ধোলাই।

গজেন বাবার দিকে চেয়ে বলল, 'ফেয়ার এনাফ। কী মেসো?'

বাবা বললেন, 'হাঁসগুলো ফেলে দে রুদ্র।'

গজেন বলল, 'মে SSO, মাসির কথা একবার ভাবো; আর তোমার বন্ধুরা...; নেমন্তন্ন...।'

গিদাইয়া

বিন্ধ্যবাসিনী মন্দিরের নীচে শিউপুরা, মাহিন্দা আর বিরহী।

গঙ্গা মাঈ বয়ে গেছেন পাহাড়ের চরণ ঘিরে। পাহাড়ের উপর থেকে নদীর শান্ত গেরুয়া আঁচল দেখা যেত। মাঝদরিয়ার চরে মেলা বসত চখাচখির। পাহাড়ের উপর তাদের গাঢ় সোনালি ডানার নাচ দেখা যেত। ঝকঝকে ইলিশ তো ছিলই। তা ছাড়া অন্য মাছেরও অভাব ছিল না নদীতে। নিস্তব্ধ দুপুরে কোনো কোনো দিন গিয়ে নদীর ঘাটে একটা পুরোনো বড়ো পাথরে বসে থাকতাম। ঘাটের উপরেই একটা বড়ো অশ্বত্থগাছ ছিল। সে গাছে অসংখ্য টিয়া পাখির বাসা ছিল। মা-টিয়া উড়ে এসে পাখা ঝটপটিয়ে সবুজ নরম তুলতুলে বাচ্চার ডালিম-লাল ঠোঁটে খাবার গুঁজে দিত। আর কারণে-অকারণে নদীর ঘাট সরগরম করে রাখত ওরা ট্যা ট্যা করে। বাদামিরঙা পাল উড়িয়ে গুণ টেনে মহাজনি নৌকো যেত। একটা অলস হাওয়া বইত অশ্বত্থ গাছের পাতায় পাতায় ঝিরঝির করে। একদল কাদাখোঁচা শীতের নরম রোদে একঝাঁক চঞ্চল ভাবনার মতো নদীর গেরুয়া পলি-পড়া আঁচলে ঝরে পড়ত, আবার উড়ে যেত। বসে বসে দেখতে ভারি ভালো লাগত।

একদিন এই নদীর চরে চখা শিকারে গিয়ে প্রাণটা প্রায় গেছিল।

ওখানে গিদাই বলে আমাদের একজন খিদমদগার ছিল। খুব মজার ছেলে। ওর বয়েস তখন কুড়ি-একুশ, সে-সময়ে আমারও ওই রকমই ছিল বয়স। ও যেখানেই আমাকে উৎসাহ করে নিয়ে যেত সেখানেই একটা-না-একটা দুর্ঘটনা ঘটত। গিদাইয়ের কালো, কুচকুচে গাঁট্টাগোট্টা চেহারা এখনও বেশ মনে আছে। ওকে হঠাৎ দেখলে মনে হত ভরদুপুরে বাজরা খেত থেকে শুয়োরই বেরিয়ে এল বুঝি। ও দিনে

কমপক্ষে একপোয়া করে সর্ষপতৈল মর্দন করত মাথায়। ভাবটা, যখন বিনি পয়সায় পাচ্ছি তো কম মাখি কেন?

একদিন গিদাই বলল, 'চলুন দাদাবাবু, চখোয়া মেরে আসি।' বললাম, বন্দুক তো আনিনি সঙ্গে, একটা রাইফেল আছে। সেটা একটা জগঝম্প বিশেষ। পাখি-শিকার বেকার। তা ছাড়া নদীর মধ্যের চরে যাবি কী করে?

ও বলল যে, সেসব দায়দায়িত্ব সব ওর। ওর চাচাতো-ভাই যশোয়ন্তের নৌকো আছে, যে বিনি পয়সায় সসম্মানে আমাদের শিকার খেলতে নিয়ে যাবে। আর বন্দুক?

'ফিক্কর মত কিজিয়ে, সব ইন্তেজাম হো যায়গা।'

অতএব বিকেল চারটে নাগাদ কথামতো নদীর ঘাটে গিয়ে দেখি যে, গিদাই একটা বারো বোরের একনলা বন্দুক নিয়ে বসে আছে। বন্দুকটার গায়ে হাত-দুই দড়ির সঙ্গে একটা বাঁশের বেশ মোটা কঞ্চি বাঁধা। যন্ত্রটা যে কী, দেখে প্রথমে তা বোধগম্য হল না।

গিদাই আশ্বস্ত করে বলল, অবাক হবার কিছুই নাই। ওটা বিলেত থেকে আসেনি। বলল, ব্যাপারটা খুবই সোজা। একটা গুলি ছোড়ার পর ফাঁকা কার্তুজটা স্বেচ্ছায় বেরোয় না। এমনকী টানাটানি করলেও যখন বেরোতে আপত্তি জানায়, তখন ওই বাঁশের কঞ্চিটা নলের মুখে ঢুকিয়ে বার কয় গুঁতো মারতে হয়। এবং মারলেই ফাঁকা কার্তুজটা পিতৃনাম স্মরণ করতে করতে বেরিয়ে আসে।

মনে মনে ইষ্টদেবতার নাম জপ করে মানে মানে নৌকোয় গিয়ে উঠলাম। নৌকো যখন নদীর বাঁকে ঘুরে সেই ঈপ্সিত চরায় পৌঁছোল তখন সূর্যের তেজ কমে গেছে। গেরুয়া বালিতে একটা কোমল কমলা ছায়া পড়েছে।

গিদাইয়ের এ সমস্ত এলাকা একেবারে নখদর্পণে। আগে আগে পথ দেখিয়ে ও প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলল। এভাবে বেশ কিছু দূরে বালিতে এগোনোর পর, বেশ দূরে, চরের মধ্যের দোলায় সোনালি চখাচখিদের দেখা গেল। ডাকও শোনা গেল। নির্জন নদীচরে তাদের ডাকে গা ছমছম করে ওঠে। যাঁরাই শুনেছেন, তাঁরাই জানবেন। কিন্তু চখাদের কাছে যাওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

গিদাইকে বললাম, এখান থেকেই মারি। গিদাই আমার মুখের দিকে এমন করে তাকাল যে, মনে হল আমার মতো ইডিয়েট লোক ও জন্মে দেখেনি। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, 'আগে চলুন'-বলে, আমাকে পথ দেখাল।

যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তার পাশ দিয়েই বালির একটি প্রাকৃতিক আড়াল সৃষ্টি হয়েছিল। সেই আড়ালে আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে পারলে চখাদের বেশ কাছেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। অতএব সেই বাঁশের গলায় দড়ি বাঁধা বন্দুক বাগিয়ে সুন্দর নরম বালিতে মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগলাম। আমি আগে। গিদাই পিছনে।

তলার বালি সামান্য ভেজা। কোথাও-বা পায়ের পাতা ভেজে এমন জল। প্রায় হাত-পঁচিশেকও যাইনি-হঠাৎ ভুসস করে সামনের পা-টা নীচে চলে গেল প্রায় হাঁটু অবধি। কী হল, ভালো করে বোঝবার আগেই দেখি আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছি নীচে।

গিদাই আমার বেশ কিছুটা পিছনে আসছিল। অপস্রিয়মাণ অবস্থায় ফিরে দেখি, গিদাই রীতিমতো অলিম্পিক স্প্রিন্টারের বেগে পাঁয়তারা কষে আমার দিকে দৌড়ে আসছে। তারপর কিছু বুঝতে পারার আগেই একলাফে পেছন থেকে আমার ঘাড়ে পড়ে আমাকে বালির উপর ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে নিজেও চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। বুঝলাম, এবারের মতো গিদাইয়ের জন্যেই প্রাণটা রক্ষা পেল। বালিতে উপুড় হয়ে পড়ার পর সেই ভুস করে সোজা ডুবে যাওয়ার অনুভূতিটা আর রইল না, তবে, মনে হল-একটা ভেজা ডানলোপিলোয় শুয়ে আছি। আর সারা শরীরে চুঁইয়ে জল উঠছে।

গিদাই ততক্ষণে সুর করে চ্যাঁচাতে আরম্ভ করেছে, 'এ যশোয়ন্ত ভেইয়া রে-এ-এ-এ। নদ্দী মে লেলিয়া-রে-এ-এ-এ-এ।'

তারস্বরে এরকম চ্যাঁচাচ্ছে আর পিঠে ঘষে ঘষে সেই উঁচু বাঁধের দিকে যাবার চেষ্টা করছে। ওর দেখাদেখি আমিও তাই করতে লাগলাম। এমন সময় যশোবন্ত ভাইয়াকেও শশব্যস্ত হয়ে নৌকো করে আসতে দেখা গেল। আর ঠিক তক্ষুনি, বোধ হয় আমাদের মজা দেখাবার জন্যই চখাগুলো কোঁয়াক কোঁয়াক করে ডাকতে ডাকতে আমাদের উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। যশোবন্ত ভাইয়া অনেক কষ্ট ও মেহনত করে আমাদের নৌকাস্থ করল। নৌকোয় উঠে আশ্বস্ত হলাম।

সেদিনকার কেলেঙ্কারিটা গিদাই খুব গুরুতর ব্যাপার বলে মনে করেছিল, তাই সেদিনকার সে অ্যাডভেঞ্চার কম্পেনসেট করবার জন্যে আমাকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে অন্য কোথাও কোনোখানে অ্যাডভেঞ্চারে নিয়ে যাবার তাল করছিল।

একদিন চুপিচুপি বলল, 'চলুন দাদাবাবু বত্বক মেরে আসি।'

বললাম, 'যাই মারাও বাবা, তোমার সঙ্গে আর নয়।'

কিন্তু গিদাইকে এড়ানো মুশকিল-মানে, কিছুতেই সম্ভব নয়।

একদিন ভোর বেলা আমাকে আর গিদাইকে আবার দেখা গেল বাঁশের গলায় দড়ি বাঁধা বন্দুক হাতে শিউপুরার পথে হাঁটছি। প্রায় মাইল দেড়েক হাঁটিয়ে গিদাই আমাকে মির্জাপুর শহরের দিকে নিয়ে এল, তারপর আমরা রেললাইন পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়লাম। রেললাইনের ধারেই একটা ছোটো জলা। আগাছা আর দলদলিতে ভরতি। একদিকের পাড়ে ধোপারা কাপড় কাচছে ধাঁই-ধপা-ধপ করে।

গিদাই আমায় আঙুল দিয়ে, চোখে আঙুল দিয়েও বলা যায়-দেখাল, সেই জলার মাঝামাঝি গুটিকতক জংলিহাঁস শর বনের কালচে সবুজ ছায়ার মধ্যে ঘুরঘুর করছে। পিনটেইলস এবং পোচার্ড। অভাবনীয় ব্যাপার।

হাঁস তো দেখা গেল কিন্তু ওখানে যাই কী করে? সাঁতার যা জানি, তাতে কিছু লাভ নেই। এই আগাছায় পা জড়িয়ে গেলে জনি ওয়েসমুলারও ডুবে মরবেন নির্ঘাত।

গিদাই আমার মনের ভাব বুঝে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'কোথাও ডুবজল নেই।' তারপর ওর কাপড়ের উপরে জড়ানো দুর্গন্ধ গামছাখানা সস্নেহে খুলে আমায় দিয়ে বলল, 'পরে ফেলুন। এসব বিলাইতি বত্বকের মাংস খেতে যা না! এদের জন্যে সব কষ্টই পোষায়।'

সুবাসমাখা গামছাখানি পরে এক-পা, এক-পা করে জলে নামলাম। গিদাই পাশে পাশে। কোথাও ডুবজল নেই কথাটা যে কত বড়ো মিথ্যে, একটু পরেই তা প্রমাণ হল। আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। পচা জলে গা চুলকোচ্ছে। মাঝে মাঝে গায়ে একটু পিচ্ছিল ছোঁয়া লাগিয়ে ছোটো মাছ এবং ব্যাং রসিকতা করে চলে যাচ্ছে। ঢোঁড়া সাপের রসিকতার অপেক্ষায় আছি। হঠাৎ পিছন ফিরে চেয়ে দেখি ভয় পেতে পেতেও পাড় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। মনে ভরসা হল, ততক্ষণ যখন ডুবিনি, তখন এযাত্রা বোধ হয় বেঁচে গেলাম।

ততক্ষণে হাঁসেদের বেশ কাছে চলে এসেছি। এবার গুলি করা উচিত। নইলে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হবে। হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম। একটু দম নিয়ে বন্দুক বাগাতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, এই আশ্চর্য যন্ত্রটা তো অপরীক্ষিতই রয়ে গেছে। এতে গুলি ছুড়ে প্রাণে মরব, না শুধুই অজ্ঞান হব কিছুই জানি না। অতএব জননী-জন্মভূমির মাটির উপরেই প্রথম পরীক্ষাটি করলে ভালো করতাম। কিন্তু তখন অতশত ভাববার সময় ছিল না।

উলটোদিকের পাড়ে একটা উটের বাচ্চা চরছিল। সেটার গায়ে না লাগে, এমনিভাবে তাক করে, দিলাম ধাঁই করে ঘোড়া টিপে।

সঙ্গেসঙ্গে পা পিছলে জলে পড়ে গেলাম, এবং মনে হল আমার ডান কাঁধটা আমার নয়।

গিদাই আমাকে একগাদা পচা জল খাইয়ে ঝাঁকানি দিয়ে তুলে বলল, 'গিড় গেল্যে ক্যেনে বাবু?'

রাগে গা-জ্বালা করছিল।

বললাম, 'ঠিক আছে। হাঁসগুলো কুড়োগে যা।'

আমার কপালে যে এর পরে আরও দুঃখ ছিল কে জানত? গুলিটা খুব জবরদস্ত হয়েছিল। একগুলিতেই গোটা পাঁচেক পড়েছে। হবে না? যা বন্দুক, না হয়ে যায় কোথায়!

হাঁসগুলো কুড়িয়ে গিদাইয়া আমাকে আবার জল থেকে পাইলটিং করে ডাঙায় নিয়ে যাবে, এই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। এক-এক দমকা হাওয়া দিচ্ছে আর

শীতের সকালে শরীরের যতটুকু অংশ জলের বাইরে আছে, মনে হচ্ছে যেন বরফ হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ বিকট চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি, ডান হাতে একটা হাঁস নিয়ে-গিদাই জলে ডিগবাজি খাচ্ছে।

প্রথমে ভাবলাম, সাপে কামড়াচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই জলের মধ্যে বুদবুদ তুলে গিদাই কেঁদে কেঁদে বলল, 'হাম বুড় যাতা হ্যায় বাবু, হাম তুড়নে নহি শকতা।'

কী সর্বনাশ। আগাছাতে পা জড়িয়ে গেছে গিদাইয়ের। সাঁতার কাটতে পারছে না। হাঁসগুলো যেখানে ছিল সেখানে জল বেশ গভীর। ভগবানকে ডেকে আকুল হয়ে বললাম, হায় ভগবান এ আমাকে কী বিপদে ফেললে? গিদাইকে বাঁচানো দূরের কথা, নিজেকে কী করে বাঁচাই সেই এক সমস্যা।

জলের ধারে যে দুটো ধোপা কাপড় কাচছিল তারা কাপড় কাচা বন্ধ রেখে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ওদের সামনে ইতিপূর্বে আরও লোক আমাদের মতো মরেছে কি না ওদের মুখ দেখে বুঝলাম না। কিন্তু লোক দুটো নড়াচড়াও করে না মোটে।

আমি বললাম, 'পাকড়ো পাকড়ো। আদমি বুড় যাতা হ্যায়।'

আমার হিন্দি শুনে চটল কি না জানি না, তুবুও দেখি ওরা নড়ল না। এদিকে মাঝে মাঝেই গিদাইয়ের হাত কিংবা পা জলের উপর দেখা যাচ্ছে আর কখনো-বা ভেজা মাথাটাকে পানকৌড়ির ডানা ঝাড়ার মতো ঝাঁকিয়ে আবার পরক্ষণেই জলের তলায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু হাতটা যখনি জলের উপর উঠছে, তখনি দেখা যাচ্ছে যে মরা হাঁসটা হাতে ধরাই আছে। একবারও ছাড়েনি। মনে মনে ইচ্ছা যে, নিজে যদি ডুবে মরে তো মরা হাঁসটাকে আবার ডুবিয়ে মারবে।

কী করব এবং কী করা উচিত ঠিক করতে না পেরে আমি তাড়াতাড়ি দড়িবাঁধা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে গুঁতিয়ে বাজে কার্তুজটাকে ফেলে, ট্যাঁকের গামছা থেকে সবে-ধন নীলমণি গুলিটি পুরলাম। তারপর বন্দুকটা ধোপা দুটোর দিকে বাগিয়ে ধরে চ্যাঁচাতে লাগলাম, 'উসকো নেহি পাকড়োগে তো আভি গোলিসে ভুঞ্জে দেগা তুম লোগোঁকো।'

তখন ওদের মধ্যে যে বুড়োমতো, সে হাত-পা নেড়ে বলল, 'ও তো মরতেই যাচ্ছে, খামোকা আমরা কেন মরতে যাই।'

দেখলাম ভালো রাস্তায় হবে না। বন্দুকটা তাক করে ধোপা দুটোর মাথার দশ-পনেরো হাত উপর দিয়ে চালিয়ে দিলাম গুলি। দেড় ডজন বড়ো বড়ো দাঁড়কাক টেলিগ্রাফের তারে বসে মজা দেখছিল। গুলির শব্দে তারা সমস্বরে কা-কা-কা-কা করে মাথা গরম করে দিল। আর উটের বাচ্চাটা সম্পূর্ণ বিনাকারণে বিশ্রী আওয়াজ করতে করতে ব্যাপারটা তার মালিকের কাছে বোধ হয় রিপোর্ট করতে ছুটল।

কিন্তু সে যাই হোক, এখানে এদেশে শক্ত পন্থা হচ্ছে নান্য পন্থা।

ধোপা দুটো পাঁশুটে মুখ করে জলে নেমে গিদাইকে চাঁটাতে চাঁটাতে আর চুল টানতে টানতে ডাঙায় নিয়ে এল। দেখলাম, হাতে মরা হাঁসটা তখনও ধরা আছে।

এত কাণ্ডর পর আমি সাহসী হয়ে গেছি। আন্দাজে আন্দাজে যেদিক দিয়ে এসেছিলাম, সেদিক দিয়ে ডাঙায় গিয়ে উঠেছি।

দৌড়ে গিদাইয়ের কাছে গিয়ে দেখি, গিদাই ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। জল খেয়ে পেটটা ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল।

আর অস্ফুট স্বরে বলছে, 'মাঈরে-মাঈ...।'

অশান্তিমারুর দূত

বুড়োর মুখের চামড়া কুঁকড়ে গেছে। কপালে বলিরেখা। সার সার। সমান্তরাল। রোদে আর নোনাজলে গত ষাট বছর ধরে ভিজে আর পুড়ে সারা শরীরের রং ফেলে-রাখা তামার মতো হয়ে গেছে।

বুড়ো মাথার পাটি-বোনা টুপিটা বাঁ-হাত দিয়ে খুলল। ডান হাত দিয়ে টুপির ভিতরে গুঁজে রাখা চুট্টার বান্ডিল থেকে একটি চুট্টা আর দেশলাই বের করল। টুপিটা মাথায় দিল। চুট্টাটা ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিল আরামে। ধুঁয়ো ছাড়ল। নীল নির্জন আকাশ আর নীল নির্জন সমুদ্রের মধ্যে কালো কাঠের ফালি জুড়ে জুড়ে তৈরি করা ডিঙি নৌকোটার ওপর দিয়ে চুট্টার সাদা পাতলা ধোঁয়া মাকড়সার জালের মতো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ঝুলে থাকল শূন্যে। তারপর আস্তে আস্তে জলের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে আলতোভাবে মিলিয়ে গেল।

আজ সমুদ্র কিছু বলবে বুড়োকে। সমুদ্র কিছু বলবে, তাই বাতাস আওয়াজ করছে না কোনো। গভীর জল আজ শান্ত। নীল বিছানার চাদরের মতো। একটুও কুঁচকানো নয়। টানটান। শুয়ে আছে, যতদূর চোখ যায়, দিগন্ত অবধি। নীলাকাশের মশারির নীচে। সমুদ্র কিছু বলবে বলে সামুদ্রিক বাজ, আর সি-গাল আর টার্নরা আজ বুড়ো নেলিয়াপ্পানের ধারে-কাছেও নেই। ধারে-কাছে নেই লাল ভেটকির অথবা সার্ডিনের ঝাঁক, অথবা তাদের খোঁজে-আসা হাঙর। সমুদ্র কিছু বলবে বলে আজ অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে দেওয়া নেলিয়াপ্পানের জালও নিথর। সমুদ্রের দেবতা অশান্তিমারুর নির্দেশেই যেন স্তব্ধ হয়ে আছে আজ আকাশ, বাতাস, জল, মাছ, পাখি, উদ্ভিদ। সমুদ্রের সঙ্গে কথা হবে আজ নেলিয়াপ্পানের।

বুড়ো বসে আছে স্থির। সোজা মেরুদণ্ড, স্পর্ধামাখা থুতনি আর তার মাথার গোল সাদা টুপির আর কালো নৌকোটার ছায়া পড়েছে জলে। ছায়ারা রং খায়, হাঙরেরা যেমন মাছ। সব রং খেয়ে হজম করে কালো করে দেয় ছায়ারা। সাদা টুপি আর তামারঙা নেলিয়াপ্পান, আর কালো নৌকোর ছায়ার রং কালো।

আজ সমুদ্র কিছু বলবে, নাকি সমুদ্রের দেবতা অশান্তিমারু বলবেন? আগামী কাল মুত্তেলামা আর টোটম্মার পুজো আছে। জলুস বেরোবে রাতে এই সমুদ্রপারের গ্রামে। নোনাগন্ধ হাওয়ায়, মাথার উপর হ্যাজাক ধরে আগে-পিছে হেঁটে যাবে কেউ কেউ, আর নানা মুখোশে সেজে নাচতে নাচতে যাবে নাচুনেরা তাদের মাঝে মাঝে। মেয়েরা মুখে গর্জন তেল মেখে চকচকে ঝকঝকে রুপো আর পেতলের গয়না পরে, কোমরে পৈঁছা ঝুলিয়ে বাহুতে বাজুবন্ধ লাগিয়ে রক্তলালরঙা গঞ্জামি শাড়িতে সেজে কলকলিয়ে কথা কইতে কইতে, আর মুত্তেলামা আর টোটম্মার প্রশংসার গান গাইতে গাইতে জলুসের জৌলুস বাড়াবে। ঢোল আর শিঙার আওয়াজে তালা ধরবে কানে।

কিন্তু সেসবই কাল। আজ এই প্রথম দুপুরে কোনো শব্দ নেই। হাওয়া নেই। জলে কোনো কলরোল নেই। আকাশে পাখির কাকলি নেই। শুধু নিস্তব্ধতা আছে, শুধু নীল দিগন্ত, আর নীল সমুদ্র। আর কালো ছায়া। জলের নীচের মস্ত পাহাড়টা কালচে-নীল দেখায়। এই পাহাড়েই সমুদ্রের দেবতা অশান্তিমারুর থান। পাহাড়ের গায়ে গায়ে আজ স্যামন-সার্ডিনের ঝাঁক খেলা করে। লাল ভেটকি। আর তাদের পেছনে পেছনে আসে টাইগার শার্ক।

পাহাড়টাও আজ নির্জন। ছমছম করছে জলের উপর এবং জলের নীচ।

সমুদ্র আজ কিছু বলবে।

বহুদূরে দেখা যায় তীরভূমি। স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। বুড়োর যখন দশ বছর বয়স তখন থেকে সে সমুদ্রে আসছে। আজ তার বয়স সত্তর। ষাট বছর ধরে দেখছে এই তীরভূমিকে। তাই সে আন্দাজে আন্দাজে বোঝে কোথায় কী আছে। আজ বড়ো বেশি দূরে চলে এসেছে। তীরভূমি প্রায় মুছেই গেছে। সরু তুলি দিয়ে আঁকা অতি সরু রেখারই মতো দেখা যাচ্ছে। তাল বন, ঝাউ বন, বালিয়াড়ি, পাহাড়, নেলিয়াপ্পানদের নুলিয়া-বস্তি, দুধ-সাদা হোটেলটি। মধ্যে মাথা উঁচিয়ে আছে বাতিঘরটি। সন্ধ্যে লাগার সঙ্গেসঙ্গেই অথবা দুর্যোগের দিনের অন্ধকারেও ঘুরে ঘুরে যাবে তার আলো নির্ভুল যতিতে, গতি মেপে মেপে।

কিন্তু এখন উজ্জ্বল দিন। ঝকঝকে। নীল নিস্তব্ধতায় উচ্চকিত দিন। সেই নীলিমায় সোনারঙা রোদের প্রতিসরণকে তীক্ষ্ণ নীল বলে মনে হয়। বুড়োকে, বুড়োর সাদা

টুপিকেও নীল বলে মনে হয়। এই নীল দিনেই বুড়ো সমুদ্র নেলিয়াপ্পান বুড়োকে কিছু বলবে।

হঠাৎই সমুদ্রের উপরে একটি মাস্তুল দেখা গেল। মাস্তুলই কি? বুড়ো চুট্টাটা ফেলে দিয়ে ডান হাতের পাতা দু-চোখের উপরে ধরে ভালো করে ঠাহর করল। সোজা জল কেটে নীল জলের উপর নীল ম্যাজিকের মতো চকচকে একফালি ইস্পাতের ধ্বজা যেন এগিয়ে আসছে। দ্রুত। দু-পাশে জল সরে যাচ্ছে সম্ভ্রমে, ভাঙা ঢেউয়ের ফেনায় শান্তির সাদা পতাকা উড়িয়ে।

বুড়োর ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটে উঠল। সে ভেবেই ছিল এমন কিছুই একটা ঘটবে, যা কখনো ঘটেনি আগে। নীল তিমি। এবারে জলের ফোয়ারা তুলল। নীল রংকে প্রকাণ্ড পিচকিরিতে ভরে উৎসারে সাদা করে ছড়িয়ে দিল অনেক উঁচুতে। আজ হাওয়া ছুটি নিয়েছিল, তাই সেই উৎসারিত ফোয়ারার একটি জলকণাও এদিক-ওদিক হল না। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল বুড়ো। একটু ভয় যদিও পেল, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। তারপরই জলের পোকা নোনাগন্ধ, তামারঙা বুড়ো জলের রাজা নীলরঙা তিমির দিকে চেয়ে রইল অপলক বিস্ময়ে। তিমিটা বুড়োর সমান্তরালে, কিন্তু দূর দিয়ে তার নৌকোকে পেরিয়ে গিয়েই ফিরল। তাতে তুফানের চেয়েও বড়ো বড়ো ঢেউ জাগল সমুদ্রে। ঢেউগুলো দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল বুড়োর ডিঙির দিকে। এমন জোরে এসে লাগল প্রথম ঢেউটিই যে ডিঙিই উলটে গেল এক ঝটকায়। ঢেউটাকে গালাগালি দিতে দিতে বুড়ো তলিয়ে গেল তার ডিঙিরই সঙ্গে। মাথার উপর দিয়ে ঢেউয়ের পাহাড়-পর্বত বয়ে গেল। বুড়ো তার ডিঙি জড়িয়ে ভেসে উঠল আবার। তখন ঢেউগুলো দৌড়ে চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে, দিগন্তের দিকে।

টালমাটাল ডিঙিতে বসে চোখ-নাক থেকে নোনা জল সরিয়ে নেলিয়াপ্পান আবার ডান হাতের পাতা চোখের উপরে রেখে তাকাল। দেখল নীল তিমি আসছে আবারও। এবারে পাশ দিয়ে নয়। একেবারে সোজাসুজি। বুড়োর ডিঙি থেকে একশো মিটারের মতো দূরে থাকতেই সে হঠাৎ ডুব দিল। তিমি হারিয়ে গেল। কিন্তু ঢেউয়ের পাহাড় ধেয়ে এল সোজা বুড়ো আর তার ডিঙির দিকে। আবার উলটাল নৌকো। জালে জড়িয়ে গেল বুড়ো। তারপর ঢেউ সরলে অনেক কষ্টে জাল ছাড়িয়ে নৌকোয় উঠে বসল আবার। অশান্তিমারুর এই খেলার কোনো মানে বুঝছে না বুড়ো। এবারে সত্যিই ভয় করছে। দাঁড় দিয়ে জলকে কাটল বুড়ো বারবার। নীল রক্ত বেরোল জলের গা থেকে। নীল তিমি যে আলোড়ন তুলেছিল জলে, তা এখন বিজবিজ শব্দ করে কোনো শোকার্ত বুড়ির বিড়বিড়ানিরই মতো আস্তে আস্তে থেমে এল। জলের নীলের মধ্যে ঢেউয়ের আর ফেনার সাদা লেগেছিল। আস্তে আস্তে মুছে গেল তা। সমুদ্র স্থির হল। বুড়ো আর বুড়োর নৌকোও স্থির। জলের গভীরকে রোদের চাবুক

চিরে দিচ্ছিল। বুড়ো ভালো করে চাইল এদিক-ওদিক ঢেউ মরে যাওয়া স্বচ্ছ জলে। বারবার। হঠাৎই চোখে চোখ পড়ল। পাথালি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীল পাহাড়ের মতো তিমি তার ডিঙির সমকোনে। ডিঙি থেকে কিছুটা দূরে। মস্ত বড়ো চোখ তার। স্থির চেয়ে আছে নেলিয়াপ্পানের দিকে।

ডিঙির মধ্যে দাঁড়টা শুইয়ে রেখে নেলিয়াপ্পান দু-হাত জড়ো করে প্রণাম করল। কাকে যে ঠিক প্রণামটা করল তা বুঝল না। অশান্তিমারুকে, না আকাশকে, না বাতাসকে, না নীল তিমিকে তা জানল না সে। শুধু জানল যে, যিনি তার চেয়ে অনেকই বড়ো, তার কাছে নিজেকে ছোটো করল। ছেলেবেলা থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছিল নেলিয়াপ্পান। তার মা-ঠাকুমার কাছে, সমুদ্রের কাছে, আকাশের কাছে, সামুদ্রিক ঝড়ের কাছে। শিখেছিল যে, নিজেকে নত করার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই, কুসংস্কার নেই, বরং মহত্ত্ব আছে। যে নিজেকে নত না করতে শিখেছে তার কাছে অন্য কেউই কখনো বিনত নয়।

নীল তিমি! কী আশ্চর্য! গত ষাট বছরে একদিনের জন্যে দেখা দেয়নি। তিমিটা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। নেলিয়াপ্পানও চেয়ে রইল অনিমিখে।

'কী চাও?' বুড়ো বলল। ভয় আর বিস্ময়মেশা গলাতে।

'তোমাদের স্থলের পৃথিবীতে কী আছে? তা জানাও।'

'কী নেই? কী জানতে চাও তুমি?'

'জানতে চাই, কী আছে! দেড়শো বছর হল সাগর থেকে সাগরে, উষ্ণতা থেকে শীতে, প্রবল বেগবান স্রোতের ভেতর থেকে পরম শান্ত জলে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। জলের নীচে কত যে ঘরবাড়ি, রাজপথ, বিপন্ন বিস্ময়ের স্রোত, জীবন্ত সব জলজ উদ্ভিদ, লাল নীল কালো হলুদ গোলাপি মাছ, কাঁকড়া, সাপ, অক্টোপাস, মৃত অ্যালগি, প্রস্তরীভূত প্রাগৈতিহাসিক জলজ জন্তুর মেরুদণ্ড। সবই দেখেছি। দেখিনি শুধু কী করে তোমাদের স্থলের পৃথিবীর মাটিতে একটি উষ্ণ বীজ থেকে চারাগাছ জন্মায়। কী করে কিশলয়ে ছেয়ে যায় দীর্ঘ গ্রীষ্মের পর প্রথম রাতের বৃষ্টি পেয়েই ন্যাড়া গাছের সারা শরীর।'

'এ তো অনুভবের! দেখারও নয়। তোমাকে বলি কী করে সেই শিরশিরানি-অনুভূতির কথা।' বুড়ো বলল। বলেই নেলিয়াপ্পান ভাবল, এত সুন্দর করে কথা তো সে কোনোদিনই বলতে শেখেনি। কে বলল, এমন করে তার মুখ দিয়ে?

'তোমাদের পৃথিবী কি গাছে গাছে সবুজ?'

'ছিল। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন ছিল। এখন নেই। জঙ্গল নেই, মাঠ নেই, নির্জনতা নেই।'

'তাই? ভারি দুঃখের। সর্বনাশের কথা তো।'

'তাই।'

'আমাদের জলের পৃথিবীতেও বিকট বিকট আওয়াজ করে কীসব ফাটে। বেশ কিছুদিন হল। তোমরাই ফাটাও। দিগন্ত থেকে দিগন্তের সমুদ্রতল কেঁপে যায়, লক্ষ লক্ষ মাছ মরে যায়, কোটি কোটি প্রাণী, উদ্ভিদ সব শেষ হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। তোমরা স্থলের মানুষরাই এসব করো। তোমরা এত জান আর এটুকু কি জান না যে, পৃথিবীর এক পিঠে জল আর তারই অন্যদিকে স্থল? জলে কি ডাঙায় যা-কিছুই কর না কেন তার রেশ পৌঁছোয় সবখানেই।'

বুড়ো বলল, 'বুঝেছি।'

'বুঝেছ?'

তারপর বুড়ো বলল, 'তোমাদের সমুদ্রতলে কী আছে? লালরঙা প্রবালের বিছানা? ফিকে সবুজ, গাঢ় সবুজ গাছ-পাতা? অক্টোপাস? হাঙর?'

নীল তিমি হাসল অদ্ভুত শব্দ করে। বলল, 'তোমাদের মানুষদের মধ্যেও তো ওইসব প্রাণীই আছে। মানুষের ভেক ধরে। হাঙর, সাপ, অক্টোপাস জলের নীচে যা আছে তার সবই।'

'তাই?'

'তাই।'

'তুমিই কি অশান্তিমারু? নীল তিমি?'

তিমি হাসল। বলল, 'তুমি-আমি তাঁর অংশমাত্র। আমাদের সাধ্য কী যে, অশান্তিমারু হই? স্পর্ধাও করি না কখনো।'

'তিনি কী বলেছেন?'

'বলেছেন যে, তিনি তোমাদের-আমাদের যে সমুদ্র ও স্থলের পৃথিবী দিয়েছিলেন একদিন, তাতে আমাদের যা-কিছুরই প্রয়োজন তার সবই ছিল। তাকে সুন্দর করে রাখাই ছিল আমাদের কাজ। গাছ কাটলে, মাঠ ন্যাড়া করলে, পাহাড়, কি মরুভূমি, কি সমুদ্রতলে বিস্ফোরণ ঘটালে ওই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। পাখি আর গান গাইবে না, আমার মতো বড়ো মাছ কি সুন্টুনি-মুন্টুনি, চিলতে চিলতে লাল নীল হলুদ গোলাপি মাছ, কি তুমি, বা অন্য কোনো মানুষই বেঁচে থাকবে না। কুঁজো, ঘেয়ো, অন্ধ, কালা, বেঁকে যাওয়া শরীরে মৃত্যু হবে আমাদের প্রত্যেকেরই বড়োই যন্ত্রণায়।'

বলেই, নীল তিমি নিশ্বাস ছেড়ে নিশ্বাস নিল একবার আর অমনি জলের মধ্যে তোড়ে ফোয়ারা উঠল, আর সেই ফোয়ারার ভারে আবারও বুড়ো নেলিয়াপ্পানের ডিঙি ডুবে গেল। তলিয়ে যেতে যেতে বুড়ো তার গায়ে নীল তিমির পিছল শরীরের একটু স্পর্শ পেল। যেন মনে হল, সে বলে গেল, 'ভালো থেকো, ভালোবেসো।'

এবারে ওপরে উঠে দাঁড় দিয়ে জল কাটতে কাটতে বুড়ো দেখল, আজকের সমুদ্রের সেই অস্বাভাবিক শান্তি বাতিল করে দিয়েছেন অশান্তিমারু। জোরে হাওয়া ছুটে আসছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে নোনাগন্ধ বয়ে, সি-গালের ঝাঁক তাদের একটানা ব্যথার স্বরে ভরে দিয়েছে আবার চারধার। লাল ভেটকির ঝাঁক চলেছে নীল জলে আবির গুলে। সার্ডিনের একটা ছোট্ট ঝাঁক বুড়োর জলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যেন জেনেশুনেই।

জালটা টানতে টানতে বুড়ো নিজেকে বলল, 'হাসিমুখে বেঁচে থাকার মতো, সন্ধ্যে বেলায় নাচ-গান করার মতো সব কিছু অশান্তিমারু সত্যিই তো আমাদের দিয়েছিলেন। এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংস করার মতো বোকামি আর কিছুই হতে পারে না। নীল তিমি যা বলে গেল সেই কথা ক-টি প্রতিজনাকেই বলতে হবে। বোঝাতে হবে। নীল তিমি, লাল-নীল মাছ, কৃষ্ণচূড়া গাছ, ঝাউ বন, তাল বন, সবুজ মাঠ, গভীর জঙ্গলের স্বার্থ আর আমাদের প্রত্যেকের স্বার্থই এক। পৃথিবীই যদি না বাঁচে তবে আমরা কেউই বাঁচব না। একে অন্যকে বাঁচিয়ে রাখাই এখন আমাদের আসল কাজ।'

জাল গুটিয়ে সেটাকে টেনে তুলল বুড়ো ডিঙির ওপরে। ঝকঝকে রুপোলি সার্ডিনে ভরে গেছে তার কালো নৌকোখানি। দাঁড়টা নৌকোর ভিতরে শুইয়ে টুপি খুলে চুট্টা বের করে চুট্টা ধরাল একটা। তারপর দাঁড়টাকে জালের বাঁ-বগলের নীচ দিয়ে জলে গলিয়ে দিয়ে চুট্টা টানতে টানতে সামুদ্রিক হরজাই গন্ধের মধ্যে ভেসে পাড়ের দিকে ছেড়ে দিল ডিঙিকে।

পাড় ক্রমশ কাছে আসতে লাগল। তুলি দিয়ে আঁকা রেখা, মোটা দাগের হয়ে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। গ্রীষ্মের ঝকঝকে রোদের মধ্যে সমুদ্রের কোলের তাল বন, ঝাউ বন, বালিয়াড়ি, পোড়োবাড়ি নুলিয়া-বস্তি, ব্যাকওয়াটারের জল। রোদ-ঝলমল সাদা ধবধবে হোটেলটি আর লাল-সাদা রংকরা বাতিঘরটির দিকে চেয়ে নেলিয়াপ্পানের হঠাৎই মনে হল, তার পৃথিবী যে এত সুন্দর তা এর আগে কোনোদিনও ও লক্ষ করেনি। হয়তো তেমন চোখে তাকায়ওনি এই চিরপুরোনো দৃশ্যের দিকে কখনো আগে।

অশান্তিমারুর দূত, নীল তিমি, বলে গেছে তাকে, 'ভালো থেকো, ভালোবেসো।'

যব খলিল খাঁ ফাকতা উড়াতে থে

এখন ভরা জোয়ার। জোয়ারের জলে বাণী গাছের লাল-খয়েরি শুকনো পাতা, গরান ঝোপের ডাল, চিরুনি চিরুনি শুকনো গোল পাতা ভেসে আসছে। বোটের গায়ে সড়সড় সিরসির করে আওয়াজ হচ্ছে। জোরে জল ঢুকছে সূতী খালগুলোতে। মনে হচ্ছে সমস্ত সুন্দরবন একটি ভাসমান গাছগাছালির মেলা। পাখপাখালি এখন বড়ো একটা চোখে পড়ে না। দুটো-একটা তীক্ষ্ণস্বর বাঁকা ঠোঁট কার্লু আর হরেক রকমের লাল নীল হলুদ সবুজ মাছরাঙা।

বোটের কাছেই কতকগুলো স্বাস্থ্যবান লালচে বাঁদর হুপহাপ করে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে যখন জোয়ার সম্পূর্ণ হয়নি, কেওড়া গাছের তলায় তলায় কাদার আস্তরণের উপর উঁচু উঁচু শুলোর মাঝে মাঝে পা ফেলে ফেলে তিনটি হরিণী এসে দাঁড়িয়েছিল। বড়ো বড়ো চোখ মেলে আমাদের নিরীক্ষণ করে একজনও হ্যান্ডসাম লোক দেখতে না পেয়ে আবার গুটিগুটি কেওড়া গাছের ছায়ায় ছায়ায় ফিরে গেছিল।

এখন দুপুর বেলা। সুন্দরবনে দুপুরের মতো এমন নিরালা-সুরেলা দুপুর আর বুঝি কোথাও নেই। শুধু জল আর জল-জঙ্গল আর জঙ্গল। জল নিস্তরঙ্গ। কিন্তু জলে বড়ো টান। কখনো ভাটায় টানছে, কখনো জোয়ারে। কখনো-বা অস্থিরমতি হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে জল। ছোটো ছোটো বড়ো বড়ো আবর্তের সৃষ্টি হচ্ছে। তার মধ্যে জলে-ভাসা কাঠকুটো, ফল-পাতা তলিয়ে যাচ্ছে। ছোটো ছোটো মাছ টুপ টুপ করে চারপাশে ডুব দিয়ে বেড়াচ্ছে। একটা শোল মাছকে তাড়া করেছে ভেটকিতে। জলের উপর পিছলেপড়া রুপোলি-শরীর সোনালি রোদ্দুরে ঝিকমিক করছে। রোদ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে একটি স্ট্র-হ্যাট মাথায় চাপিয়ে বোটের মাথায় বসে ছিপ ফেলেছি। এখানে সনি লিস্টনের সাইজের ভেটকি জলের তলায় আকছার ঘুরে বেড়াচ্ছে-বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নাক ঘষাঘষি করছে। একটা জীয়ন্ত মৌরলা মাছের টোপ

গেঁথে বসে আছি-আর জলের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে, হাওয়ার সঙ্গে মনে মনে নিরুচ্চারে কথা বলছি।

এমন সময় শুনতে পেলাম ওঁরা সকলে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম শেষ করে উঠলেন। ভাঁটি দিলে তখন নেমে গিয়ে মাচায় বসা ছাড়া আপাতত কারোই কিছু করণীয় নেই। বুলা বাবুয়া স্টোভ ধরিয়ে কফি বানাবার চেষ্টা আরম্ভ করল। প্রশান্তকাকু একবার গলা খাঁকরে কাশলেন। বাগচিবাবু বললেন, 'কী মশায় আপনিও কি একশো ফুট বাঘ মারলেন নাকি?' দুর্গাকাকু শুধোলেন, 'মানে?' বাগচিবাবু বললেন, 'জানেন না বুঝি সে গল্প?' বলেই শুরু করলেন।

'আগেকার দিনের রাজা-মহারাজা মাত্রই শিকারি। তবে তাঁদের মধ্যেও কিছু কিছু কুলাঙ্গার ছিলেন। তবু তাঁদেরও শিকারি না হয়ে উপায় ছিল না। এখনও যেমন অনেক আছেন। তখনও তেমন ছিলেন-কেতাবি শিকারি। নবাব অথচ একশো-দু-শো বাঘ মারেননি এমন বড়ো একটা দেখা যেত না। খেতের গেহু, বজরা কিতারির মতো জঙ্গলের বাঘও তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। অতএব তাঁরা শয়ে শয়ে কেন, হাজারে হাজারে বাঘ মারলেও কারও কিছু বলার ছিল না। ওইরকম একজন নবাবের কাছে তদানীন্তন একজন ইংরেজ শাসক শিকারে গেছিলেন। সব বন্দোবস্ত নবাবের মাইনে করা শিকারিই করে রেখেছিলেন। নবাবের নিজেরও যেতে হবে না শিকারে। কিন্তু বিপদ হল, ডিনারের সময় নিশ্চয়ই শিকারের গল্পসল্প হবে-তখন নবাব কী করবেন? শিকারের যে তিনি শ-ও জানেন না! অতএব নবাব বললেন, দেখো শিকারি, আমি আর সাহেব যখন খানা খাব তুমি তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং আমার কথাবার্তায় কোনোরকম বেচাল লক্ষ করলেই খুক খুক করে কাশবে। তখনই আমি বুঝতে পারব যে, নিজেকে শুধরে নেওয়া দরকার এবং সঙ্গেসঙ্গে শুধরে নেব।

'যথাসময়ে সাহেব এবং নবাব ডিনারে বসলেন। উমদা উমদা সব খাবার। কলিজা, চৌরি, পায়া, লাব্বা, চাঁব ইত্যাদি ইত্যাদি। খেতে খেতে সাহেব বললেন যে তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড়ো বাঘ যা মেরেছেন তিনি, তা হচ্ছে দশ ফুট দু-ইঞ্চি (between the pages)। তারপর প্রসঙ্গত জিজ্ঞেস করলেন, হিজ হাইনেসের মারা সবচেয়ে বড়ো বাঘ কত বড়ো? নবাব কিছুক্ষণ ভাবলেন। ভেবে দেখলেন যে, একজন মামুলি ইংরেজ সাহেব যদি দশ ফুট বাঘ মারে তো তাঁর অন্তত দু-শো ফুট বাঘ মারা উচিত। উনি বললেন, দু-শো ফুট। সাহেবের গলায় মুলিংগাটানি সুপ আটকে গেল। শিকারি পর্দার আড়াল থেকে খক খক করে আপ্রাণ কেশে উঠল। তখন নবাব বুঝলেন, কুছ গড়বড় হো গ্যায়া। তখন উনি রেশমি দাড়িতে নবরত্নের আংটি-পরা আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, আজ অনেকদিন হল, বোধ হয় ঠিক

মনে পড়ছে না; বোধ হয় বাঘটা দেড়-শো ফুট ছিল। শিকারি আবার কেশে উঠল। এবার নবাব কিঞ্চিৎ বিব্রত হলেন। বললেন, কী জানি হয়তো-বা একশো ফুটও হতে পারে। মনে পড়ছে না, অনেক দিনের কথা তো!

'শিকারি আবার কেশে উঠল ঘন ঘন, জোরে জোরে। নবাবের আর সহ্য হল না। বদতমিজির একটা সীমা থাকা দরকার। ফরাশ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মখমলে-মোড়া তাকিয়া ছুড়ে ফেলে দরজার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে শিকারিকে বললেন, কামবকত তু খাঁস খাঁসকে মরভি যাও গে, তব ভি হাম একশো ফুটসে কম কভি নেহি মারুংগা।'

গল্প শুনে এমন হাসির ফোয়ারা উঠল যে, জলের উপর দিয়ে তা হাড়িয়া ভাঙা নদী অবধি গড়িয়ে গেল। জলের তলায় হাঙ্গরেরা পর্যন্ত খুদে খুদে দাঁত বের করে হেঁ হেঁ করে হাসতে লাগল।

এমন সময় প্রশান্তকাকু বললেন, 'এ তো গেল নবাবের গুলগল্প। আমি একটা সত্যি গল্প বলছি। সে শিকারি এখনও কলকাতাতেই আছেন এবং দিব্যি শিকারকীর্তন করে চলেছেন।' প্রশান্তকাকু বন্দুকের দোকানের মালিক। সারাদিন ইচ্ছা থাকুক কি না থাকুক তাঁকে অনেক শিকারির শিকারকীর্তন শুনতে হয়। উপায় নেই কোনো।

'ভদ্রলোক দোকানে প্রায়ই আসতেন একসময়। আজকাল একেবারেই আসেন না। তবে পথে-ঘাটে কখনো-সখনো দেখা হয়ে যায়। ভদ্রলোকের গল্প বলার এমন একটা সুন্দর সাবলীল ক্ষমতা ছিল যে, তিনি যদি সূর্যকে চাঁদ বলতেন তবুও লোকে মুখের উপর বলতে পারত না যে, আজ্ঞে ওটা চাঁদ নয়। ভদ্রলোক বিত্তবান, রূপবান, বিলিতি ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি আছে একটি-সেটি নানারকম কাজে লেগেছে। নেমপ্লেটে, লেটারহেডে, ক্লাবে, পার্টিতে।

'একদিন আমার লক্ষ্ণৌওয়ালা এক বন্ধুর সঙ্গে দোকানে বসে আছি-সেই ভদ্রলোক এলেন। এবং প্রায় সঙ্গেসঙ্গে বহরমপুর থেকে এক ভদ্রলোক এলেন গুলি কিনতে।

'বহরমপুরের ভদ্রলোক বললেন, চার নম্বর গুলি দিন। বিলে শাল্টি নিয়ে কচুরিপানার পাশে চুপ মেরে বসে থাকি আর উড়ো পাখি মারি। আমার খালি চার নম্বর দরকার।

'উড়ো পাখি মারার কথা শুনেই আমাদের বড়ো শিকারি, ঠোঁটের কোনে কিং-সাইজ বিলিতি সিগারেটটি চেপে একটু মিষ্টি হাসলেন। বড়ো মিষ্টি হাসি-একেবারে রমণীমোহন। তারপর বললেন, সেসব দিন ছিল; উড়ো পাখি মারার দিন।

'এমনভাবে কথাটা বললেন যে, যে ভদ্রলোক গুলি কিনতে এসেছিলেন তিনি গুলির কথা ভুলে গিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। এবং একাগ্রতার সঙ্গে বড়ো

শিকারির দিকে চেয়ে রইলেন। বড়ো শিকারির চোখে-মুখে এমন একটি তুরীয় জ্যোতি ফুটে উঠল যে আমরা বুঝতে পারলাম, এবার ফ্ল্যাশব্যাক হবে।

'উনি শুরু করলেন। সেবার চিল্কায় গেছি রাজহাঁস মারতে। সঙ্গে লাট্টুগড় এবং টিকাইতিয়ার কুমারসাহেবরা। প্রত্যেকের হাতে ওভার-আন্ডার ডাবল ব্যারেল শটগান। শুটিং জ্যাকেট পরে পাশাপাশি কিছুদূর অন্তর অন্তর দাঁড়িয়েছি আমরা। কী মার কী মার। গুলি খায় আর পাখি লদলদিয়ে পড়ে। ঝাঁকের পর ঝাঁক রাজহাঁস উড়ে উড়ে আসছে আর আমরা মারছি। তবে ওদের কাছে আমি কিছুই নয়। লাট্টুগড় এমন কুইকশট ছিল যে, হোয়েন দি টোয়েন্টিয়েথ বার্ড ওয়াজ স্টিল ইন দি স্কাই হি ইউজড টু শ্যুট দি টোয়েন্টি ফার্স্ট। অর্থাৎ কুড়ি নম্বর পাখি আকাশেই উড্ডীন অবস্থায় মরে গেছে-তখনও মাটিতে পড়তে সময় পায়নি-ইতিমধ্যে একুশে পাখিকেও লাট্টু মেরে দিয়েছে।

'আমরা একটু চাপা বিস্ময় প্রকাশ করতেই উনি আমাদের ঠান্ডা করে ভুরু কুঁচকে মুখে তাচ্ছিল্য এনে বললেন, তবে লাট্টুগড়ও কিছু নয়, মারত টিকাইতিয়া। হি উড হ্যাভ শ্যট দি ফর্টিয়েথ বার্ড হোয়েন দি থার্টি-নাইনথ ওয়াজ স্টিল ইন দি স্কাই।

'বহরমপুরের ভদ্রলোক প্রায় মূর্ছা যাবার স্বরে বলে উঠলেন, আরেঃ সর্বনাশ, কী বলছেন গো!

'আমাদের আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই উনি বললেন, তবে ওই শুটেই একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেল। ওয়ালেস বলে একটা আর্মেনিয়ান ছোকরা আমাদের সঙ্গে ছিল-গাড্ডনের গেস্ট। ওর পজিশান ছিল আমার পরেই। একটা চামড়ার শুটিং জ্যাকেট পরে ছোকরা বারবার ওর নিজের ফায়ারিং লাইন ক্রস করে আমার দিকে ব্যারেল নীচু করে গুলি করছিল। ঝরঝর করে ছররা এসে আমার চারপাশে পড়ছিল।

'ওকে আমি বার তিনেক মানা করলাম। বললাম, লুক, ইউ ইয়ং পিগ। ইউ বেটার টেক কেয়ার অব ইয়োরসেলফ। কিন্তু নাথিং-ডুয়িং। হি কেপ্ট অন প্লেয়িং দি ন্যাস্টি ট্রিক। অ্যান্ড দেন হি হ্যাড ইট ফ্রম মি।

'আমরা আতঙ্কে শুধোলাম, মেরে ফেললেন? উনি একটু হাসলেন-জেমস বন্ড হাসি। তারপর চোখ নাচিয়ে বললেন, প্রায়।

'বন্দুক তুলে ব্যারেল অ্যালাইন করে-দুটো ব্যারেলই ছেড়ে দিলাম-ব্যাং ব্যাং। ট্রিগার টানার আগে চেঁচিয়ে বললাম, ওয়াচ আউট ওয়ালেস, তারপরই ব্যাং ব্যাং। বাট অ্যাজ লাক উড হ্যাভ ইট-ব্যাটার কিছুই হল না। লেদার জ্যাকেটের জন্যেই বেঁচে গেল। কয়েকটা স্কিনডিপ উন্ড হয়েছিল মাত্র। সেদিন থেকে গাড্ডন বা টিকাইতিয়া কারও সঙ্গেই আর যাই না শিকারে।

'এমন সময় আমার সেই লক্ষ্ণৌওয়ালা বন্ধু বড়ো শিকারিকে বলল, ভাইসাব, উ জমানা চলা গয়া। বড়ো শিকারি একটু উদবিগ্ন স্বরে শুধোলেন, কৌন জমানা? দোস্ত বলল, উ জমানা চলা গ্যয়া যব খলিল খাঁ ফাকতা উড়াতে থে। অর্থাৎ ওসব দিন চলে গেছে, যখন খলিল খাঁরা পায়রা ওড়াতেন।

'বড়ো শিকারি হঠাৎ হাতঘড়ি দেখে বললেন, চলি, বড্ড দেরি হয়ে গেল। আমি শুধোলাম, অত তাড়া কীসের? উনি একটু হাসলেন, বললেন, যেতে হবে শেয়ালদায়। সেখানে বনগাঁ থেকে একদল শরণার্থী এয়েছে-তাদের খিচুড়ি পরিবেশন করতে হবে। বলেই থ্রিপিস সুট পরে খিচুড়ি পরিবেশন করতে চলে গেলেন।'

ম্যাথস

১

বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশে চড়ার অঙ্কই হোক, কি চৌবাচ্চার জল ফুরানোর হিসেবের অঙ্কই হোক, কোনো অঙ্কই আমার ঠিক হত না। এমনকী, সামান্য যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগেও ভুল হত। অক্ষয়স্যার আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই তো ছিলেনই, ম্যাথস-এ কাঁচা বলে বাবা ওঁকে বাড়িতেও পড়াতে বলেছিলেন আমাকে। টকটকে ফর্সা রং ছিল ওঁর। খোঁচা খোঁচা কালো গোঁফ। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতেন। গায়ে একটি এন্ডির চাদর থাকত। পায়ে পাম্পশু।

টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারে বসে আমার খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে অঙ্কের ফল দেখতে দেখতে ওঁর মুখ বিরক্তিতে ভরে উঠত। ভুরু কুঁচকে যেত। বলতেন, 'ই-ইটা কী?'

কখনো-বা গম্ভীর গলায় বলতেন, যেন টেবিল-চেয়ারকেই বলছেন, 'আর কতবার বলতে হবে তোমাকে যে, সংখ্যাকে না বদলে তা কেটে পাশে পরিষ্কার করে লিখবে?'

আমি মুখ নীচু করে থাকতাম। ভীষণ কষ্ট হত বুকের মধ্যে!

অক্ষয়স্যার যখন আমাকে বকতেন, মারতেনও কখনো, তখন আমার অত কষ্ট হত না। কিন্তু ওঁর মুখে যখনই বিচ্ছিরি বিরক্তির ভাব ফুটে উঠত, সেই মুখে আমি স্পষ্টই পড়তে পারতাম, আমি একটি গাধা। এবং উনি আমাকে নিয়ে রীতিমতোই নাজেহাল। অথচ টিউশনিরও দরকার নিশ্চয়ই ছিল তখন ওঁর। তাই বলতেও পারতেন না বাবাকে যে, আমাকে আর পড়াবেন না।

ওঁর একমাত্র ছেলে গোপেনদা ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন। ওঁর জন্যে অক্ষয়স্যারের গর্বের অন্ত ছিল না।

উনি চলে গেলে অনেকক্ষণ একা ঘরে আমি বসে থাকতাম। নিজের উপর বড়োই রাগ হত। অথচ কী করব? অঙ্ক আমার একেবারেই ভালো লাগত না। কবিতা লিখতে, ছবি আঁকতে, গান গাইতে ভালো লাগত। কিন্তু ওইসব তো গুণের মধ্যে পড়ত না। যে গুণ ভাঙিয়ে টাকা রোজগার না করা যায়, তা কি আর গুণের মধ্যে পড়ে?

বাবা অফিস থেকে ফিরলেই শব্দ পেতাম। গ্যারাজ ছিল এক-তলাতেই, আমার পড়ার ঘরের পাশেই। অফিস থেকে ফিরেই বাবা একবার আমার ঘরে ঢুকতেনই। বলতেন, 'খোকন, কেমন হচ্ছে পড়াশোনা? পরীক্ষা তো এসে গেল।' কোনোদিন বলতেন, 'আমি তো জানিই, তুই স্কলারশিপ পাবিই। তবে স্ট্যান্ড করলে আরও খুশি হব।'

বাবাকে আমি ভালোবাসতাম খুবই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে বাবার এমন উঁচু ধারণায় কুঁকড়ে যেতাম। আপত্তিও করতে পারতাম না। বলতে পারতাম না যে, আমি হয়তো ফার্স্ট ডিভিশনই পাব না।

নিজের ছুড়ে দেওয়া কথাতে নিজেই খুশি হয়ে, দোতলায় উঠে যেতেন বাবা আমাদের ফক্সটেরিয়ার কুকুর 'ম্যাডা'কে আদর করতে করতে। বাবার গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ পর্যন্ত চিনত ম্যাডা। গাড়ি যখন রাস্তায় এবং আর কেউই যখন বুঝতে পর্যন্ত পারত না, ম্যাডা তখন উত্তেজিত গলায় ডাকতে ডাকতে দোতলা থেকে তার পায়ের নখে খচর খচর আওয়াজ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে তড়িদগতিতে নেমে এসে গ্যারেজের সামনে ছুটোছুটি করত।

বিহারের মধুবনী জেলার এক রংরুট ড্রাইভার সুরজনারায়ণ ঝা, অতি উত্তেজিত ম্যাডার একটা পায়ের উপর চাকা তুলে দিয়ে সামনের বাঁ-পাটাকে একবার প্রায় ভেঙেই দিয়েছিল একদিন।

বাবা উপরে চলে যাওয়ার পর আরও খারাপ লাগত। অক্ষয়স্যার পড়ালে গোরু, গাধাও নাকি ফার্স্ট ডিভিশন পায়। আমি অন্য সব বিষয়ে খুব ভালো না হলেও, অঙ্কের মতো অতটা খারাপ ছিলাম না। তাই অঙ্কের দায়িত্ব অক্ষয়স্যারের হাতে তুলে দিয়ে বাবা নিশ্চিত হয়ে যা খুশি তাই ভাবছিলেন।

বন্ধুদের কাছেও শুনতাম যে, তাদের সকলের বাবাও নাকি ওইরকমই বলতেন। প্রত্যেকের মায়েরাই বলতেন, 'তোর বাবা কোনোদিন ক্লাসে সেকেন্ড হয়নি। আর তুই?'

আমার বন্ধু প্রণব একদিন দুঃখ করে বলেছিল, 'ভেবে দেখ সক্কলের বাবাই যদি ক্লাসে ফার্স্ট হতেন, তাহলে ওঁদের সময়ে ক্লাসে সেকেন্ড হতেন কে বল তো?'

প্রীতি বলেছিল, 'আর ফেলই-বা করতেন কারা? আমি তো ভেবেই পাই না।'

২

অক্ষয়স্যার সপ্তাহে তিন দিন আসতেন। তাঁর বিরক্তি আর আমার হতাশা ও অপরাধবোধ ক্রমশ বেড়েই চলেছিল।

একদিন এক টিপ নস্যি নিয়েই উনি আমাকে বললেন, 'খারাপ ভালোর অনেকরকম হয় বুঝেছ? তোমার মতো ছেলে আমি আর দেখিনি। তোমার বাবা মিছেই তোমার পেছনে পয়সা খরচ করছেন। আমি এবার তোমার বাবাকে বলব। তোমার মতো দু-চারটি ছাত্র পেলেই আমার এতদিনের সুনাম ডুববে। এত সোজা অঙ্ক, তাও তুমি...'

আমি মাথা নীচু করেই ছিলাম। অনেক ছেলে, বাবা-মায়ের কাছে রিপোর্ট লুকোয়, পাছে তাঁরা মারেন, বকেন। আমি কখনোই লুকোইনি। অক্ষয়স্যার আমার কথা বাবাকে বলে দিলেও বাবা আমাকে কিছু বলতেন না, কিন্তু বড়ো দুঃখ পেতেন নিশ্চয়ই। বাবাকে ভালোবাসতাম বলে বাবা দুঃখ পান, তাও চাইতাম না। অথচ আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেও তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের ওঠার অঙ্ক বা চৌবাচ্চার জল ফুরানোর অঙ্ক কিছুতেই করতে পারতাম না। সেই সময় কোনো রবীন্দ্রসংগীতের কলি কানের পাশে ঘুরঘুর করত। চোখের সামনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর রাজা দোবরুপান্না বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র হোসেন মিঞার মুখ ভেসে উঠত। আলজেব্রাও একদম ভালো লাগত না। জিয়োমেট্রি একটু ভালো লাগত। মনে হত ছবি আঁকছি। কিন্তু থিয়োরি এলেই মাথা একেবারে গোলমাল হয়ে যেত। আমি পরীক্ষায় ভালো ফল না করলে যে, বাবা দুঃখ পাবেন-এই কথাটা ভেবেই আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসত। বাবার দুঃখ পাবার ভয়ে নিজে আগেভাগে এত দুঃখ পেতাম যে, তা বলবার নয়। বাবার মস্ত কারখানার ভার তাঁর একমাত্র ছেলে নেবে এই-ই ছিল বাবার ইচ্ছে।

ভালো ছাত্র ছিলাম না বলেই স্কুলের কোনো মাস্টারমশাই ভালো চোখে দেখতেন না আমাকে। যদিও ব্যবহার এবং স্বভাব, পড়াশোনোর তুলনায় একটু ভালো ছিল বলে কেউ খারাপ বলতেন এমনও নয়। আমি জানতাম যে, শিশির অথবা অনিমেষ, সকলেই ছাত্র হিসেবে আমার চেয়ে অনেকই ভালো ছিল। কাটু, বান্টা, এরা সব পড়াশোনাতে শিশিরদের মতো ভালো না হলেও খেলাধুলার জন্যে আলাদা একধরনের সম্মান পেত স্যারদের কাছ থেকে। পুরো স্কুলে ছেলেরাও তাদের হিরো-

জ্ঞানে দেখত। কাটুর তো তখন এতই কদর ফুটবলে যে, চার ফুট দশ ইঞ্চি হাইটের ম্যাচ হলেই এক বিকেলে চার-পাঁচ জায়গায় ওকে ভাড়া করে নিয়ে যেত বিভিন্ন ক্লাব। ওর নিন্দুকেরা বলত, ও নাকি এক কাপ চা ও বিস্কুট পেলেই ভাড়ায় খেলে দেয়। কাটু বিকেলের প্রথম খেলাতে নেমেই গোটা ছয়েক গোল দিয়ে তাদের এগিয়ে রেখে অন্য ম্যাচে গিয়ে পটাপট গোল দিয়ে আবার প্রথম ম্যাচের জায়গায় গিয়ে দেখত, প্রতিপক্ষের স্ট্রাইকাররা গোল শোধ করে দিয়েছে কি না। যদি ছ-টার বেশি গোল তারাও দিত, তবে কাটু তক্ষুনি গোটা দুই-তিন গোল দিয়ে সেই ম্যাচের ইতি টানত।

প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিন শিশির এত বই পেত প্রাইজ হিসেবে, যে, একা বয়েই নিয়ে যেতে পারত না। তিন-চারজনের সাহায্য লাগত। স্পোর্টসের প্রাইজের দিনও অন্যান্য ছেলেরা কত মেডেল, কাপ সব পেত।

জীবনে কি পড়াশোনাতে, কি স্পোর্টসে, কোনোদিন একটিও প্রাইজ পাইনি। রেজাল্ট বেরোবার দিন, প্রাইজের দিন, বড়ো মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরতাম। এই ভেবে সান্ত্বনা দিতাম নিজেকে যে, আমরাই তো দলে ভারী। যারা প্রাইজ পেল, তারা ক-জন? তবুও বড়ো, ছোটো, সাধারণ, ভিড়ের মধ্যের একজন বলে মনে হত নিজেকে। কোনো কোনোবার প্রাইজ ডিসট্রিবিউশনের অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলা হত আমাকে। সে গান আমার মা-ই শিখিয়ে দিতেন। গানও কিছু আহামরি গাইতাম না। অমন গান সকলেই গাইতে পারত।

কেবলই ভাবতাম, আমি খারাপ। আমি কোনো কিছুতেই ভালো নই। ফার্স্ট বয়দের মতো লাস্ট বয়দেরও একটা আলাদা পরিচয় থাকে, বৈশিষ্ট্য থাকে। আমার তাও ছিল না। যে বয়সে প্রত্যেকেই ইমপর্ট্যান্ট হতে চায়, সেই বয়সে তখন আন-ইমপর্ট্যান্ট হয়ে থেকে মরমে মরে যেতাম।

আমাদের ক্লাসের লাস্ট বয় গজু। বয়সে সে আমার চেয়ে অন্তত চার-পাঁচ বছরের বড়ো ছিল। একই ক্লাসে ছিল পাঁচ বছর। গতবার ফাইনাল পরীক্ষায় বাংলা পরীক্ষার দিনে আমার পাশেই সিট পড়েছিল গজুর। ও ঘাড় নীচু করে আমার কানে মুখ ঠেকিয়ে গরম নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'বিপ্রকর্ষ কী রে?'

গার্ড ছিলেন নরুস্যার। দুষ্ট ছেলেরা তাঁকে ডাকত 'ঘাড়-ছোটো নরুস্যার' বলে। গজুর কথাতেই আমার দিকে তাকিয়েছিলেন উনি। ওঁর অভ্যাস ছিল ক্লাসের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি পায়চারি করে বেড়ানো। ক্লাসে পড়াবার সময়ও অমনই করতেন। গার্ড দেবার সময়ও তাই করেছিলেন। উনি যেই দূরে চলে গেলেন, গজু ফিসফিস করে বলল, 'তোর পেট যদি আজ ছুরি দিয়ে না ফাঁসাই, তো আমার নাম গজশোভা রায় নয়।'

সেকথা শুনেই আমার পিলে চমকে গেল। গলা শুকিয়ে এল। কানাঘুষোয় আমি শুনেছিলাম যে, গিরিশ পার্কের পাশে ও একটি মরচে-পড়া ছুরি দিয়ে একটি ছেলেকে খুন করেছিল। মরচে-পড়া ছিল বলে ছেলেটাকে বাঁচাতে পারেনি ওর মা-বাবা অনেক চেষ্টা করেও। কিন্তু গজুর বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। তাই কিছুই হয়নি ওর।

ঘাড়-ছোটো নরুস্যার কথাটা শুনে ফেললেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গজু, কেন ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছ? বিপ্রকর্ষর মানে জানতে চাও তো আমিই বলে দিচ্ছি। কিন্তু এই একটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক লিখলেই কি তুমি পাশ করে যাবে এবারে?'

গজু নরুস্যারকে ধমকে বলল, 'স্যার আমি অলরেডি চটে আছি। আমাকে আর চটালে কার পেট যে ফাঁসবে তার ঠিক নেই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটু নস্যি নেবে?' বলেই ঘাড়-ছোটো নরুস্যার গজুর কাছে গিয়ে ওকে নস্যি অফার করলেন। গজু রেগুলার নস্যি নিত। স্যারের ডিবে থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে কিছুটা আমার নাকে উড়িয়ে একটি নোংরা রুমাল বার করে নাক ঝাড়ল।

সেই মুহূর্তে ভালো ছাত্র শিশির সম্পর্কে যেরকম সম্ভ্রম ছিল আমার মনে, খুনি এবং ওঁচা ছাত্র গজু সম্পর্কেও, তার দুর্দান্ত প্রতাপ দেখে, ঠিক সেরকম নয়, তবে অন্য একরকম সম্ভ্রম জাগল। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, জীবনে বিশেষ কেউ হতে হলে খুবই ভালো হতে হবে। এখানে মাঝামাঝিদের কোনো পরিচয় নেই, দামও নেই। খুব ভালো যদি না হওয়া যায়, তাহলে খুব খারাপ, গজুর মতো হওয়াও বোধ হয় ভালো। কিছু না হয়ে থাকার চেয়ে তবু কিছু একটা হওয়া হল। আমাদের বন্ধু রাজেন যেমন 'কিছু' হল সেদিন রাস্টিকেটেড হয়ে। বাবার আলমারি ভেঙে টাকা নিয়ে সে বোম্বে যেতে চেয়েছিল সিনেমায় নামবে বলে। খড়্গপুরেই পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে আসে তাকে। বোম্বেও যাওয়া হল না, রাস্টিকেটেডও হল।

৩

যেদিন স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বেরোল, সেদিন বাথরুমে গিয়ে খুব কাঁদলাম। আমার চেয়ে বেশি কাঁদলেন মা। এবং মাকে অপদার্থ ছেলের জন্য কাঁদতে দেখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল।

সন্ধ্যের পর অক্ষয়স্যার এলেন। আমি পড়ার ঘরেই ছিলাম। ট্যাবুলেটরের কাছ থেকে উনি মার্কস জেনে এসেছিলেন। যেহেতু অঙ্কই পড়াতেন, অঙ্কের মার্কসই শুধু জেনেছিলেন। ওঁর মুখে আমার প্রতি সেই ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর অধৈর্য চিরদিনই ছিল।

সেইসব আবারও তীব্র ঝলকে ফুটে উঠল। পথের ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকে যেমন নাকে রুমাল চাপা দেন, তেমন করে আমার খারাপত্বর গন্ধও যেন ওঁর নাকে লেগে ওঁকে ভীষণ পীড়িত করছিল। নস্যি-মাখা রুমাল দিয়ে নাক চাপা দিলেন উনি।

মুখটি নীচু করেই রইলাম আমি। এ মুখ কাউকেই দেখানোর নয়।

অক্ষয়স্যার বললেন, 'তুমি আমার লজ্জা। তোমার মতো গোটা দুই ছেলে যদি আমার লিস্টে থাকে, তবে আমার প্রাইভেট টিউটর হিসেবে যে সুনাম, তা একেবারেই উবে যাবে। তোমার বাবাকে বোলো, অন্য টিউটরের খোঁজ করতে। তুমি পঁয়তাল্লিশ পেয়েছ। বুঝেছ? ইয়ে! পঁয়তাল্লিশ! আর অ্যাডিশনাল ম্যাথস-এ পেয়েছ পঁচিশ। ছোঃ ছোঃ। অ্যাডিশনাল ম্যাথস! শখ কত্ত। কী স্পর্ধা! আর শোনো, ফার্স্ট ডিভিশনও জোটেনি কপালে। দশ নম্বর কম আছে।'

আমি মুখ নীচু করেই রইলাম।

অক্ষয়স্যার হঠাৎ একটিপ নস্যি নিয়ে উঠে পড়েই বললেন, 'তোমার বাবাকে কোন মুখে ফেস করব? উনি আসার আগেই আমি উঠছি। বাবাকে বোলো, তোমার ব্রিলিয়ান্ট মার্কসের কথা। ছিঃ ছিঃ! কী বাবার কী ছেলে! লজ্জা, লজ্জা! তুমি আমার ছেলে হলে...।'

হলে যে কী করতেন, সেটা না বলেই এগোলেন। গোপেনদা যে আমার চেয়ে কত ভালো তা আমি জানতামই। ও কথা ওঁর বলার দরকার ছিল না। চলে যেতে গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, 'তোমার বাবা আমাকে যদি কিছু বলেন, তাহলে আমি কিন্তু ওঁকে ভালো করেই শুনিয়ে দেব, গাধা-পিটিয়ে ঘোড়া নিশ্চয়ই করা যায়, কিন্তু তু-তু-তুমি তো...।'

চলে গেলেন উনি।

টেবিল লাইটটা জ্বলছিল। আমি টেবিলের উপরেই দু-হাতের মধ্যে মাথা পেতে শুয়েছিলাম। একটু পরই হঠাৎ ম্যাডার ঘন ঘন চিৎকারে চমকে উঠলাম। শুনতে পেলাম বাবার গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকল। ড্রাইভার বাহাদুর জিজ্ঞেস করল বাবাকে, কাল সকালে কখন আসবে? তারপর চাবি দিয়ে, 'সেলাম সাহাব', বলে চলে গেল।

ম্যাডা লাফাতে লাফাতে বাবার পায়ে পায়ে আমার ঘরে এসে ঢুকল। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। বাবা আমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝলেন। বললেন, 'কী খোকন? মনটা খারাপ মনে হচ্ছে। হলটা কী?'

আজ যে স্কুলে ফাইনালের রেজাল্ট বেরোবে তা বাবা জানতেন। কিন্তু আমি যে স্কলারশিপ পাবই তা যেন উনি ধরেই নিয়েছিলেন। সামান্য অবাক হয়ে বললেন, 'কী? ভালো হয়েছে ফল?'

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কোনো রকমে আমি বললাম, 'সেকেন্ড ডিভিশন।'

বলতে চাইলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না যে, অঙ্ক আমার কোনোদিন ভালো লাগেনি বাবা। তুমি মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করলে অক্ষয়স্যারকে রেখে।

'ও!' বাবা বললেন।

তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকেই বলেন, 'ম্যাথস কীরকম হল?'

'ম্যাথস-এ পঁয়তাল্লিশ। আর অ্যাডিশনাল ম্যাথস-এ পঁচিশ।' বলেই আমি দু-হাতে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলাম। বাবা আমার কাছে এসে পিঠে হাত রাখলেন।

একটুক্ষণ পর গলা তুলে জগুকে ডাকলেন।

জগু গেট ছেড়ে ভেতরে আসতেই বাবা বললেন, 'মাকে বল, আমি নিউ মার্কেটে যাচ্ছি। মাটন আনব আর গলদা চিংড়ি। পোলাও রাঁধতে বল। তোরা কী রে? খোকন আজ পাশ করেছে পরীক্ষায়, তোরা জানিস না? এই নে জগু, তুই একশো টাকা রাখ, আজ খুশির দিন।'

বলেই বললেন, 'চল খোকন। জগু, তুই ম্যাডাকে ধর। নইলে ঝামেলা করবে।'

বাবা নিজেই গাড়ি বের করলেন গ্যারাজ থেকে। সামনের বাঁ-দিকের দরজা খুলে দিলেন। ওই সিটে মা বসেন। আমি বসে পড়েই দরজা বন্ধ করে দিলাম।

জগুদা গেট খুলে দিল। বাবা গাড়ি চালিয়ে চললেন নিউ মার্কেটের দিকে। বললেন, 'এই রে! চিংড়ি মাছ তো তোর মা ভালোবাসেন। তুই তো ভালোবাসিস ভেটকি মাছের ফ্রাই। চল, দেখি। পেয়ে যাব ঠিকই। এখন ফ্রাই পিস করে কাটার লোক পাব কি না সেই হচ্ছে কথা!'

আমি চুপ করেছিলাম। আমার ভীষণ জোরে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু চলন্ত গাড়ির মধ্যে কাঁদলে লোকে কী ভাববে?

পার্ক স্ট্রিটে পড়েই বাবা বললেন, 'তোর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত আমার। উচিত কেন, চাইছিই ক্ষমা। বুঝলি খোকন!'

'কী বলছ বাবা?' আমি হতভম্ব হয়ে বললাম।

'হ্যাঁ, তোর ইনক্লিনেশান ছিল আসলে আর্টসেরই দিকে। প্রথম থেকেই লিটারেচারে তুই তো ভালোই। আসলে লিটারেচার হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সাবজেক্ট। আমরা তো হলাম গিয়ে মিস্তিরি। সে ইঞ্জিনিয়ারই বল, আর অ্যাকাউন্টেন্টই বল। জজ বল, ব্যারিস্টার বল, ডাক্তার বল-যিনি সাহিত্য না পড়েছেন বা পড়েন, বা সাহিত্যের খোঁজ না রাখেন, তিনি আসলেই অশিক্ষিত। সাহিত্যই হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের মনের সবচেয়ে বড়ো এক্সপ্রেশান।'

একটু থেমে বললেন, 'এত বড়ো ফ্যাক্টরিটা করেছিলাম। তুই ছাড়া আমার তো কেউই নেই। একমাত্র সম্বল তুইই। আজকাল কত সব কথা শুনেছি। বিদেশে কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে সব ব্যাপারেই। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি প্রতিদিন কোথায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে, মানে, মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ডে। ভেবেছিলাম, সায়েন্স নিয়ে পড়লে তোর পক্ষে...। যাক গে, মাই লাইফ ইজ মাই লাইফ, অ্যান্ড ইয়োর লাইফ ইজ ইয়োরস। তুই যা হতে চাস খোকন, তাই-ই হয়ে ওঠ জীবনে। আমি তোকে আর ভুল পথে চালাব না। আই অ্যাম সরি। রিয়েলি আই অ্যাম।'

নিউ মার্কেটের সামনেটা তখন ফাঁকা। আলো প্রায় সব নিবে গেছে। ফুলের দোকানগুলো খোলা আছে শুধু। তাও বাইরে ঝাঁপ নামানো। গ্লোব সিনেমার সামনে একটা বিরাট হোর্ডিং। সিনেমার বিজ্ঞাপন। ছবির নাম 'আই উইল ক্রাই টুমরো।'

বাবা একটু পরেই মুটের মাথায় বাজার নিয়ে ফিরে এলেন। আমি তাড়াতাড়ি নেমে বাবার হাত থেকে চাবি নিয়ে গাড়ির বুটটা খুললাম। মাল সব রেখে বাবা মুটেকে পাঁচ টাকা দিলেন। মানুষটি বলল, 'ছুটা নেহি সাহাব।'

বাবা বললেন, 'আমার ছেলে আজ পরীক্ষায় পাশ করেছে। কলেজে যাবে। তোমাকে বকশিশ দিলাম।'

মানুষটি একটু অবাক হয়ে মাথায় হাত ঠেকাল।

গাড়িটা ময়দানের দিকে নিয়ে চললেন বাবা। ময়দানে পৌঁছে বললেন, 'পোলাও হতে হতে আমরা পৌঁছে যাব কী বল? তোর মা আছেন, নগেন আছে, জগু আছে, রাঁধতে কত সময় লাগবে? চল, একটু পায়চারি করি।'

বাবা গাড়িটার পাশেই সামনে-পিছনে হাঁটবেন বলে মনে হল। একটু হেঁটে বললেন, 'নাঃ চল তোর মা ভাববেন। যেতে যেতেই তোকে গল্প বলব।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তুই মেন্ডহেলসনের নাম শুনেছিস?'

'না তো!'

'সে কী রে? একটি বই আছে ওঁর জীবনী নিয়ে লেখা, নাম 'বিয়ন্ড ডিজায়ার'। পিয়ের ল্যা মূর-এর লেখা। তোকে কিনে দেব। পড়িস। সেদিন তুই মোৎজার্ট-এর রেকর্ড নিয়ে এসেছিলি সম্বিৎদার বাড়ি থেকে। বিটোভেন শুনিস প্রায়ই, আর মেন্ডহেলসনের নামই শুনিসনি?'

'শুনিনি।' আমি বললাম নির্লজ্জের মতো। পরীক্ষাতে এত বাজে রেজাল্ট করার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েই।

'ফেলিক্স। নাম ছিল তাঁর ফেলিক্স মেন্ডহেলসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের ইউনাইটেড জার্মানির সবচেয়ে বড়ো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, সবচেয়ে বড়ো ব্যাঙ্কার ছিলেন ওঁর বাবা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়োলোকদের মধ্যে একজন। ফেলিক্সের বাবার নাম

কিন্তু ভুলে গেছি। ফেলিক্সও ছিলেন তোরই মতো, তাঁর বাবার একমাত্র সন্তান। ফেলিক্স খুব আর্টিস্টিক ছিলেন। দারুণ পিয়ানো বাজাতেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল যে, উনি কম্পোজার হবেন। পিয়ানোতে নতুন নতুন সুর সৃষ্টি করবেন।

'সে ব্যাবসা দেখবে না, এই কথা শুনে বাবার মাথায় তো আকাশই ভেঙে পড়ল। ছেলেও নাছোড়বান্দা। মায়ের কিন্তু খুবই ইচ্ছে ছিল যে, ছেলে কম্পোজার হোক। আসলে মায়েরা সন্তানদের যতখানি বোঝেন, বাবারা কখনো ততখানি বোঝেন না। তোর মা-রও কিন্তু উচিত ছিল, তোর আসল ভালোলাগা কোনদিকে, তা আমাকে জানানো। জানালে, তোর মন আজ খারাপ হত না। জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষাতে ফল খারাপ করতিস না।

'যাই হোক, ফেলিক্সের মায়ের ইচ্ছে যেরকমই হোক, তাঁর বাবার বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য। শেষে বাবা তো ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করার ভয়ও দেখালেন। বললেন, তোমাকে সম্পত্তির এক কণাও দেব না, যদি আমার ব্যাবসাতে না আসো। সাবধান।'

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে এসে ট্রাফিক লাইটে গাড়িটা দাঁড়াতে বাবা বললেন, 'ফেলিক্স কিন্তু শুনলেন না। যে একবার গান-বাজনার জগতের স্বাদ পেয়েছে, সাহিত্যের রসের আস্বাদ পেয়েছে, তার কাছে টাকাপয়সা কী? চলে গেলেন সব ছেড়ে। যা হতে চেয়েছিলেন, তাই-ই হতে। রাজার চেয়েও বড়োলোক বাবার ছেলে, অতি অল্প বয়সেই যক্ষ্মা হয়ে মারা গেলেন, একটি আন-হিটেড ঘরে। ইউরোপের সব জায়গাতে তো হিটিং ছিল না তখন ঘরে ঘরে। যক্ষ্মারও চিকিৎসক ছিল না বিশেষ। কিন্তু ওই বয়সেই ফেলিক্স যা করে গেলেন, টাকা রোজগার করে নয়, কিছু করার মতো করে।

'আজ পৃথিবীর মানুষ কিন্তু ফেলিক্স মেন্ডহেলসনের বাবাকে বেমালুম ভুলে গেছে, আর যদি-বা মনেও রেখেছে, তাও ফেলিক্সের বাবা হিসেবেই। প্রচণ্ড পয়সাওয়ালা মস্ত ব্যাবসাদার, দারুণ ক্ষমতাবান তো কত মানুষই আসে-যায় পৃথিবীতে। কিন্তু তাদের মনে রাখে কে? যদি-বা কেউ রাখেও, ভালোবেসে মনে রাখে, তাদের মধ্যে খুব কম মানুষকেই, মনে রাখে ঘৃণায়। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে, বুঝলি না!'

'আমি যে কোনো কিছুতেই তত ভালো নই বাবা! আমি যে মাঝামাঝি, মিডিওকার।' অসহায়ের মতো বললাম আমি।

বাবা আমার কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাই তো জীবনের একমাত্র পরীক্ষা নয়, খোকন। যতদিন মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, ততদিন, প্রত্যেকদিনই তাঁকে অনবরত পরীক্ষায় বসতে হয়। যতই দিন যাবে, ততই এই কথা বুঝতে পারবি। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় যারা ফার্স্ট হয় এবং

লাস্টও, তাদের মধ্যে বেশিরভাগকেই কিন্তু জীবনের মঞ্চে খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনের বড়ো বড়ো পরীক্ষাতেও ওপরে উঠে আসে এই মাঝামাঝিদের ভিড়ের ভেতর থেকেই, কেউ কেউ। যারা ননডেসক্রিপ্ট। জনতা বলি আমরা যাদের।' বলেই বললেন, 'চল, ফিরি এবার।'

বাবা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করবার পর আমি বললাম, 'আমি যে এত খারাপ করলাম, তুমি দুঃখ পাওনি? মা খুব কেঁদেছে।'

বাবা হেসে বললেন, 'তোর মা একটুতেই কাঁদেন। কাঁদলে চোখের মণি উজ্জ্বল হয় কিনা! তাই তোর মা কথায় কথায় কাঁদেন। যাঁরা সুন্দর মানুষ তাঁরাও ওরকম অনেক কিছু করেন আরও সুন্দর হওয়ার জন্যে।'

'আমার কথার উত্তর দিলে না তুমি বাবা?'

'আমি? না না, দুঃখ পাইনি। তবে অবাক হয়েছি। রেগে গেছি। সেটা তোর ওপরে নয়। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে। তোর মাস্টারমশাই অক্ষয়বাবুর ওপরে। আমার নিজেরও ওপরে। আমার উচিত ছিল, তোকে একটা ভালো ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ভরতি করে দেওয়া। আমার পক্ষে মোটেই তা অসুবিধের ছিল না। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে, আমার দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ে যে শিক্ষার সুযোগ পায়, আমার ছেলেই-বা তাদের থেকে বেশি সুযোগ পাবে কেন? তা ছাড়া বাংলা তো আমাদের মাতৃভাষাই। বেশিরভাগ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই বাঙালিদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, গান-বাজনা পরোক্ষে নষ্ট করে দেওয়া হয়। তুইও তেমন হয়ে উঠিস, তা আমি চাইনি...চেয়েছিলাম বাঙালি হবি।'

'আমি আসলে বাজে ছেলে। আমার কিছুই হবে না। স্কুল ফাইনালেই যে খারাপ করল, তার কাছে তো জীবনের সব দরজাই বন্ধ। এই পরীক্ষাই তো প্রবেশিকা।'

হাঃ হাঃ করে হাসলেন বাবা। বললেন, 'তোর নিজের কাছেও কি বন্ধ? আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটা তোতাপাখির শিক্ষা। এখানের অধিকাংশ পণ্ডিতদেরই শিক্ষার গুমোর আছে, দম্ভ আছে, প্রকৃত শিক্ষা নেই। তা ছাড়া শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে গেছে টাকা রোজগার। টাকা যাতে রোজগার করতে পারে, যেসব লাইনে বেশি টাকা আছে, সেইসব লাইনেই ভিড়। আমি চাই না তুই তেমন শিক্ষিত হোস, চাই না যে তুই টাকার অঙ্কের সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে, শিক্ষাকে গুলিয়ে ফেলিস। সত্যিই আমি চাই না। আমাদের দেশে টাকাওয়ালারা কোনোদিন সম্মান পায়নি। পাওয়া উচিতও ছিল না। আজ যে পাচ্ছে, তা এই ফালতু শিক্ষার ভুল চাহিদার দোষেই। সরস্বতীর সাঁকো বেয়ে লক্ষ্মীর দরজায় পৌঁছোতে চাইছে প্রত্যেকেই। আর লক্ষ্মী যেখানে থাকেন, সরস্বতী সেখান থেকে অভিমানে সরে আসেন। আমি কিছু মনে করিনি রে, খোকন। তুই আমার ভারি ভালো ছেলে। জীবনে ভালো হোস। মানুষ

হোস, সত্যিকারের শিক্ষিত হোস, ডিগ্রি অনেক নাই-ই-বা পেলি। আমি তো আর চিরদিন বাঁচব না। তোকে এই আশীর্বাদই করে গেলাম। তা ছাড়া আমি নিজে তো কখনো তেমন মেধাবী ছিলাম না। তোর কাছ থেকে আমার প্রত্যাশাটা অন্যায়। এক জেনারেশানে হয় না। মেধাবী যারা, তাদের মা-বাবা, ঠাকুরদা দাদু তাঁরাও বোধ হয় মেধাবীই হন।'

৪

কলকাতায় এসেছিলাম পুজোর সময়। পরশু দিল্লি ফিরে যাব। আমার একমাত্র ছেলে খোকা এবার দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষা দিল। আমি তো ভালো ছাত্র ছিলাম না। খোকাও পড়াশোনাতে মাঝামাঝিই হয়েছে। ও অভিনেতা হতে চায়। গ্রুপ থিয়েটারের দলে ঢুকেছে। টিভি-ফিলম নিয়ে পড়াশোনা করবার ইচ্ছে আছে। আস্ত পাগল।

অনেকগুলো বছর চলে গেছে। সত্যি অনেকই বছর। আজ মা নেই, বাবাও নেই। দক্ষিণ কলকাতার বাড়িও রামকৃষ্ণ মিশনে দিয়ে দিয়েছি আমি। দিল্লিতে থাকি এখন। আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল। আমার স্টুডিয়ো করেছি ভাড়া বাড়িতে, দিল্লির বাঙালিপাড়া চিত্তরঞ্জন পার্কে। ছবি আঁকি, মূর্তি গাড়ি। প্রদর্শনী এবং এমনিতে কিছু কিছু বিক্রি হয়। বড়োলোক হতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু বাঙালিরা আমাকে চেনেন। দিল্লির বাঙালিরা তো বটেই, ভারতবর্ষ এবং বিদেশের বাঙালিরাও। তাতে আমার কোনো গর্ব নেই। আনন্দ আছে। পয়সার লোভে সকলেই যা করে চারপাশে, যা চায়, তাদের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে নিজস্বতাকে এখনও খুইয়ে বসিনি যে, এইটেই আনন্দের। বাবার শিক্ষার অমর্যাদা করিনি আমি। আজকের দিনে এটা সম্ভব হত না যদি না শ্রাবণী আমাকে সাপোর্ট করত। স্ত্রীদের উপরে স্বামীদের জীবন, জীবনের গন্তব্য অনেকখানিই নির্ভর করে। বাড়িটার দাম পেয়েছিলাম পাঁচ লাখ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকেই বলেছিল যে, নিজের সংসার চলে না, অত দাতাগিরিতে কাজ নেই। শ্রাবণী কিন্তু বলেছিল, মা-বাবাই যখন নেই, তখন যা আমাদের স্বোপার্জিত নয়, তা দিয়ে সহজ সুখ চাই না আমি। বড়োলোকের ছেলে হলে খোকাও মানুষ হবে না। অত্যন্ত কষ্টকর হলেও বাংলা সাহিত্য, বাংলা গান, বাংলায় যা কিছু ভালো তার সঙ্গে যোগাযোগ প্রবাসে বসে আমরা এখনও রেখে চলি। এই মাঝামাঝি মিডিয়োকার মধ্যবিত্ত বাঙালিরাই এখনও বাঙালির যা-কিছু ভালো তা প্রাণান্তকর কষ্টেই ধরে রেখেছেন বলে মনে হয় আমার। বিত্তবান বাঙালিদের অধিকাংশই বাঙালিত্বকে অসম্মান করেন, ছোটো চোখে দেখেন।

কলকাতায় এসে এবার উঠেছি আমার শ্যালকের বাড়িতে। খোকা আর শ্রাবণী কলকাতার পুজো দেখতে চেয়েছিল, তাই। ভাইফোঁটার পরই ফিরে যাব আবার

দিল্লিতে।

আমাদের স্কুলের উলটো দিকের পার্কে ছেলেবেলায় কত ফুটবল-ক্রিকেট খেলেছি। বন্ধুদের সঙ্গে কত গল্প মজা। আজ তাই প্রথম বিকেলে একটা মিনিবাস ধরে এসেছি এখানে। একজন কিশোরের চোখে এই পার্কটিকেই কত বড়ো বলে মনে হত। ছোটো ছোটো পায়ে এটি পার হতে হতে মনে করতাম, তেপান্তরের মাঠই পেরোলাম বুঝি! আজ পার্কে ঢুকেই মনে হল, পার্কটি খুবই ছোটো। গাছগুলি উধাও হয়ে গেছে। ভিড়, বড়ো ভিড়। ধুলো। ছেলেবেলার সেই চোখ দুটোও তো হারিয়ে গেছে!

মন যদিও খারাপ হয়ে গেল, তবু ভাবলাম, কয়েকটি পাক হেঁটেই যাই পার্কের চারপাশের পিচ-বাঁধানো রাস্তায়।

আধ পাক যেতেই মনে হল যেন একটা বেঞ্চে লাঠি হাতে অক্ষয়স্যার বসে আছেন। ঠিক দেখলাম কি? তাঁর সামনে দিয়েই চলে গেলাম। ঠিকই চিনেছি। অক্ষয়স্যারই। গোঁফ-চুল সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। মাথায় বাঁদুরে টুপি, হাতে লাঠি। মুখে পৃথিবীর সব বিতৃষ্ণা, কষ্ট। খারাপ ছাত্র পড়ানোর কষ্ট নয়, বার্ধক্যের জরার কষ্ট। গায়ে একটি নস্যিরঙা ছেঁড়া আলোয়ান। আমাকে চিনতেও পারলেন না। না পারারই কথা। আমার মতো কত খারাপ ছাত্রকেই তো তিনি পড়িয়েছেন। খুব ভালো আর খুব খারাপ ছাত্রদেরই স্যারেরা শুধু মনে রাখেন। মাঝামাঝিরা হারিয়েই যায় তাঁদের স্মৃতিতে। 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে, চলে যায় তারা কলরবে, কৈশোরের কিশলয়, পর্ণে পরিণত হয়, যৌবনের শ্যামল গৌরবে।' কালিদাস রায়ের বিখ্যাত কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল অক্ষয়স্যারের চোখের ঝাপসা দৃষ্টি দেখে। ওঁকে পেরিয়ে এসেই নতুন করে মনে পড়ল যে, অক্ষয়স্যারের মতো এতখানি অপমান আমাকে জীবনে আর কেউই করেননি। তাঁর প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু বুঝলাম গভীর এক উদাসীনতা জন্মে গেছে একধরনের। বহু বছরের দূরত্ব তা গাঢ় করেছে আরও।

আরও এক পাক ঘুরে আসার পর ওঁর সামনে দাঁড়ালাম আমি। অক্ষয়স্যারের মুখে কোনো ভাবান্তর ঘটল না। প্রণাম করে বললাম, 'কেমন আছেন স্যার?'

'ভালো নয়, ভালো নয়। কিন্তু চিনতে পারলাম না তো তোমাকে? কে?'

'আমি সিদ্ধার্থ স্যার। দক্ষিণ কলকাতায় থাকতাম। অঙ্ক...।'

'ও বুঝেছি, বুঝেছি। তা কী করছ এখন তুমি সিদ্ধার্থ?'

'ছবি আঁকি স্যার। মূর্তি গড়ি।'

'পেট চলে তাতে? আর্টিস্টরা তো না খেয়েই থাকে শুনি।'

'কোনোক্রমে চলে যায় স্যার।'

'তা ভালোই করেছ। অঙ্ক তোমার লাইন ছিল না। অঙ্কে মাথা লাগে।

অঙ্ক...'

'জানি।' একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'গোপেনদা কী করছেন স্যার?'

'মানে, আমার ছেলে গোপেনের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'ও?' অক্ষয়স্যারের ম্লান, করুণ, কাতর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'গোপেন তো ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। জান তো? ম্যাথমেটিক্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। তারপর চলে গেল নতুন করে ফিজিক্সের লাইনে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। এখন আমেরিকার হিউস্টনে আছে। আরে, নেভাদার মরুভূমিতে যে বোমা ফাটাল সেদিন আমেরিকা, সে তো তার একারই হাতে গড়া!'

এমন করে বললেন, অক্ষয়স্যার, যেন উড়নতুবড়ি বানানোর কথাই বলছেন। গোপেনদা যেন একা হাতে মশলা আর লোহাচুর ভরে উড়নতুবড়িই বানিয়েছেন একটা। আলোর ছটার জন্যে নয়, পৃথিবীর যা কিছু ভালো, সব ফুল, পাখি, প্রজাপতি, অরণ্য মানুষ সব কিছুকেই ধ্বংস করার জন্যে।

'দারুণ আছে। বুঝলে হে। বিরাট বাড়ি। ক্যাডিলাক লিমুজিন গাড়ি। আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করেছে। কী ফুটফুটে মেমসাহেব। নাতি-নাতনিরাও সব ফুটফুটে। পাক্কা সাহেব। বাংলা বলতেই পারে না।'

গর্ব ঝরল অক্ষয়স্যারের কথায় বসনতুবড়ির ঝরনার মতো।

'আপনি যাননি? ওঁরা আসেন না?'

'কী যে বলো! আমার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে ইন্ডিয়ান বাথরুম। পায়রার খোপের মতো দু-খানা ঘর। জঞ্জালে ভরা। ওখানে ওরা থাকবে কী করে? তুমি যেমন অঙ্কে গবেট ছিলে, ও ছিল তেমনই সত্যিই ব্রিলিয়ান্ট। জান তো স্কুল ফাইনালে স্টার পেয়েছিল। অঙ্ক, সংস্কৃত আর ভূগোলে লেটার পেয়েছিল। ইতিহাসেও।'

'আপনি এখনও কি পড়ান স্যার? আর মাসিমা মানে, গোপেনদার মা কেমন আছেন?'

'উনি গত হয়েছেন পাঁচ বছর হল।'

একমাত্র ছেলের প্রশংসাতে উজ্জ্বল মুখ হঠাৎই নিভে গেল অক্ষয়স্যারের। বললেন, 'বড়ো কষ্ট পেয়ে, বিনা শুশ্রূষাতে, বিনা চিকিৎসাতেই প্রায় চলে গেলেন। আমিও তো পা বাড়িয়েই আছি, বুঝলে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। শুধু বার্থটাই রিজার্ভেশন হয়নি। বাত, হাঁপানি, দুটো হার্ট অ্যাটাক। আছি কোনো রকমে। একে থাকা বলে না।'

'তাহলে এখন আর টিউশনি করেন না? স্কুল থেকে তো নিশ্চয়ই বহু বছর রিটায়ার করেছেন?'

'পঁচিশ বছর। টিউশনি-তা করি, নিশ্চয়ই করি। নইলে চালাচ্ছি কী করে? কেন তোমার ছেলেও বুঝি তোমারই মতো অঙ্কে কাঁচা?'

আমি হাসলাম। কষ্ট হল অক্ষয়স্যারের জন্যে।

উনি বললেন, 'এখন থাক কোথায়? ওই বাড়িতে তো অন্যরা থাকেন। ওই পাড়াতে আমার একটি টিউশনি ছিল। তাই জানি। তুমিই বলো, সকালে অথবা দুপুরে আমি নিশ্চয়ই গিয়ে পড়াব যত্ন করে। রাতে আর কোথাও যাই না। ছেলের চেয়েও যেমন নাতি আদরের, ছাত্রর চেয়ে ছাত্রর ছেলেও তেমনই।'

'তা এই বয়সেও এত কষ্ট করেন কেন, গোপেনদা এত বড়ো এবং বড়োলোক হয়েছেন। আপনাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠান তো নিশ্চয়ই। এসব তো ছেড়ে দিলেই পারেন। এই শরীরে। আর কতদিন কষ্ট করবেন?'

একটু চুপ করে থেকে অক্ষয়স্যার গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'অভাব আমার কিছুই নেই তবে একেবারে বসে গেলে শরীরটা আর চলবে না। তাই-ই চালিয়ে যাচ্ছি টুকটুক করে।'

'আচ্ছা চলি স্যার।'

'তোমার ছেলে? পড়বে না সে আমার কাছে?'

'অঙ্ক ও পড়বে না স্যার। অভিনয় করবে বলছে।'

অক্ষয়স্যারের মুখটি, আমার অঙ্ক দেখে যেমন বিকৃত হয়ে যেত তিরিশ বছর আগে, তেমনই বিকৃত হয়ে গেল। বললেন, 'লাইক ফাদার লাইক সান। ও তো তোমারই মতো গাধা হয়েছে তাহলে। অঙ্কে গবেট?'

হেসে বললাম, 'তাই।'

সন্ধ্যে হয়ে এল। আলো জ্বলে উঠেছে। পার্ক থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময়ে আমার স্কুলের বন্ধু রাজেনের সঙ্গে দেখা। চিনতেই পারিনি। বুড়ো হয়ে গেছে। সিনেমায় নামবে বলে বাবার আলমারি ভেঙে টাকা নিয়ে এই রাজেনই বোম্বে যাচ্ছিল। পুলিশ ধরে আনার পর স্কুল থেকে রাস্টিকেট করে দিয়েছিল ওকে। ওর নাম ধরে ডাকতেই, আমার নাম বলতেই, বুকে জড়িয়ে ধরল রাজেন। বলল, 'কী রে সিদু? কীরকম বুড়ো মেরে গেছিস তুই।'

'আর তুই কি কচি আছিস নাকি? টেকো বুড়ো।' আমি বললাম।

হেসে ও বলল, 'চল চল আমার দোকানে। বিকেলে একটু হাঁটতে বলেছেন ডাক্তার। দোকানে বসে বসে ডায়াবিটিসে ধরেছে বুঝলি। চল, চল, দোকানের পর আমার বাড়িতে। সীমা কত্ত খুশি হবে। বাড়ির একতলাতেই তো দোকান।'

'কীসের দোকান?'

'আবার কীসের? স্টেশনারি দোকান দিয়েছি বাড়ির একতলাতে। আমি আর কী করব? সংসার তো চালাতে হবে।'

'মেসোমশাই কেমন আছেন?'

'বাবা নেই। অনেক চেষ্টা করলাম রে। সব সঞ্চয়, মায়ের, এমনকী সীমারও সব গয়না, আমার স্কুটারটা পর্যন্ত বিক্রি করেও তবু বাঁচাতে পারলাম না।'

'কী হয়েছিল?'

'ক্যান্সার।'

'মাসিমা কেমন আছেন?'

'বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু ভালোই আছেন। চল, চল, তোকে দেখে কত খুশি হবেন। তুই বিজয়ার পর মায়ের হাতের কুচোনিমকি আর নারকেলের নাড়ু খেতে ভালোবাসতিস। চল, এখনও কিছু আছে। আজকাল বিজয়া-টিজয়া তো উঠেই গেছে। আমেরিকান হয়ে গেছি আমরা। কী বলব তোকে, এই শ্রীমান রাজেন দাসের একমাত্র ছেলেও ইংরেজি গান আর ইংরেজি বই ছাড়া পড়ে না। ইংরেজি নাচ নাচে।'

'কী করছে ও?'

'চোরের ছেলে আর কী করবে? ডাকাত-টাকাত হবে হয়তো। এখন কবিতা লিখছে। বাবা তো লক্ষপতি। লিটল-ম্যাগ আন্দোলনে সামিল হয়েছে ছেলে।'

'আরে হোক হোক। ওর জীবন ওর। বাধা দিস না।' আমি বললাম।

দোকানেই আগে নিয়ে গেল রাজেন। খুব মজা লাগল যে, বোম্বের বৈজয়ন্তীমালার বিরাট একটি ছবি টাঙানো আছে দোকানের দেওয়ালে। তাতে চন্দন-টন্দনের ফোঁটা দেওয়া।

বললাম, 'এ কী রে? যাকে বিয়ে করবি বলে পালিয়েছিলি।'

রাজেন হেসে বলল, 'কী বলিস তুই? যার জন্যে পুলিশের ঠ্যাঙানি খেয়ে বুকের হাড় ভাঙল, চোর বদনাম হল, তাকে কি ফেলে দিতে পারি? বাবা-মাকে যেমন ফেলে দেওয়া যায় না, একেও তেমনই।'

বলে, নিজেই হো-হো করে হেসে উঠল।

রাজেনের মা খুবই খুশি হলেন। রাজেনের বউ সীমা বলল, 'আপনাকে আজ না খেয়ে যেতেই দেব না। যা রান্না হয়েছে গরিবের বাড়ি, তাই খেয়ে যেতে হবে। এত বড়ো আর্টিস্ট আমাদের বাড়ি এসেছেন। আপনাকে কখনো চোখে না দেখলেও আমার স্বামীর বন্ধু বলেই কত্ত মানুষের কাছে গর্ব করি। আপনার গর্বে আপনার বন্ধুর তো মাটিতে পা-ই পড়ে না।'

বলেই বললেন, 'দোকানঘরের দেওয়ালগুলো দেখে এসেছেন তো?'

হেসে বললাম, 'দেখিনি আবার!'

সীমা হেসে গড়িয়ে বলল, 'ফোটোর সতিনকে নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই, আমিও ফুল-টুল দিই মাঝেমধ্যে।'

'অক্ষয়স্যারের সঙ্গে দেখা হল রে, বুঝলি রাজেন।' আমি বললাম রাজেনকে।

'তাই? আমার সঙ্গে তো রোজই হয়। দোকানেও বলে রেখেছি যে, রোজকার পাউরুটি যেন বিনে পয়সায় দিয়ে দেয় ওঁকে। গুরু-ঋণ বলে কথা! রাস্টিকেড ছাত্রই হই আর যাই-ই হই। কী কানমলাই না দিতেন! মনে আছে? ও, তুই তো আমার চেয়ে অনেক ভালো ছিলি অঙ্কে। বাঁ-কানটা চিরদিনের মতো হাফ-কালা হয়ে গেছে রে। একেবারে রগে রগে ঘষাঘষি করতেন অক্ষয়স্যার!'

'গোপেনদা কিন্তু দারুণ ভালো ছিল। স্যারের কাছে শুনলাম যে, বিরাট নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হয়েছেন আমেরিকায়...' আমি বললাম।

'তা তো হয়েছেন! কিন্তু মা মারা গেলেন বিনা চিকিৎসায়। বিনা ওষুধে। অঙ্কে দারুণ খারাপ ছেলে পাউরুটি দান করে বুড়ো বাবাকে তার বাঁচিয়ে রেখেছে। অমন ভালোর দাম কী বলতে পারিস? একটা টাকাও পাঠায়নি বিদেশ যাওয়ার পর থেকে। একবারও আসেনি।'

'অক্ষয়স্যারের টিউশনি তো আছে এখনও কয়েকটা?'

'ছাড় তো! টিউশনি। এখনকার দিনে কি আর তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের ওঠার অঙ্ক করতে হয়? না শুভংকরী মুখস্থ করতে হয়, কে পড়বে ওঁর কাছে। এখন অঙ্ককে অঙ্ক বলে না। বলে ম্যাথস। সীমাকেই জিজ্ঞেস কর না। স্যার পটকে যখনই যান, তখন শুশ্রূষা করে সীমাই, ফ্লাস্কে করে পথ্য নিয়ে গিয়ে। যত ঝামেলা এই রাস্টিকেটেড ছাত্ররই। সত্যি! যাকগে, আমি যেমন ছাত্র ছিলাম আমার ছেলে-মেয়ে তার তুলনায় অনেকই ভালো। এই-ই স্যাটিসফ্যাকশান!'

মাসিমার হাতে বানানো কুচোনিমকি, আর নারকেল নাড়ু, সীমার রান্নার লুচি বেগুনভাজা কুমড়োর ছেঁচকি আর ডিমের ঝোল খেয়ে যখন প্রায় দশটা নাগাদ রাজেনের সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডে এলাম, তখন ভারি ভালো লাগছিল। অঙ্কে আমরা কেউই যে ভালো ছিলাম না, এটা মনে করে সত্যিই আনন্দ হচ্ছিল।

রাজেনকে বললাম, 'সীমাকেও বলে এসেছি, আগামী শীতে সবাইকে নিয়ে দিল্লি আয়। মাসিমাকেও নিয়ে আসিস। একটু অসুবিধে হলেও তোদের আনন্দ হবে খুব।'

রাজেন বলল, 'খুব চেষ্টা করব। কী বলব তোকে, বিয়ের পর সীমাকে একবার দিঘা ছাড়া আর কোথাও নিয়ে যেতে পারেনি। কত্ত যে ঝামেলা। আর রোজগার তো লবডঙ্কা!'

বললাম, 'থ্রি-টায়ারে করে চলে আয়। স্টেশনে তোদের রিসিভ করার পর থেকে সব দায়িত্ব আমার।'

বাস এসে গেল। বললাম, 'চলি রে।'

শীত কিছুই পড়েনি। তবে কলকাতার মানুষেরা তো ক্যালেন্ডার দেখে গরম জামা পরেন। তা ছাড়া ধোঁয়াশা আর ডিজেলের ধোঁয়ার কলকাতাকে এখন মনে হচ্ছে শীতের লন্ডন। দু-বছর আগে এগজিবিশন নিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে। তাই জানি।

পরের স্টপে ঠিক অক্ষয়স্যারের মতো এক ভদ্রলোক উঠলেন। মাথায় বাঁদুরে টুপি। হাতে লাঠি। তবে বয়স অত হয়নি। বাস হঠাৎ ছেড়ে দিতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। উঠে দাঁড়িয়ে ওঁকে আমার সিটে বসালাম।

উনি মুখে কিছু বললেন না। কৃতজ্ঞতার চোখে তাকালেন।

তোতাপাখির 'থ্যাঙ্ক ইউ' আমার দেশের ঐতিহ্য নয়। আমরা চোখ দিয়েই জরুরি কথা অনেক বেশি গভীরভাবে চিরদিনই বলে এসেছি। ওই বৃদ্ধও তাই করলেন।

আমি বেঁটে লোক। মিনিবাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। কলকাতার পাবলিক বাসে দিল্লির পাবলিক বাসের চেয়ে অনেক কম ভিড়। দিল্লি হচ্ছে বড়োলোক চাকুরে আর ব্যাবসাদারদের সুখের জায়গা। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের বিস্তরই অসুবিধে সেখানে। ভাবছিলাম, বাড়িটা দান করে দেওয়া বোধ হয় ঠিক হয়নি। কলকাতাতে থাকলেই হত। বাঙালি মধ্যবিত্তের পক্ষে এখনও কলকাতার মতো নিরাপদ ও সুখের জায়গা আর নেই।

কন্ডাকটারকে একজন যাত্রী বললেন, 'এটা কী হল দাদা? অঙ্কটা কীরকম হল? দিলুম পাঁচ টাকার নোট, যাব শ্যালদা, আর ফেরত দিলেন এই? অঙ্কের জ্ঞানটা একটু ভালো করুন।'

অক্ষয়স্যারের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার। নস্যি নিয়ে, অঙ্ক কষিয়ে, ছাত্রদের কানমলে, গালাগালি করে, প্রত্যেককে অঙ্ক বিশারদ করতেই কাটিয়ে দিলেন সারাটা জীবন মানুষটি।

কিন্তু নিজের জীবনের অঙ্কটাই, একটা মাত্র অঙ্ক, অতি সাদামাটা অঙ্ক, তাও মিলল না।

আমি

১

এখন আমি বড়ো হয়েছি। এমনকী বলা চলে, বুড়োও হয়েছি। কিন্তু আমি যেমনটি ছিলাম তেমনই রইলাম। বদলালাম না একটুও।

ছেলেবেলায় আমার কেবলই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করত। আজও করে। আমার দুই দাদাই পড়াশোনা খেলাধুলাতে আমার চেয়ে অনেকই ভালো ছিল। স্কুলের মাস্টারমশাইরা বলতেন, 'কী দাদাদের কী ভাই! ছ্যাঃ ছ্যাঃ ভাবা যায় না।'

বাবা বলত, 'হোন্দল, তুই কি অমানুষ হয়েই থাকবি চিরটাকাল? কোন গুণটা তোর আছে, আমাকে বলতে পারিস?' বড়ো জ্যাঠাইমা বলত, 'তুই ঘোষ পরিবারের একটা কুলাঙ্গার। তুই মরলে গুষ্টির উপকার।' তা আমি এমনই হতভাগা ছিলাম যে, না পারলাম 'মানুষের মতো মানুষ' হতে, না পারলাম, মরতে। তা ছাড়া এত যে গালমন্দ, ছিঃ ছিঃ করে, সেসব আমার গায়ে লাগত না। হাঁসের ডানায় জলের মতো গড়িয়ে যেত। যার বোধবুদ্ধিই নেই, তার কাছে প্রশংসা বা নিন্দামন্দ সবই সমান।

পড়াশোনা খেলাধুলা আমার কিছুই ভালো লাগত না। পেয়ারা গাছের কাঠবিড়ালির বাচ্চাদের সঙ্গে, বাগানের নাগচম্পা গাছের উঁচু ডালে বাসা করা ডাহুকদের বাচ্চাদের সঙ্গে, বাড়ির বাইরের মধুখালির প্রকাণ্ড বিলের পাশের দলদলি আর দাম-এর মধ্যে সল্লি হাঁসদের পাড়া ডিম কখন ফুটবে তার অপেক্ষাতে আমার দিন কাটত।

ফিনফিনে হলদে রঙের ফড়িংরা মধুফুলের মধু চুষে যখন উড়ে যেত গোধুলিয়ার মাঠের দিকে তখন তাদের পেছন পেছন দৌড়োতে আমার ভারি ভালো লাগত। ভালো লাগত, হাঁসেদের ঘর খুলে তাদের শীতের সকালে তাড়িয়ে নিয়ে হরিসভার পুকুরপাড়ে গিয়ে দু-কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একেক করে করে দূর থেকে উড়ে ঝাঁপ দিয়ে ঝপাং ঝপাং করে শীতের কুয়াশামাখা পুকুরের ঠান্ডা জলে তাদের আছড়ে পড়া দেখতে। জল ছিটকে উঠত তাদের জলে পড়াতে আর সকালের সোনারোদ সেই অগণ্য জলকণাতে পড়তেই কোনো অদৃশ্য হাত হিরের টিয়ারা বুনত শূন্যে। সেই হাঁসেদেরই যখন সূর্যাস্তবেলাতে বিন্নিদিদি কুলো হাতে দাঁড়িয়ে ধান ছড়াতে ছড়াতে ডাকত চই চই চই চই করে, আর তারা যখন হেলতে-দুলতে প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক করে আমাদের বাড়ির দিকে একে একে ফিরে আসত তখন মন ভরে যেত তাদের দেখে। যেকথা বললে কেউই বিশ্বাস করত না, তাই কারওকেই বলা হয়নি আজ অবধি সেকথা। সকালে হাঁসেদের হরিসভার পুকুরপাড়ে ছেড়ে দিয়ে খুব জোরে যখন দৌড়ে বাড়ির দিকে ফিরে যেতাম তখন আমি আসলে দৌড়োতাম না, উড়তাম। সত্যিই উড়তাম। মাটি থেকে অনেক ওপর দিয়ে উড়ে যেতাম-আমার খালি পা দুটো টী-টী পাখির পায়ের মতো দুলতে দুলতে চলত আমার শরীরের নীচে নীচে।

এই সবই করতাম কিন্তু পড়াশোনা করতাম না। আদিগন্ত নীল আকাশ, মধুখালির বিলের সবজেটে জলের বিস্তীর্ণ চাদর। এই সবই ছিল আমার জগৎ।

দাদা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাতে সপ্তম হল। কলকাতাতে গিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হল। মামাবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করবে ঠিক করল। আমার মামারা বালিগঞ্জে থাকতেন। মামা খুব বড়ো উকিল ছিলেন। খুব ভালো অবস্থা। দাদা পরে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিদেশে আরও ডিগ্রি নিতে চলে গেল। প্রথমে গেল বার্মিংহাম-এ। তারপর সেখান থেকে ইউনাইটেড স্টেটস-এ। মাঝে একবার দেশে ফিরেছিল। তারপর বস্টনেই থিতু হল। একজন ফরাসি মেয়ে বিয়ে করে গ্রিনকার্ড হোল্ডার হয়ে আমেরিকাতেই থেকে গেল।

মেজদাও হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করল। তবে দাদার মতো অত ভালো ছিল না সে। উনিশ না কুড়ি কী যেন হয়েছিল। তারপর মেজদাও ডাক্তারি পাশ করে আরও বড়ো চোখের ডাক্তার হতে অস্ট্রেলিয়াতে চলে গেল। তারপরই বাবার ব্যাবসা খুবই খারাপ হয়ে গেল। শরীরও খারাপ। মায়ের কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহে ডায়ালিসিস করতে সদরে যেতে হয়। সেখানে হাসপাতাল ও ডাক্তারের সুবিধা তেমন নেই। আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। মায়ের চিকিৎসার সুবিধার জন্যেই আমাদের হরিনাথপুরের বাড়ি, সমস্ত ধানজমি, আম বাগান পুকুর-টুকুর সব

বিক্রি করে দিয়ে বাবা কলকাতার ভবানীপুরে একটি ছোটো বাড়ি কিনে যা কিছু নগদ পেয়েছিলেন সব নিয়ে কলকাতাতে চলে এলেন।

বড়দা ও মেজদা আমার চেয়ে আট এবং সাত বছরের বড়ো। বড়দা তো আমেরিকাতে সেটল করেই গেছে, মেজদাও পড়াশোনা শেষ করে এনেছে অস্ট্রেলিয়াতে। হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, সেও আর দেশে ফিরবে না। ততদিনে অতি বাজে সেকেন্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কোনোক্রমে ভূগোল নিয়ে ভরতি হয়েছি আশুতোষ কলেজে। বাবার রোজগার কিছু নেই। সঞ্চয় ভাঙিয়ে মায়ের চিকিৎসা আর সংসার খরচ চলছে।

অতি নিকৃষ্ট ফল করে কোনোক্রমে কলেজের গণ্ডি পেরোলাম। আমাকে তো ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি ডেকে নিয়ে চাকরি দেবে না। এখন বিজ্ঞান, অ্যাকাউন্টেসি আর কম্পিউটারের যুগ। ভূগোল নিয়ে যাচ্ছেতাই ভাবে পাশ করা ছেলেকে কে চাকরি দেবে?

ততদিনে বড়োমামা একদিন ম্যাসিভ স্ট্রোকে চলে গেলেন। উনি থাকতে উনিই বাবার পরামর্শদাতা ছিলেন। আমার ধারণা বাবাকে না জানিয়ে উনি মাকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্যও করতেন। বড়োমামার ছেলে ছিল না। এক মেয়ে-ছবিদি। যে পাশের বাড়ির একটা বখাছেলেকে বিয়ে করে বড়ো দুঃখী জীবনযাপন করছিল। বড়োমামি তো আগেই গত হয়েছেন। জিতু জামাইবাবু দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। কিন্তু তিনিও শ্বশুরের সম্পত্তি ভাঙিয়েই দিন চালাতেন। তা ছাড়া খুব মদ খেতেন, ছবিদিকে মারধরও করতেন।

ওই পরিস্থিতিতে আমার আত্মহত্যা করার ইচ্ছেটা আরও তীব্র হল। কিন্তু আমার এক বখাবন্ধু ছিল। জগৎ। আশুতোষ কলেজে পড়ত কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারেই পড়া ছেড়ে দেয়। যদুবাবুর বাজারের পাশের গলিতে সে একটি ছিটকাপড়ের দোকান করে আর মির্জাপুরের এক মুসলমান দর্জির কাছ থেকে জামা-প্যান্টের কাপড় কাটতে আর সেলাই করতে শিখে নেয়। তার দোকান এখন রমরমিয়ে চলে। জগৎ কলেজ ছাড়লেও আমার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রেখেছিল। মাঝে মাঝেই পূর্ণ বা ইন্দিরা বা বিজলিতে সিনেমা দেখাত। মা-বাবার কাছেও আসত। খুব হাসাতে পারত ও সকলকে। অত যন্ত্রণার মধ্যে মা-র মুখে হাসি ফুটে উঠত। মা বলতেন, 'জগৎ, তুমি আবার এসো বাবা।'

একটা নতুন কিডনির দাম অনেক টাকা। জমিজমা বিক্রি করার পরই বাবা যদি মায়ের জন্যে কিডনি কিনে দিতেন একটা তাহলেও হত। আজকে সেই সামর্থ্য কোথায়? জগৎই মা-বাবাকে বলেছিল, 'আমি আর হোন্দল একটা করে কিডনি দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।'

বাবা রাজি হননি। বলেছিলেন, 'তোমার মাসিমা আর আমি আর ক-দিন বাঁচব? দু-জনেই তো সত্তর পার করে দিয়েছি। তোমাদের সামনে সুন্দর জীবন-দীর্ঘ জীবন-তোমাদের এই শাস্তি দিতে পারি না আমরা।'

এদিকে আমাদেরও আর চলে না। বাবার পুঁজি সব শেষ। এবারে মায়ের গয়না ভাঙা শুরু হল। আমি, এই হোন্দল এমনই অপদার্থ যে, বাবা-মায়ের জন্যে কিছুমাত্রও করতে পারি না। বাবা ঠিকই বলেছিলেন, দাদারা কত ভালো আর আমি একটা অমানুষ।

বাড়ির একতলাটা একটা গুজরাটি পরিবারকে ভাড়া দিয়েছেন বাবা। তাও মাস ছয়েক হল। তাদের কেবলই ধান্দা বাড়িটা কিনে নিয়ে আমাদের উদবাস্তু করার। সবসময়ে টাকার লোভ দেখাচ্ছে তারা বাবাকে। এমন সময়ে এক রবিবারে জগৎ এসে বলল, 'কাল সারারাত ভেবে ভেবে একটা প্ল্যান এসেছে মাথাতে।'

'কী প্ল্যান?'

'তোদের গ্যারাজটা তো ফাঁকা পড়ে আছে। ভাগ্যিস ভাড়াটেকে দিয়ে দেননি মেসোমশাই।'

'ওরা তো গাড়ি পাশের প্যাসেজে রাখে। তিনটে গাড়ি ওদের। পয়সার অভাব তো নেই। আগে একটা ছিল। গত ছ-মাসে আরও দুটো কিনেছে।'

'সে যাই হোক, তোদের বাড়িটার লোকেশানটা খুবই ভালো। এখানে ঢোকলা, চানাচুর, গজা এসবের দোকান করলে খুব চলবে। এ ব্যাবসাতে কত প্রফিট জানিস? সত্তর পার্সেন্ট।'

তারপর বাবাকে বলল, 'মেসোমশাই বিজলি সিনেমার পাশে এক চিলতে একটা দোকানে গরম গরম চানাচুর ভাজছে একটা লোক গত পঞ্চাশ বছর হল। সে আজ নিজে হয়তো ভাজছে না, তার নাতিপুতি ভাজছে হয়তো। কিন্তু সেই দোকান থেকে সে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে এবং আজও করছে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী এই কথাটা তো বাঙালি ওই লোকটাকে দেখেও শিখতে পারত।'

আমি বললাম, 'বাণিজ্য তো করব, ক্যাপিটাল আসবে কোত্থেকে?'

জগৎ বলল, 'এই কথাটা যা বললি এর তুলনা নেই। সব বাঙালির এক রা। হোয়্যার, দেয়ার ইজ আ উইল দেয়ার ইজ আ ওয়ে। টাকার দরকার হলে কাবলিওয়ালার কাছ থেকে ধার করবি। আর কিছুটা আমি দেব। দেখিস তুই! একমাসে তোর দোকান দাঁড়িয়ে যাবে। চক্রবেড়িয়ার একটা দোকান থেকে দুটো ছোঁড়াকে ভাগিয়ে আনব। তাদের মোটা অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছি। ওরাই তো কারিগর।'

'দোকানের নাম কী দিবি?'

'কেন? হোন্দল কুতকুত। দেখবি, নামেই কেল্লাফতে হয়ে যাবে।'

২

সেদিন জগৎকে বাস স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যখন যাই, জগৎ বলল, 'হোন্দল, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করিস না। অত্যন্ত পার্সোনাল কথা।'

'কী কথা। বল?'

'তোর দুই দাদা এত কৃতী, এত বড়োলোক। মাসিমার অসুখ এবং তোদের অবস্থার কথা কি তাঁরা জানেন না?'

আমি মুখ নীচু করে বললাম, 'জানেন।'

'তবে?'

'দাদাদের অনেক খরচ। একজনের ফ্রেঞ্চ বউ, অন্যজনের ইংলিশ। তারা হরিনাথপুরের অতি সাধারণ শিক্ষিত চাষা আমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায় না। আমাকে বড়দা একবার লিখেছিল, তোকে একটা অটো কিনে দিতে পারি। বাবাকেও। কিন্তু খেটে খেতে হবে। মাঝে মাঝে অনুদান দিতে পারব না। মেজদা চলে যাওয়ার পরে আর যোগাযোগ রাখেনি মা-বাবার সঙ্গে। আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিল, তোদের কম্পিউটার নেই। ই-মেইল ছাড়া আজকাল কি যোগাযোগ করা সম্ভব। বরং ইন্টারন্যাশনাল রোমিং মোবাইল ফোন নিয়ে নে একটা।'

'সত্যি। মোবাইল তো আজকাল পানওয়ালা বিড়িওয়ালার কাছেও আছে। নিস না কেন একটা?'

'আমাদের তো ল্যান্ড লাইনই নেই। কী দরকার? ওসব তোদের মতো কাজের মানুষদের দরকার। প্রয়োজন বাড়ালেই বাড়ে।'

সেই রাতেই মায়ের অবস্থা খুব খারাপ হল। পাড়ার হরেন ডাক্তারকে ডেকে আনলাম গিয়ে। বললেন, 'এখনই নার্সিং হোমে রিমুভ করুন। মেডিক্লেইম করা আছে কি?'

'না তো।'

'তবে হাজার পঞ্চাশেক টাকার বন্দোবস্ত করুন। নইলে নার্সিং হোম ভরতি করবে না।'

তারপর বললেন, 'কোনো এম.এল.এ-র সঙ্গে জানাশোনা আছে? তা না হলে সরকারি হাসপাতালেও ভরতি করে নেবে না।'

আমার মুখে এসে গেল, 'তাহলে কি গরিব বিনা চিকিৎসাতে মরবে এই জনদরদি রাজ্যে?'

'গরিব চিরদিনই বিনা চিকিৎসাতে মরেছে। কংগ্রেসি আমলেও মরেছে, লাল আমলেও মরছে। কোনোদিন যদি গৈরিক আমল আসে তখনও মরবে। জনতার প্রতি দরদ এসব মুখের কথা। কথার কথা। নির্বাচনের আগের বুলি।'

মা রাত পৌনে দুটোর সময়ে মারা গেলেন। পাড়ার মোড়ের ফোন বুথ থেকে আগে জগৎকে একটা ফোন করলাম। অত রাতে বিরক্ত করার মতো আপনজন আমার আর কেউই ছিল না। তারপর সকাল বেলা বড়োমামার উপহার দেওয়া সোনার টিসট হাতঘড়িটি বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছিলাম তা দিয়ে বড়দা ও মেজদাকে আই.এস.ডি. কল করলাম।

বড়োদাদা বলল, 'মরবার আর সময় পেল না? এ সপ্তাহের শেষে আমার একটা খুবই ইম্পট্যান্ট প্রেজেন্টেশান আছে, আমার পক্ষে পনেরো দিনের আগে দেশে যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া, গিয়ে হবেটাই-বা কী? মা তো মরেই গেছে।'

তারপর বলল, 'টাকাপয়সার দরকার আছে তো বল। কিছু ডলার পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি।'

বললাম, 'না, না, তোমার টাকা পাঠাতে হবে না। হয়ে যাবে।'

মেজদার ফোন বেজে গেল অনেকক্ষণ। হয় বাড়িতে কেউ নেই, দু-জনেই কাজে গেছে। তারপর ভয়েস মেইল-এ শোনা গেল যে ওরা হলিডেতে গেছে ইন্দোনেশিয়াতে। পনেরো দিন পরে ফিরবে। এমন করে ইংরেজি বলে ওরা যে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়া আমার পক্ষে বোঝাই সম্ভব হয় না।

বাড়ি ফিরে দেখলাম জগৎ এসে গেছে। খুব রাগ করল আমার ওপরে।

'যে হাসপাতালে ডায়ালিসিস করা হচ্ছিল সেখানে নিয়ে যাওয়া অবশ্যই উচিত ছিল। আমাকে জানালে আমি টাকা নিয়ে আসতাম।'

বাবা বললেন, 'তুমি আর কত করবে বাবা। তুমি তো আমার কেউ নও। আমার দু-দু-জন পরম মানুষ-ছেলে। আর ও-ই একটা অমানুষ। তারাই যদি কিছু না করে, না করতে পারে, তুমি কী করবে।'

জগৎ বলল, 'আমি গিয়ে গুরুদোয়ারাতে ফোন করে দিচ্ছি। কাল সকাল ন-টাতে কাচের গাড়ি পাঠাবে।'

আমি ওকে ছবিদির নম্বরটা দিয়ে বললাম, 'ভোর পাঁচটা নাগাদ খবরটা দিস। যদি আসে। মায়ের শাড়ি-টাড়িও তো বদলাতে হবে।'

জগৎ বলল, 'আমি মাকে নিয়ে চলে আসব ছ-টার সময়ে। ফুল, ধূপকাঠি, মালা এসব নিয়ে।'

তারপর বলল, 'এই কলকাতাটা বাংলারই রাজধানী। কিন্তু দেখ আমরা জন্মাই কোনো মাড়োয়ারি হাসপাতালে। লেখাপড়া করি গুজরাটিদের ভবানীপুরের স্কুলে বা

মাড়োয়ারিদের হিন্দি হাই স্কুলে। অসুখ হলে যাই বেলভিউ অথবা বিড়লা হার্ট সেন্টারে। ছেলের অন্নপ্রাশন দিই মহারাষ্ট্র নিবাস অথবা মাইসোর হলে, মেয়ের বিয়ে দিই ত্যাগরাজা হলে অথবা পাঞ্জাব ভবনে। আর মরে গেলে সর্দারজিদের গুরুদোয়ারার শববাহী গাড়িতে শ্মশানে যাই। আমাদের জবাব নেই, সত্যি।'

জগৎ চলে গেলে আমি মায়ের পায়ের কাছে বসে থাকলাম মায়ের মুখের দিকে চেয়ে।

বাবা নিজের মনে বললেন, 'ভালোই গেছেন। এই বাঁচা কি বাঁচা ছিল!'

তারপর বললেন, 'বড়ো ও মেজোকে কি খবর দিয়েছিলি?'

বাবাকে মিথ্যে বললাম আমি। বললাম, 'ওদের কেউই নেই। দু-জনেই অফিসের কাজে বাইরে গেছে।'

'আর বউমারা?'

'তারাও তো কাজে থাকেন।'

অত দুঃখেও হাসি পেল আমার। যাঁদের চোখে দেখেননি, ফোটো দেখেছেন শুধু, তাদেরও বউমা বলে আনন্দ পাচ্ছেন।

পাখাটা মাথার ওপরে ঘুরছিল শব্দ করে। একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠল। মুচমুচ শব্দ তুলে পথের পাতা-পুতি, কাগজের ঠোঙা ধুলোকে ঝাঁট দিয়ে নিয়ে গেল সেই হাওয়া। নিশুতি রাতের পথে কারা যেন টেম্পো করে 'বলহরি হরিবোল' ধ্বনি দিতে দিতে উল্লাস করতে করতে মৃতদেহ নিয়ে গেল কেওড়াতলার দিকে। আমি সেই অদেখা-অচেনা মৃতর উদ্দেশে দু-টি হাত অভ্যাসবশে জড়ো করলাম বুকের কাছে।

বাবা মায়ের চেয়ে আট বছরের বড়ো। বাবারও দিন ফুরিয়ে এসেছে। মা চলে যাওয়াতে তার বাঁচার ইচ্ছেও আর বোধ হয় রইল না।

হঠাৎ বাবা বললেন, একটু কেশে নিয়ে, 'বুঝলি হোন্দল, তোকে আমি চিরদিনই অমানুষ বলে এসেছি। আজকে বলছি, না, তুই-ই আমার সন্তানদের মধ্যে একমাত্র মানুষ।'

তারপর বললেন, 'জগতের সঙ্গে ব্যাবসাটা তুই শুরু কর। তারপর বিয়ে কর। আমি নাতি-পুতি না দেখে মরছি না, যম আমাকে যতই ডাকুক।'

বাবার কথাতে আমার দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

উপসংহার

গুগুনোগুম্বারের দেশে

'আমরা। পথ। হারিয়েছি।'

কথা তিনটে কেটে কেটে, ওজন করে করে, থেমে থেমে, যেন নিজের মনেই বলল ঋজুদা।

আমরা একটা কোপির উপর দাঁড়িয়েছিলাম। কোপি হল একধরনের পাহাড়। তখন ভরদুপুর। সামনে দূরদিগন্তে কতগুলো ইয়ালো-ফিভার অ্যাকাসিয়া গাছের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া আর কোনো বড়ো গাছ বা পাহাড় বা অন্য কিছুই নেই। একটি বিরাট দলে জেব্রারা চরে বেড়াচ্ছে বাঁ-দিকে। ডান দিকে একদল থমসনস গ্যাজেল। হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। ভুষুন্ডা আর টেডি মহম্মদ মাথা নীচু করে ল্যাব্রাডার গান-ডগের মতো মাটি শুঁকে শুঁকে পথের গন্ধ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে হাজার হাজার মাইল সাভানা ঘাসের রাজ্যে। নীচে আমাদের ছাইরঙা ল্যান্ড-রোভার গাড়িটা ট্রেলারের মধ্যে তাঁবু এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সমেত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কোপির ছায়ায়।

আমি ঋজুদার মুখের দিকে চাইলাম।

খাকি, গোর্খা টুপিটা খুলে ফেলেছে ঋজুদা। মাথার চুলগুলো হাওয়ায় এলোমেলো হচ্ছে। দাঁতে-ধরা পাইপ থেকে পোড়া তামাকের মিষ্টি গন্ধভরা ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে পেছনে। কপালের রেখাগুলো গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে।

আমি মনে মনে একটু আগে শোনা ঋজুদার কথা ক-টি আবৃত্তি করলাম।

আমরা। পথ। হারিয়েছি।

এবং করেই, ওই সামান্য তিনটি কথার ভয়াবহতা প্রথম বার বুঝতে পারলাম।

ঋজুদা আফ্রিকাতে আমাকে আনতে চায়নি। মা-বাবারও প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। সব আমারই দোষ। আমিই নাছোড়বান্দা হয়ে ঋজুদার হাতে-পায়ে ধরে এসেছি।

ভুষুন্ডা আর টেডি আস্তে আস্তে ফিরে আসছে আবার গাড়ির দিকে। ঋজুদা ওদের ফিরে আসতে দেখে কোপি থেকে নীচে নামতে লাগল। আমিও পিছন পিছন নামলাম। আমরা যখন ল্যান্ড-রোভারের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি তখন ওরাও ফিরে এল। ওদের মুখ শুকনো। মুখে ওরা কিছুই বলল না।

ঋজুদা গাড়ির পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে, বনেটের উপর বিছিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল তার উপর। পড়েই, আমাকে বলল, 'দেখ তো রুদ্র, ট্রেলারের এবং জিপের পেছনে সবসুদ্ধু ক-টা জেরিক্যান আছে আমাদের। আর ইঞ্জিনের সুইচ টিপে দেখ গাড়ির ট্যাঙ্কে আর কত পেট্রোল আছে।'

আমি পেট্রোলের হিসেব করতে লাগলাম। ঋজুদা ম্যাপ দেখতে লাগল। তেলের অবস্থা দেখে, জেরিক্যান গুনে হিসেব করে বললাম, 'হাজার কিমি যাওয়ার মতো তেল আছে আর।'

ঋজুদা বলল, 'বলিস কী রে? তাহলে তো অনেকই তেল আছে!'

তারপরই, ওই অবস্থাতেও আমার দিকে ফিরে বলল, 'আর তোর তেল? ফুরোয়নি তো এখনও?'

আমি ফ্যাকাশে মুখে স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বললাম, 'মোটেই না। আমার তেল অত সহজে ফুরোয় না।'

আমি বুঝলাম, ঋজুদা আমাকে সাহস দিচ্ছে। আসলে আমি জানি যে, আফ্রিকার এই তেরো হাজার বর্গকিমির সাভানা ঘাসবনে পথ হারানো আমাদের পক্ষে মোটে হাজার মাইল যাওয়ার মতো তেল থাকা মোটেই ভরসার কথা নয়।

ঋজুদার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। ভুষুন্ডা মাটিতে বসে দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছিল। টেডি পেছনের গাড়ির মাডগার্ডে হেলান দিয়ে উদাস চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঋজুদা বলল, 'লেটস গো।'

আমি বললাম, 'কোন দিকে?'

ঋজুদা বলল, 'ডিউ নর্থ।'

তারপর গাড়ির বাঁ-দিকের দরজা খুলে উঠতে উঠতে বলল, 'তুই-ই চালা। আমি একটু পাইপ খেয়ে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে নিই।'

ভুষুন্ডা আর টেডি পেছনে বসল।

সুইচ টিপে গিয়ারে দিলাম গাড়ি। তারপর একটু লাফাতে লাফাতে হলুদ সোনালি হাঁটু সমান ঘাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল আমাদের ল্যান্ড-রোভার।

ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি ঋজুদাকে একটি কাজের ভার দিয়েছিলেন। সেরেঙ্গেটির ঘাসবন ও গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে যেসব চোরাশিকারিরা আছে তাদের সম্বন্ধে একটি পেপার সাবমিট করতে হবে ঋজুদাকে। এই অভিযানের সব খরচ জুগিয়েছেন সোসাইটি। পূর্ব আফ্রিকার তানজানিয়ান সরকার ঋজুদাকে সবরকম স্বাধীনতা দিয়েছেন। নিজেদের প্রয়োজনে এবং প্রাণরক্ষার জন্যে আমরা যেকোনো জানোয়ার শিকার করতে পারব। চোরাশিকারিদের মোকাবিলা করতে গিয়ে যদি আমাদের প্রাণসংশয় হয় তবে আমরা তাদের উপর গুলিও চালাতে পারি। তার জন্যে কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না।

কিন্তু এর মধ্যে কথা একটাই। সমুদ্রে যেমন একা নৌকো, এই ঘাসের সমুদ্রেও তেমনই একা আমরা, একেবারেই একা।

বোম্বে থেকে প্লেনে ডার-এস-সালামে এসেছিলাম, সেশেলস আইল্যান্ডস হয়ে। তারপর ডার-এস-সালাম থেকে কিলিম্যানজারো এয়ারপোর্টে। মাউন্ট কিলিম্যানজারোর কাছের সেই এয়ারপোর্ট থেকে ছোট্ট প্লেনে করে এসে পৌঁছেছিলাম সেরোনারাতে। সেখানেই আমাদের জন্যে এই ল্যান্ড-রোভার, মালপত্র এবং ভুষুন্ডা ও টেডি অপেক্ষা করছিল। তিন মাস আগে আরুশাতে এসে ঋজুদা, ভুষুন্ডা ও টেডিকে ইন্টারভিউ করে মালপত্রের লিস্ট বানিয়ে ওখানে দিয়ে এসেছিল। ওরা দু-জনই ল্যান্ড-রোভারটা চালিয়ে নিয়ে এসেছে আরুশা থেকে লেক মনিয়ারা এবং গোরোংগোরো হয়ে, সেরোনারাতে।

মোটে দশ দিন বয়স হয়েছে আমাদের এই অভিযানের। গোলমালটা ভুষুন্ডাই করেছে। ওরই ভুল নির্দেশে গত ক-দিনে আমরা ক্রমাগত আড়াই হাজার মাইল গাড়ি চালিয়েছি। এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটি বৃত্তেই ঘুরে বেড়িয়েছি। চোরাশিকারিদের সঙ্গে একবারও মোলাকাত হয়নি, কিন্তু একটি হাতির দল আমাদের খুবই বিপদে ফেলেছিল। যা পেট্রোল ছিল তাতে আমাদের গোরোংগোরোতে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল সহজেই-অভিযানের প্রথম পর্ব শেষ করে। ওখানে পেট্রোল স্টেশন আছে। যে পথ ধরে টুরিস্টরা যান, স্বাভাবিক কারণেই সেই পথে আমরা যাইনি। কারণ চোরাশিকারিরা ওই পথের ধারে-কাছেও থাকে না; বা আসে না। টুরিস্টরা যে পথে যান সেও সেই রকমই! ধু-ধু, হাজার হাজার মাইল ঘাসবনে একটি সরু ছাইরঙা ফিতের মতো পথ চলে গেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। আমরা তাতেও না গিয়ে ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে ম্যাপ দেখে এবং ভুষুন্ডা ও টেডির সাহায্যে গাড়ি চালাচ্ছি।

ভুষুন্ডা চিরদিন এই সাভানা রাজ্যেই শিকারিদের কুলির কাজ করেছে। পায়ে হেঁটে, মাসের পর মাস এই ঘাসবনে কাটিয়েছে প্রতি বছর। এইসব অঞ্চল নিজের

হাতের রেখার মতোই জানা ওর। অথচ আশ্চর্য! ভুষুন্ডাই এ রকম ভুল করল!

কম্পাসের কাঁটাতে চোখ রেখে স্টিয়ারিং সোজা করে শক্ত হাতে ধরে অ্যাক্সিলারেটরে সমান চাপ রেখে চালাচ্ছি আমি। তিরিশ মাইলের বেশি গতি নেই। বেশি জোরে চালানোতে বিপদ আছে। হঠাৎ ওয়ার্ট-হগদের গর্তে পড়ে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই ওয়ার্ট-হগগুলো অদ্ভুত জানোয়ার! অনেকটা আমাদের দেশের শুয়োরের মতো দেখতে। কিন্তু অন্যরকম। ওরা যখন দৌড়োয়, ওদের ল্যাজগুলো তখন উঁচু হয়ে থাকে আর ল্যাজের ডগার কালো চুলগুলো পতাকার মতো ওড়ে। ওরা মাটিতে দাঁত দিয়ে বড়ো বড়ো গর্ত করে এবং তার মধ্যেই থাকে-ওই গর্তে শেয়াল ও হায়নারাও আস্তানা গাড়ে মাঝে মাঝে। ঘাসের মধ্যে কোথায় যে ও-রকম গর্ত আছে আগে থাকতে বোঝা যায় না-তাই খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়।

কেউ কোনো কথা বলছে না। গাড়ি চলছে, পিছনে ধুলোর হালকা মেঘ উড়িয়ে। এখানের ধুলো আমাদের দেশের ধুলোর মতো মিষ্টি নয়। আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত নানারকম ধাতব পদার্থ মিশে আছে মনে হয় এইসব জায়গার ধুলোয়। ধুলোর রংও কেমন লালচে-কালচে সিমেন্টের মতো। ভীষণ ভারী। নাকে-কানে ঢুকলে জ্বালা করতে থাকে।

গাড়ির দু-দিকেই নানারকম জানোয়ার ও পাখি দেখা যাচ্ছে। ডাইনে-বাঁয়ে। কত যে জানোয়ার তার হিসেব করতে বসলে হাজার পেরিয়ে লক্ষে পৌঁছোনো কঠিন নয়। দলে দলে থমসনস গ্যাজেল, গ্রান্টস গ্যাজেল, টোপি, এলান্ড, জেব্রা, ওয়াইল্ড-বিস্ট। চুপিচুপি শেয়াল। রাতের বেলায় বুক-হিম-করা হাসির হায়না। কোথাও-বা একলা সেক্রেটারি বার্ড মাথার ঝাঁকড়া পালকের টুপি নাড়িয়ে বিজ্ঞের মতো একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছে। কোথাও ম্যারাবু সারস। কোথাও একা বা দোকা উটপাখি বাঁই বাঁই করে লম্বা লম্বা ন্যাড়া পায়ে দৌড়ে যাচ্ছে। জিরাফগুলো এমন করে দৌড়োয় যে, দেখলে হাসি পায়। মনে হয় ওদের পাগুলো বুঝি হাঁটু থেকে খুলে বেরিয়ে যাবে যখন-তখন।

প্রথম দু-তিন দিন অত সব জানোয়ার দেখে আমার উত্তেজনার শেষ ছিল না। এখন মনে হচ্ছে যে, যেন চিরদিন আমি আফ্রিকাতেই ছিলাম। জানোয়ার দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেল। সিংহও দেখেছি পাঁচ বার এই ক-দিনে দিনের বেলা। উদলা মাঠে। তারাও একা নয়; সপরিবারে। আমাদের দিকে অবাক চোখে দূর থেকে চেয়ে থেকেছে।

ঋজুদা বলল, 'কত কিলোমিটার এলি রে?'

আমি গাড়ির মিটার দেখে বললাম, 'সত্তর কিলোমিটার।'

ঋজুদা ঘড়ি দেখে বলল, 'দু-ঘণ্টায়!' তারপর নিজের মনেই বলল, 'নট ব্যাড।'

এদিকে সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিমে হেলছে। এখানে গাছগাছালি নেই, তাই ছায়া দেখে বেলা বোঝা যায় না।

দূরদিগন্তে হঠাৎ একটি নীল পাহাড়ের রেখা ফুটে উঠল।

টেডি বিড়বিড় করে বলল, 'মারিয়াবো। মারিয়াবো।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'পোলে পোলে। পোলে সানা।'

ঋজুদা বলল, 'পোলে পোলে কেন? কী হল টেডি?'

সোয়াহিলি ভাষায় 'পোলে পোলে'র বাংলা মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে।

টেডি বলল, 'মাসাইরা থাকে ওই পাহাড়ের নীচে। ওদিকে যেতে সাবধান। ওয়ান্ডারাবোরাও চলে আসে মাঝে মাঝে।'

ভুষুন্ডার চোয়াল শক্ত। ও কথা বলছিল না কোনো।

ওদের দু-জনের মধ্যে ভুষুন্ডা অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে, কম কথা বলে; টেডির চেয়ে ভালো ইংরেজিতে বাতচিত চালায় আমাদের সঙ্গে। টেডির চেয়ে অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও। টেডির স্বভাবটা ছেলেমানুষের মতো, কিন্তু সে সাড়ে ছ-ফুট লম্বা। ওর হাতের আঙুলগুলো কলার কাঁদির মতো। আর ভুষুন্ডা বেঁটেখাটো, কার্পেটের মতো ঘন ঠাসবুনুনির কোঁকড়া চুল মাথায়। পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর জিনের প্যান্টের পকেট থেকে বের করে সিগারেট খায়। টেডি সিগারেট খায় না; নস্যি নেয়। ওর সেই নস্যি আবার মাঝে মাঝে হাওয়াতে উড়ে এসে আমাদের নাকে আচমকা পড়ে দারুণ হাঁচায়।

পরশু দিন একটা থমসনস গ্যাজেলের বাচ্চাকে শেয়ালের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম আমরা। তাকে হ্যাভারস্যাকের মধ্যে রেখেছি। শুধু মুখটা বের করে সে চকচকে চোখে চেয়ে থাকে। হরিণছানাটার নাম রেখেছি আমি কারিব্যু। সোয়াহিলি ভাষায় কারিব্যু মানে স্বাগতম। সেই ছোট্ট হরিণটা বেদম হাঁচতে শুরু করে দিল হঠাৎ।

ঋজুদা পিছন ফিরে টেডিকে বলল, 'টেডি, তোমার নস্যি ওর নাকে গেছে। হাঁচতে হাঁচতে মরার চেয়ে হায়নার হাতে মরা কারিব্যুর পক্ষে অনেক সুখের ছিল।'

টেডি ঋজুদার কথায় হেসে উঠে বাচ্চাটাকে আদর করে বলল, 'নুজরি, নুজরি।'

মানে, ভালোই আছে, ভালোই আছে; কিছুই হয়নি ওর।

তারপরই বলে উঠল, 'কোনো মরাই সুখের নয় বানা। সে হেঁচেই মরো, আর নেচেই মরো। এই যেমন আমাদের এখানের ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরা।'

ওর কথা শুনে ঋজুদা হেসে উঠল। আফ্রিকার এই ঘাসের সমুদ্রে পথ হারিয়ে যাওয়ার পরও এত হাসি আসছে কী করে ঋজুদার তা ঋজুদাই জানে। তা ছাড়া,

এই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরা ব্যাপারটা হাসির নয় মোটেই।

সেরেঙ্গেটিতে খুব সেৎসি মাছি। বড়ো বড়ো কালো কালো মাছি। আমাকে পরশু একটা কামড়েছিল। অসহ্য লাগে কামড়ালে। কলকাতার একশোটা মশা একবারে কামড়ালেও বোধ হয় অমন লাগত না।

এই সেৎসি মাছির কামড়ে এক রকমের অসুখ হয় আফ্রিকাতে। তাকে ওরা সোয়াহিলিতে বলে নাগানা। ইংরেজিতে বলে ইয়ালো-ফিভার। রুগির খুব জ্বর হয়, শরীর হলুদ হয়ে যায়, মাথার গোলমাল দেখা দেয়, আর রুগি পড়ে পড়ে শুধুই ঘুমোয়। তাই এই অসুখের আরেক নাম স্লিপিং-সিকনেস। অনেকরকম সেৎসি মাছি আছে এখানে। সব মাছি কামড়ালেই যে এই অসুখ হবে এমন নয়, কিন্তু কামড়াবার আগে তাদের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দেখানোর কথা বলা তো আর যায় না মাছিদের।

এই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরার অসুখকে টেডিরা যমের মতো ভয় পায়।

ঋজুদা আর আমিও আফ্রিকাতে আসবার আগে খিদিরপুরে গিয়ে ইয়ালো-ফিভারের প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন নিয়ে এসেছিলাম। ভীষণ লেগেছিল তখন। কিন্তু সেৎসি মাছি যখন সত্যি সত্যি কামড়াল তখন মনে হয়েছিল যে, ইঞ্জেকশনের ব্যথা কিছুই নয়।

উচ্চারণ সেৎসি যদিও, কিন্তু বানানটা গোলমেলে। ইংরেজি বানান হচ্ছে Tsetse।

আসলে, এখানে এসে অবধি দেখছি বানান নিয়ে বড়োই গণ্ডগোল। গোরোংগোরো বলছে উচ্চারণের সময়, কিন্তু বানান লিখছে NGORONGORO। সোয়াহিলি শব্দের উচ্চারণে প্রথম অক্ষর যেখানে-সেখানে লোপাট হয়ে যাচ্ছে; যেন তারা বেওয়ারিশ।

এইসব ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, হঠাৎ ঋজুদা আমার স্টিয়ারিং ধরা হাতের ওপরে হাত ছোঁয়াল। ব্রেকে পা দিলাম। ওই মারিয়াবো পাহাড়শ্রেণির সামনে একজায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। মানুষ আছে? ঘাসবনে আগুনও লাগতে পারে। কিন্তু বনে আগুন লাগার ধোঁয়া অন্যরকম হয়। জায়গাটা মাইল দশেক দূরে।

ঋজুদা বলল, 'গাড়ি থামা।'

বললাম, 'এগোব না আর?'

ঋজুদা বলল, 'গাধা!'

ভাগ্যিস ভুষুন্ডা আর টেডি বাংলা জানে না।

আমি বললাম, 'এগোবে না কেন?'

ঋজুদা বলল, 'পাহাড়ের কাছ থেকে আমাদের গাড়ি সহজেই দেখতে পাবে ওরা। এই সেরেঙ্গেটিতে আইনত কোনো মানুষের থাকার কথা নয়। যারা ওখানে উনুন ধরিয়েছে বা অন্য কিছুর জন্যে আগুন জ্বেলেছে তারা নিশ্চয়ই আইন মানে না। আমরা ওখানে পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধ্যের অন্ধকারও নেমে আসবে। আজ এখানেই ক্যাম্প করা যাক। আসন্ন রাতে এগোনো ঠিক হবে না।'

নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, 'তুই কী বলিস রুদ্র?'

আমি বললাম, 'ওরা আমাদের দেখেই যদি থাকে, তাহলেও তো রাতের বেলা আক্রমণ করতে পারে।'

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, 'রুদ্রবাবু একটু ভয় পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে যেন!'

আমি বললাম, 'ভয় নয়, সাবধানতার কথা বলছি।'

ঋজুদা বলল, 'দেখে থাকতেও পারে, না-ও দেখে থাকতে পারে। তবে যদি দেখে থাকে, তাহলে আক্রমণও করতে পারে। এবং সেই জন্যে রাতে আমাদের সজাগ থাকতে হবে; পালা করে পাহারা দিতে হবে। আক্রমণ করতে গেলে তাদেরও তো এই দশ মাইল ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে আসতে হবে। তাই পাহাড় থেকে এই দূরেই তাঁবু ফেলতে চাই। এলে তাদের দূর থেকে দেখা যাবে।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

তারপর ঋজুদা আর টেডি নীচের ঘাস পরিষ্কার করে তাঁবু খাটাতে লেগে গেল।

আমি আর ভুষুন্ডা চায়ের জল বসিয়ে দিলাম স্টোভে। এখানে খুব সাবধানে আগুন-টাগুন জ্বালতে হয়। যখন-তখন ঘাসে আগুন লেগে যেতে পারে।

তাঁবু খাটাতে খাটাতে ঋজুদা বলল, 'চা-ই কর রুদ্র। রাতে বরং কফি খাওয়া যাবে।'

তারপর বলল, 'তুই প্রথমরাতে জাগবি, না শেষরাতে?'

আমি বললাম, 'একবার ঘুমিয়ে পড়লে ঠান্ডাতে মাঝরাতে ঘুম ছাড়ে না চোখ। আমি প্রথমরাত জাগি; তুমি শেষরাতে।'

তারপর শুধোলাম, 'ক-টা অবধি জাগব আমি?'

ঋজুদা বলল, 'বারোটা অবধি জাগিস। খেয়েদেয়ে আমরা তো ন-টার মধ্যে শুয়ে পড়ব সব শেষ করে। ন-টা থেকে বারোটা, তিন ঘণ্টা ঘুমোলেই বাকি রাত জাগতে পারব আমি। রুদ্রবাবু বলে ব্যাপার। তাকে কি বেশি কষ্ট দেওয়া যায়! অনার্ড গেস্ট। ক্যালকেশিয়ান মাখনবাবু!'

আমি বললাম, 'ঋজুদা! অনেক বছর আগেও আমাকে যা বলতে, এখনও তাই-ই বলবে এটা কিন্তু ঠিক নয়।'

ঋজুদা বলল, 'আলবত বলব, আজীবন বলব; তোর যখন আশি বছর বয়স হবে তখনও বলব, অবশ্য যদি তখন আমি বেঁচে থাকি!'

হঠাৎ হঠাৎ এইসব কথায় আমার মন বড়ো খারাপ হয়ে যায়। ঋজুদার সঙ্গে গত কয়েক বছর বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে এমনই দশা হয়েছে আমার যে, ভাবলেও দম বন্ধ হয়ে আসে। ঋজুদা না থাকলে আমার কী হবে?

কলকাতায় আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সেখানে যে আকাশ দেখা যায় না। তারা, চাঁদ, সূর্য কিছুই দেখা যায় না। সেখানে কখন ভোর হয় কেউই খোঁজ রাখে না তার। সন্ধ্যে, চুপিসারে দিগন্তে দিগন্তে আলো-ছায়ার কত দারুণ দারুণ ছবি এঁকে রোজ কেমন করে নিত্যনতুন হয়ে আসে, অথবা চলে যাওয়া দিনের সঙ্গে ফিরে আসা রাতের কোন আঙিনাতে কেমন করে দেখা হয় রোজ রোজ, তার খবরও কেউ নেয় না। হাওয়ায় সেখানে ডিজেল আর কয়লার ধোঁয়া, সেখানে গাছ থেকে একটি পাতা খসে পড়ার যে সুস্পষ্ট আওয়াজ তা কেউই শোনে না, শুনতে পায় না; পায় না জানতে শিশিরের পায়ের শব্দ, দুপুরের একলা ভীরু পাখির চিকনগলার ডাক, অথবা ভোরের পাখিদের গানও শোনে না সেখানে কেউ। ফুলের গন্ধ পায় না নাকে। তাদের নাক, কান, চোখ সব অকেজো, অব্যবহৃত যন্ত্রের মতোই তারা মিছিমিছি বয়ে বেড়ায়। তাদের মন আটকে থাকে পাশের বাড়িতে, গলির মোড়ে, অফিসের ঘর অথবা রাস্তার ভিড়ে। দিগন্তরেখা কাকে বলে, বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি কী, উদারতা কোথায় অনুভব করা যায়-এসব কিছুরই খবর জানে না শহরের মানুষ। অথচ আমাদের সকলেরই হাতের কত কাছে এই সবই ছিল এবং আজও আছে তা ঋজুদা যদি এমন করে আমাকে হাতে ধরে না চেনাত, না বোঝাত, তাহলে বুঝতাম বা চিনতাম কি কখনো? ঋজুদাই তো হাত ধরে নিয়ে এসে এই আশ্চর্য আনন্দের, অনাবিল, সুন্দর, সুগন্ধি বনের কাকলিমুখর জগতে, প্রকৃতিমায়ের কোলে এনে বসিয়ে আমাকে আসল মজার উৎস, আসল আনন্দের ফোয়ারার খোঁজ দিয়েছে।

আমি যে ঋজুদার কাছ থেকে কী পেয়েছি তা আমার ক্লাসের কোনো বন্ধুই জানবে না। ভাবতেও পারে না ওরা। সেই কারণেই শুধু আমিই জানি, ঋজুদা কখনো 'থাকব না' বললে কেন আমার এত পাগল পাগল লাগে!

এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। পশ্চিমাকাশে আস্তে আস্তে নীচু হয়ে সূর্যটা একটা বিরাট কমলারঙা বলের মতো ঘাসের হলুদ দিগন্তকে কমলা আলোর বন্যায় ভাসিয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তারপরও বহুক্ষণ গাঢ় ও ফিকে গোলাপির আভা লেগে রইল আকাশময়।

ঘাস পরিষ্কার করে নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তারই চারপাশে বসেছি আমরা চার জনে। ভুষুন্ডা আমাদের পথপ্রদর্শক, অন্য কাজ করতে বললে বিরক্ত ও

অপমানিত বোধ করে। আমরা বলিও না। টেডি রান্না চাপিয়েছে। আমি থমসনস গ্যাজেলের বাচ্চাটাকে কোলে করে বসে আছি। ওর গলার কাছের শেয়ালের কামড়ের ঘা এখনও শুকোয়নি। খুব ভালো করে লাল মার্কুরিয়োক্রোম লাগিয়ে দিয়েছিল টেডি।

ঋজুদা যখন আরুশাতে এসেছিল তখন ওর একজন আফ্রিকান বন্ধু একটা মিরশ্যাম পাইপ উপহার দিয়েছিলেন। আরুশাতে একটি কোম্পানি আছে, তারা মিরশ্যাম কাদা দিয়ে পাইপ, অ্যাশট্রে, ফুলদানি ইত্যাদি বানায়। মিরশ্যাম আসলে সমুদ্রের এক বিশেষ রকমের কাদা। এ দিয়ে তৈরি পাইপের রং বদলাতে থাকে খাওয়ার সময়, আগুনের তাপের সঙ্গে সঙ্গে। অর্গানন ব্ল্যাকউড-এর লেখা শিকারের বইয়ে প্রথম এই মিরশ্যাম পাইপের কথা পড়ি আমি।

টেডি সকলের জন্যে একটিই পদ রান্না করেছে। খিচুড়ির মতো। কিন্তু ঠিক আমাদের খিচুড়ির মতো নয়। ওরা সোয়াহিলি ভাষায় বলে, উগালি। ভুট্টার দানার মধ্যে গ্রান্টস গ্যাজেলের মাংস দিয়ে সেই উগালি রান্না হচ্ছে। দারুণ গন্ধ ছেড়েছে। খিদেও পেয়েছে ভীষণ। একটি গ্রান্টস গ্যাজেল ও একটি থমসনস গ্যাজেল শিকার করে আমরা তাদের মাংস স্মোকড করে নিয়েছি। ট্রেলারের মধ্যে বস্তা করে রাখা আছে সে মাংস।

পাইপের তামাকের মিষ্টি গন্ধ ভাসছে হাওয়ায় আর আমি মিরশ্যাম পাইপের রং-বদলানো দেখছি। ভুষুন্ডা ম্যাপটা খুলে ঋজুদার সঙ্গে কথা বলছে। মাঝে মাঝে সোয়াহিলিতেও বলছে। এখানে আসার আগেই ঋজুদা সোয়াহিলি শিখে নিয়েছে মোটামুটি। আমাকেও একটা বই দিয়েছিল, কিন্তু কয়েকটা শব্দ ছাড়া বেশি শিখিনি আমি। বড়ো খটমট শব্দগুলো। জাম্বো মানে হ্যালো, সিম্বা মানে সিংহ, টেম্বো মানে হাতি, চুই মানে লেপার্ড। কারও সঙ্গে দেখা হলে ইংরেজিতে যেমন আমরা বলি হ্যালো বা আমেরিকান-ইংরেজিতে হাই! সোয়াহিলিতে সেই সম্বোধনকে বলে জাম্বো! আমি যদি কাউকে বলি জাম্বো, সে উত্তরে বলবে সিজাম্বো।

শীত বেশ বেশি। যদিও এখন জুলাই মাস, কিন্তু আফ্রিকাতে এখন শীতকাল। হাজার হাজার মাইল ঘাসবনের উপর দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে আসছে হু-হু করে। আমার উইন্ড-চিটারের কলারের কোনাটা পতপত করে উড়ছে। ঋজুদার জার্কিনের বুকপকেট থেকে টোবাকোর পাউচটা উঁকি মারছে আর ডান দিকের নীচের পকেটের মধ্যে পয়েন্ট থ্রি টু কোল্ট পিস্তলটা পোঁটলা হয়ে আছে।

কথাবার্তা শুনে মনে হল, ভুষুন্ডার আপত্তি আছে ভীষণ মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে যেতে। ও বলছে, ওদিকে চোরাশিকারিদের এত বড়ো আস্তানা আছে এবং ওদের

কাছে এতরকম অস্ত্রশস্ত্র আছে যে, আমাদের ওরা গুলিতে ভেজে নিয়ে খেয়ে ফেলবে বেমালুম।

ঋজুদা জেদ করছে, আজ রাতে কোনো ঘটনা না ঘটলে কাল সকালে আমরা ওদিকেই যাব।

ঋজুদার সিদ্ধান্তে ভুষুন্ডা বেশ অসন্তুষ্ট হল। যে লোক গাইডের কথা না শুনে নিজের মতেই চলে, তার গাইডের দরকার কী? এই কথা বলল ভুষুন্ডা বেশ জোর গলায়।

তার উত্তরে ঋজুদা বলল, 'যে গাইড সেরেঙ্গেটির মধ্যে রাস্তা ও দিক হারিয়ে ফেলে তেমন গাইড থাকা-না-থাকা সমান।'

ঋজুদা কখনো এমন করে কথা বলে না কাউকে। তাই অবাক হলাম। তারপর আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে ঋজুদা ভুষুন্ডাকে বলল, 'ইচ্ছে করলে, যেকোনো জায়গাতে, যেকোনোদিন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পার।'

এই কথা শুনে আমি ভয়ও পেলাম, চমকেও উঠলাম।

ভুষুন্ডা ঠান্ডা চোখে ঋজুদার দিকে চাইল।

ঋজুদা ভুষুন্ডার চোখের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে, ভুষুন্ডার চোখে নিজের চোখ দিয়ে এক বালতি বরফ জল ঢেলে দিল।

ব্যাপার বেশ গোলমেলে মনে হচ্ছে। একে বিদেশবিভুঁই, হাজার হাজার মাইল জনমানবহীন হিংস্র জানোয়ারে, নানারকম দুর্দান্ত উপজাতিতে এবং সাংঘাতিক সব চোরাশিকারিতে ভরা আফ্রিকার বনজঙ্গলে স্থানীয় গাইড ছাড়া আমরা কী করে চলব, তা ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে আসছিল। গাইড থাকতেও পথ হারালাম। আর গাইড না থাকলে যে কী হবে! এদিকে তেলও বেশি নেই সঙ্গে। তেল ফুরোলে তো গাড়ি ফেলে রেখে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। কিন্তু কোনদিকে যাব? হাজার হাজার মাইল তো আর পায়ে হেঁটে যেতে পারব না! খাওয়ার জলের অভাবে তো এমনিতেই মরে যাব, খাবারের অভাবে যদি না-ও মরি।

ঋজুদাকে বললাম, 'ঋজুদা, তুমি রেগে গেছ, কিন্তু কাজটা কি ভালো হচ্ছে? ভেবে দেখো।'

ঋজুদা বলল, 'খুব ভালো হচ্ছে। তুই পাকামি না করে রান্নার কতদূর দেখ। দরকার হলে টেডিকে সাহায্য কর একটু।'

আমি চুপ করে গেলাম। ভাবলাম, সাহায্য আর কী করব? রাঁধছে তো শুধু উগালি। তাও প্রায় হয়ে এসেছে।

আমাদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল। ভুষুন্ডা গাড়িতেই শোয়। টেডি ভীষণ লম্বা বলে গাড়িতে শুতে পারে না। ছোটো তাঁবুটাতে শোয় ও। আমি আর ঋজুদা শুই বড়ো

তাঁবুটাতে। আজ আমি শোব না এখন। পাহারা দিতে হবে। তাই রাইফেলে গুলি ভরে, টুপি পরে আমি তাঁবুর বাইরে আগুনের পাশে ক্যাম্পচেয়ারে বসলাম। বাইরে যদি শীত বেশি লাগে, তবে মাঝে মাঝে ল্যান্ড-রোভারের সামনের সিটেও গিয়ে বসব।

ঋজুদা বলল, 'কিছু দেখতে পেলে আমাকে ডাকিস। আর ঠিক রাত বারোটাতে তুলে দিস আমাকে।'

বললাম, 'আচ্ছা।'

ঋজুদা পর্দা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আমি ক্যাম্পচেয়ারে বসে জুতোসুদ্ধু পা-দুটো লম্বা করে আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেডি মহম্মদের নাকডাকার আওয়াজ সেই প্রায়-নিস্তব্ধ রাতের ঘাসবনে বিকট হয়ে উঠল। সেই ডাকের কী আরোহণ-অবরোহণ, কত গমক আর গিটকিরি। টেপ রেকর্ডার আছে সঙ্গে, কিন্তু তাতে টেডির নাকডাকার আওয়াজ টেপ করলে ঋজুদা মার লাগাবে। তাঁবুর মধ্যে, পিস্তলের গুলি খুলে আবার পিস্তল কক করার শব্দ শুনলাম। রি-লোড করে পিস্তল কক করল ঋজুদা, তার শব্দ শুনলাম। রোজ শোবার সময় মাথার বালিশের নীচে পিস্তলটাকে রাখে ঋজুদা। আর সারাদিন জার্কিনের কোটের পকেটে।

গাড়ির মধ্যে ভুষুন্ডা ঘুমোচ্ছে। কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে নড়াচড়ার উশখুশ আওয়াজ।

আধ ঘণ্টা পর শুধু টেডির নাকডাকার আওয়াজ ছাড়া অন্য আর কোনো আওয়াজই রইল না।

একটু পরে আগুনটাও ফিসফিস করে কী যেন বলে নিভে গেল। কাঠের না যে, অনেকক্ষণ জ্বলবে। কটন ওয়েস্ট-এর সঙ্গে পোড়া মবিল মিশিয়ে তার সঙ্গে টুকিটাকি ও ঘাস-টাস ফেলে আগুন করা হয়েছিল। কাল থেকে আগুন জ্বালারও কিছু রইল না। সঙ্গে কেরোসিনের স্টোভ আছে অবশ্য, তাতেই রান্না হবে।

উপরে তারাভরা আকাশ। এখন একটু চাঁদও উঠেছে। হাওয়াটা আরও জোর হয়েছে। হঠাৎ পিছন দিক থেকে হাঃ হাঃ হাঃ করে বুকের ভিতরে চমক তুলে হায়না ডেকে উঠল। তারপর ঘাসের মধ্যে খসখস করে তাদের এদিকে এগিয়ে আসবার শব্দ পেলাম।

কারিব্যুর ঘা-টা এখনও পুরো শুকোয়নি। হয়তো রক্তের গন্ধ পেয়ে থাকবে হায়নাগুলো। পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা ওদের দিকে ফেললাম। ওরা কিছুক্ষণ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

হঠাৎ কী একটা জন্তু উড়তে উড়তে লাফাতে লাফাতে এদিকে আসতে লাগল। জানোয়ারটা ছোটো। কী জন্তু যে, তা বুঝতে পারলাম না। সামনে থেকে টর্চ ফেললাম। দেখলাম লোমওয়ালা একটা জানোয়ার-আমাদের দেশের বড়ো হিমালয়ান কাঠবিড়ালির মতো অনেকটা-গায়ের রং যদিও অন্যরকম। আর যেই সেই জানোয়ারটা আমাদের তাঁবুকে পাশে রেখে, তাঁবু দেখে ঘাবড়ে গিয়ে উড়ে সরে যেতে গেল, তখন পাশ থেকে আলো ফেলতেই চোখ জ্বলে উঠল জ্বলজ্বল করে। কিন্তু একটা চোখ। অথচ যখন সামনাসামনি আলো ফেলেছিলাম তখন একবারও জ্বলেনি চোখ দুটো। কী জন্তু কে জানে? কাল জিজ্ঞেস করতে হবে ঋজুদাকে। এমন কিছু আমাদের দেশের জঙ্গলে দেখিনি, আফ্রিকাতে আছে বলে পড়িওনি।

উড়ে যাওয়া জন্তুটা যেদিকে মিলিয়ে গেল সেই দিকে চেয়েছিলাম, এমন সময় দূর থেকে বার বার সিংহের গর্জন ভেসে আসতে লাগল। কিছুক্ষণ পরই পায়ে পায়ে জোর খুরের শব্দ তুলে ওয়াইল্ড-বিস্টদের বিরাট একটি দল তাঁবুর দু-শো গজের মধ্যে দিয়ে শিশির-ভেজা মাটির গন্ধ উড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল। সিংহের দল বোধ হয় তাড়া করেছে ওদের।

ঠান্ডা লাগছিল বেশ। গিয়ে ল্যান্ড-রোভারের সামনের দরজা খুলে বসলাম। ভুষুন্ডা গাঢ় ঘুমে আছে মনে হল। কোনো সাড়াশব্দই নেই।

মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখতে যাব ক-টা বাজে, এমন সময় মনে হল, মারিয়াবো পাহাড়ের দিক থেকে কী একটা জানোয়ার আসছে এদিকে। একলা জানোয়ারটা বেশ কাছে এসে গেছে। তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলে নেমে গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে খুব ভালো করে তাকালাম ওদিকে।

আশ্চর্য! জানোয়ার তো নয়! মনে হচ্ছে মানুষ। দু-বার চোখ কচলে নিলাম। পৃথিবীর মানুষ এরকম হয়? কী লম্বা! প্রায় সাত ফিটের মতো হবে। চলে আসছে সোজা আমাদের তাঁবুর দিকে। অদ্ভুত পোশাক তার। হাতে একটা বিরাট লম্বা লাঠি।

টর্চ ফেলব কি না ভাবলাম একবার। তারপর ভাবলাম, ঋজুদাকে ডাকি। আরেকবার ভাবলাম, ঘড়িটা দেখি, ক-টা বেজেছে; কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। কে যেন আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল। আমার সারা শরীর অসাড় হয়ে গেল। এই কি তবে টেডির উনকুলুকুলু? সেদিন রাতে টেডি আমাকে এই গল্প বলেছিল।

লোকটি যখন আরও কাছে এসে গেছে তখন কানের কাছে হঠাৎ কে যেন ফিসফিস করে বলল, 'মাসাই চিফ। গ্রেট ট্রাবল। শুট হিম। কিল হিম।'

এক পলকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, ভুষুন্ডা গাড়ির ভিতরে সোজা শক্ত হয়ে বসে উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে ওইদিকেই তাকিয়ে আছে।

রাইফেলটা কাঁধে তুললাম। কাঁধে তুলতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। তারপরে রাইফেল স্টেডি পজিশানে ধরে ট্রিগারের দিকে হাত বাড়ালাম। ঠিক সেই অবস্থাতে আমার হঠাৎ মনে হল যে, মানুষটা অন্য মহাদেশের অজানা ভাষা-বলা কোনো অদ্ভুত মানুষ বটে, বিকট দেখতে বটে, কিন্তু সে তো আমার কোনো ক্ষতি করেনি। সে চোরাশিকারি কি না, তাও জানি না। ঠান্ডা মাথায় একজন মানুষকে গুলি করে মারতে পারব কি আমি? আমার হাত কাঁপবে না?

ভুষুন্ডা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ইউ ডোন্ট কিল, হি কিল ইউ!'

আমি ট্রিগারে হাত ছোঁওয়ালাম।

ততক্ষণে মানুষটা প্রায় এসে গেছে। সে সোজা আমারই দিকে আসছে।

কী সাহস! এই রাতে, এইরকম হিংস্র জানোয়ারে ভরা রাতে একা একা শুধু একটা লাঠি হাতে দূর থেকে হেঁটে আসার কথা ভেবেই আমার শরীর খারাপ লাগতে লাগল। লোকটা দেখতে পেয়েছে যে, তার বুক লক্ষ্য করে আমি রাইফেল তুলেছি। তবু তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। পৃথিবীর কোনো মানুষ তার ক্ষতি করতে পারে এমন কথা বোধ হয় তার ভাবনারও বাইরে।

তবে? লোকটা কি পৃথিবীর মানুষ নয়? উনকুলুকুলু?

এ কী! লোকটা যে এসে গেল! লালচে-কালো ভারী মোটা কাপড়ের পোশাক, লুঙ্গির মতো অনেকটা; বুকের কাছে গিঁট দিয়ে বাঁধা। আরেক খণ্ড ওইরকম কাপড় চাদরের মতো জড়ানো বুকে-কাঁধে। ডান হাতে ওটা লাঠি নয়, একটা বর্শা, তার সাত ফিট মাথা ছাড়িয়ে আরও উঁচু হয়ে আছে। কোমরে বাঁধা আছে একটা প্রকাণ্ড দা। গলায়, কানে, অদ্ভুত সব বড়ো বড়ো রঙিন পাথরের আর হাড়ের গয়না। চাঁদের ফিকে আলোতেও তার মুখ আর কপালের রঙিন আঁকিবুঁকি অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

রাইফেল ধরেই আছি, লোকটাও এগিয়েই আসছে, আসছে; এসে গেল।

ভুষুন্ডা গাড়ির ভিতর থেকে আবার চাপা গলায় বলল, 'কিল হিম, ইউ ফুলিশ বয়।'

আমাকে বয় বলতেই রেগে গিয়ে যেন হুঁশ ফিরে পেলাম। আর হুঁশ ফিরে পেয়েই, যেই ট্রিগার টানতে যাব, তার আগেই লোকটা আমার রাইফেলটাকে ঠিক মাঝখানে তার দারুণ লম্বা মিশকালো হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে ফেলে ডান দিকে ঠেলে তুলে সরিয়ে দিল। আর সেই অবস্থাতেই, নলের মুখ থেকে আগুনের ঝলকের সঙ্গে গুলিটাও বেরিয়ে গেল আধো-অন্ধকারে। রাইফেলের গুলির সেই আওয়াজ শূন্য প্রান্তরে ছড়িয়ে গেল হু-হু হাওয়ার সঙ্গে হাঃ হাঃ হাঃ করে, যেন আমাকেই ঠাট্টা করে।

লোকটা রাইফেলের নলটা ধরেই ছিল। নলটা ওই অবস্থাতেই ধরে থেকে আমার চোখে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। কী ভয়াবহ জ্বলন্ত দৃষ্টি। কীরকম খোদাই করা কালো মুখ।

তারপরই, এক ঝটকায় রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে সে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল।

এমন সময় ঋজুদা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা ডান কাঁধের সামনে তুলে বলল, 'জাম্বো!'

লোকটাও বলল, 'জাম্বো!'

বলেই পিচিক করে, প্রায় আমার মুখের উপরেই, একগাদা থুতু ফেলল।

তারপর কাটা কাটা সংক্ষিপ্ত গম্ভীর স্বরে ছোটো ছোটো শব্দে ঋজুদার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সেই ভাষা সোয়াহিলি নয়। হয়তো মাসাইদের ভাষা।

ঋজুদা তাকে ক্যাম্প চেয়ার পেতে বসাল। তারপর তাঁবুর ভিতরে গিয়ে এক টিন কনডেনসড মিল্ক আর একটা আয়না এনে মাসাই চিফকে উপহার দিল। কাউকে উপহার দেবে বলে, নতুন চকচকে আয়না যে ঋজুদা সঙ্গে করে আনতে পারে আফ্রিকার বনেও, তা আমার জানার কথা ছিল না।

এমন সময় মারিয়াবো পাহাড় যেদিকে, সেই দিক থেকে বহু লোকের গলার চিৎকার এবং দ্রিদিম, দ্রিদিম, দ্রিদিম-গম্ভীর, গায়ে-কাঁটা-দেওয়া মাদলের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। লোকগুলো মাঝে মাঝে একসঙ্গে বুক-কাঁপানো চিৎকার করে উঠছিল।

ঋজুদা এসে আমাকে বলল, 'তুই একটা ইডিয়ট। আমাকে ডাকলি না কেন? কে তোকে গুলি করতে বলল? দেখ তো এখন কী কাণ্ড বাধালি!'

তারপরই বলল, 'এক্ষুনি ক্ষমা চা তুই মাসাই-সর্দারের কাছে। ওরা আমাদের বন্ধু; শত্রু নয়।'

হাত-পা সব ঠান্ডা হয়ে গেছিল। আমরা এই ক-জন আর ওরা কত লোক। ওরা বর্শা দিয়েই সিংহশিকার করে শুনেছি, তার উপর বিষাক্ত তিরও আছে ওদের। আমার তলপেট গুড়গুড় করছিল ভয়ে। দূরের মাদলের শব্দে আর চিৎকারে। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে, হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলাম আমি।

ঋজুদা কী যেন বলল, মাসাই-সর্দারকে। শুধু দুটো শব্দ উচ্চারণ করল। এবং সর্দার সঙ্গে সঙ্গে আরেকবার পিচিক করে থুতু ফেলে একটু থুতু নিজের ডান হাতের তেলোতে নিয়ে দু-হাতের পাতা ভালো করে ভিজিয়ে আমার মুখটাকে দু-হাত দিয়ে ধরল। আমার মনে হল, সিংহের মুখে নেংটি ইঁদুর পড়েছে। আমার মুখটা দু-হাতে ধরা অবস্থাতেই সর্দার আমার মাথার ঠিক মধ্যিখানে আবার সশব্দে থুতু ফেলল। কী দুর্গন্ধ! গা গুলিয়ে উঠল আমার! এর চেয়ে এদের তির খেয়ে মরাও ভালো ছিল।

ঋজুদার উপর ভীষণই রাগ হতে লাগল। একে তো হাঁটু গেড়ে বসিয়ে ক্ষমা চাওয়াল, তারপর থুতু খাওয়াল। এখন থুতু দিয়ে চান করাল।

ততক্ষণে ভুষুন্ডা এবং টেডি মহম্মদও চলে এসেছে। কিন্তু অন্ধকার দিগন্তে অসংখ্য মশাল জ্বেলে রংবেরঙের ঢাল আর পালক-লাগানো বল্লম হাতে শয়ে শয়ে মাসাইরা এগিয়ে আসছে আমাদের তাঁবুর দিকে।

ওদের আসতে দেখেই ঋজুদার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সর্দার ল্যান্ড-রোভারের বনেটের উপরে উঠে দাঁড়াল সাবধানে। টর্চ দিয়ে আকাশে আলো ফেলে ফেলে সেই আগন্তুক লোকদের যেন কী ইশারা করল। তারপর ডান হাত তুলে বলল, 'মারিয়াবো, সিরিঙ্গেট, মিগুংগা; নিয়ারাবোরো।'

বলেই, পিচিক করে আরেকবার থুতু ফেলে এক লাফ দিয়ে গাড়ির বনেট থেকে নামল। সঙ্গেসঙ্গেই আগন্তুক লোকগুলো দূর থেকেই হইচই করতে করতে ফিরে যেতে লাগল, যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে। কীসব বলতে বলতে।

ঋজুদা আমাকে বলল, 'রুদ্র, এখানে তো স্নানের জল নেই। আমার হ্যাভারস্যাকে বড়ো এক শিশি ওডিকোলন আছে। বুকে-মাথায় মেখে শুয়ে পড় গিয়ে। তোর আর থাকতে হবে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে।'

মুখ নীচু করে রাইফেলটা যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে গিয়ে সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ওডিকোলনের শিশি উপুড় করেও কিছুই সুরাহা হল না। সেই দুর্গন্ধ আরও বেড়েই গেল।

শুনেছিলাম, মাসাইরা নাকি শুধু রক্ত আর দুধ খেয়ে থাকে। তাই বোধ হয় ওদের থুতুতে এরকম দুর্গন্ধ!

উত্তেজনায় ও দুর্গন্ধে ঘুম আসছিল না, তবুও ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঋজুদা কোনোদিনও আমাকে ইডিয়ট বলেনি। আজই প্রথম বলল। কিন্তু এতই ভয় পেয়েছিলাম আর উত্তেজিত হয়েছিলাম যে, এত বড়ো অপমানটাও সর্দারের থুতুর সঙ্গে হজম করে ফেললাম।

শুয়ে শুয়ে সর্দারের মুখটা মনে করছিলাম। ঋজুদা বলেছিল, মাসাই চিফ-এর নাম নাইরোবি সর্দার।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি ঋজুদা নিজেই ব্রেকফাস্ট বানিয়ে ফেলেছে। কনডেনসড মিল্ক জলে গুলে, গরম করে নাইরোবি সর্দারকে আদর করে খেতে দিল। সঙ্গে ওয়াইল্ড-বিস্টের রোস্ট।

সর্দার শুধুই দুধ খেল, কিন্তু মুখ দেখে মনে হল ওই টিনের দুধ তার মোটেই ভালো ঠেকল না।

সর্দার বলল, 'আমরা কাঁচা দুধ খাই, আর রক্ত খাই টাটকা। তোমরা যখন যাচ্ছই আমাদের ওখানে, তখন তোমাদেরও খাওয়াব।'

বলে কী রে? কাল থুতু মেখেছি মুখে-মাথায়, আজ আবার কাঁচা রক্ত খেতে হবে! ঋজুদার সঙ্গে আফ্রিকাতে না এলেই ভালো হত!

ভুষুন্ডা, দেখলাম, একটু দূরে দূরেই থাকছে। কথাবার্তা বিশেষ বলছে না। যদিও ও এই অঞ্চলের সব ভাষা ভালোই জানে। ঋজুদা যে ওর সাহায্য ছাড়াই মাসাই-সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারবে সেকথা ও বোধ হয় আগে বুঝতে পারেনি। সেকথা বুঝে খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না ভুষুন্ডা। ঋজুদাকে এখনও বলাই হয়নি যে, আমাকে 'ফুলিশ বয়' বলে, কাল ভুষুন্ডাই গুলি করতে বলেছিল। নইলে আমি সর্দারের দিকে রাইফেল তুলতামই না।

টেডি খুব কাজকর্ম করছে। নাইরোবি সর্দার দয়া করে টেডিকে একটু নস্যি দিল। আমাদের কাছে একটু, কিন্তু টেডি আর সর্দারের নাক যত বড়ো তাদের নাকের ফুটোটাও তত বড়ো। একশো গ্রাম করে নস্যি দিব্যি ঢুকে গেল এক-এক নাকে। যেটুকু উড়ে এল হাওয়ায় তাতেই হাঁচতে লাগল ঋজুদা। আমিও।

খাওয়াদাওয়া হতেই তাঁবু-টাবু সব হাতে হাতে উঠিয়ে ফেললাম আমরা। মালপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলে দিলাম।

ঋজুদা বলল, 'চল, আমরা এখন নাইরোবি সর্দারের গ্রামে যাব। ওর সঙ্গে দেখা না হলে আমরা জলের অভাবে নিশ্চয়ই মারা যেতাম। পথও খুঁজে পেতাম না। আমাদের যিনি গাইড, ভু-বাবু, তার ভূগোলের জ্ঞান মনে হচ্ছে তোরই মতো। কী করে গাইড হল কে জানে?'

আমি বললাম, 'জান তো, কাল রাতে ভুষুন্ডাই আমাকে গুলি করে মেরে ফেলতে বলেছিল সর্দারকে।'

ঋজুদা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কী ভাবল, তারপর বলল, 'হয়তো ভয় পেয়েছিল। ভুল করেছিল ভুষুন্ডা।'

তারপর বলল, 'এখন ও নিয়ে আলোচনা করিস না। ভুষুন্ডা শুনতে পাবে।'

আমি বললাম, 'শুনতে পেলেই-বা কী? এখানে বাংলাই তো সকলের কাছে হিব্রু-ল্যাটিন। বাংলাতে আমরা যা খুশি তাই বলতে পারি।'

ঋজুদা বলল, 'কারেক্ট।'

তারপর বলল, 'তবে পুরোপুরিই বাংলা বলিস-আর্ধেক ইংরেজি, আর্ধেক বাংলার খিচুড়ি নয়। ইংরেজি বুঝে যাবে ও!'

বললাম, 'আচ্ছা।'

সবাই গাড়িতে উঠলাম। নাইরোবি সর্দার বনেটের উপরই বসল, দু-হাত দিয়ে দু-দিক ধরে। সে এতই লম্বা-চওড়া যে, ভিতরে আঁটল না। সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ঋজুদা, উইন্ডস্ক্রিন ভরে আছে লাল পোশাকের, নস্যি-কালো, নাইরোবি সর্দার।

কী করে যে গাড়ি চালাবে ঋজুদা জানি না। অবশ্য এখানে পথ দেখার কিছু নেই। দেখলাম, ঋজুদা ডান দিকের জানালা দিয়ে মুখ বের করে গাড়ি স্টার্ট করল।

গাড়িতে আমরা সকলেই চুপচাপ। উইন্ডস্ক্রিনটা একটু উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাওয়া আসার জন্যে। বনেটের উপর সর্দার বসে থাকায় খুবই আস্তে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল-জোরে চালালে আমাদের গাড়ির তলাতেই পড়ে মারা যাবে সর্দার, তখন আর দেখতে হবে না-কাল রাতের মতো দ্রিদিম দ্রিদিম হুলা হুলা সব দৌড়ে আসবে।

আমি বললাম, 'আমরা যে রাস্তা ভুলে গেছি, আমাদের ঠিক রাস্তা বাতলে দেবে কে? সর্দার?'

ঋজুদা বলল, 'হ্যাঁ। তা নয়তো আর যাচ্ছি কেন? তা ছাড়া, তেলের সঙ্গে জলও কমে এসেছে আমাদের। পাহাড়ের ঝরনা থেকে জল ভরে নেব। আবারও যে রাস্তা ভুল হবে না বা অন্য কোনো বিপদ হবে না তা কে বলতে পারে?'

ঋজুদাকে শুধোলাম, 'নাইরোবি তো একটা শহরের নাম। কেনিয়াতে না শহরটা? শুনেছি, খুব সুন্দর শহর। তাই না? তবে সেই শহরের নামে এই সর্দারের নাম হল কী করে?'

ঋজুদা বলল, 'মাসাই ভাষাতে, নাইরোবি কথাটার মানে হচ্ছে খুব ঠান্ডা। নাইরোবি শহরটা আমাদের দার্জিলিংয়ের মতো। খুব ঠান্ডা, পাহাড়ি শহর। একসময় ওখানে মাসাইরাই থাকত। জার্মান আর ইংরেজদের দেশের মতো আবহাওয়া বলে সেই সাদা চামড়ার বিদেশিরা ওদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু নামটা এখনও নাইরোবিই রয়ে গেছে।'

'তা তো হল। কিন্তু সর্দারের নাম নাইরোবি কেন?' আমি বললাম।

'কী জানি? হয়তো মেজাজ খুব ঠান্ডা বলে। নইলে, তুই গুলি চালিয়ে দেওয়ার পরও আমাদের ক্ষমা করার কথা ছিল না।' ঋজুদা বলল।

তারপরই বলল, 'আচ্ছা, অত কাছ থেকে তুই মিস করলি কী করে? তোর হাত তো মোটামুটি ভালোই। অবশ্য ভাগ্যিস মিস করেছিলি, নইলে আর কাউকে বেঁচে ফিরতে হত না।'

আমি বললাম, 'সত্যিই মানুষটা সর্দার। ভয় কাকে বলে জানে না। মাথাও দারুণ ঠান্ডা। রাইফেল ওর বুকের দিকে এইম করে ধরেছিলাম, তবুও ডোন্টকেয়ার করে সোজা হেঁটে এল আমারই দিকে-যেন আমার রাইফেলটা খেলনা রাইফেল, তারপর

রাইফেলের নলটাকে ধরে ঘুরিয়ে দিল। ঘাবড়ে গিয়েই আমি ট্রিগার টিপে ফেলেছিলাম।'

ঋজুদা বলল, 'চমৎকার! দারুণ লোককেই পাহারাদার রেখেছিলাম আমি।'

আমি বললাম, 'তোমার ভু-বাবু যে ক্রমাগত আমাকে বলে যাচ্ছিলেন, মারো, মারো, ওকে মেরে ফেলো। ওকে না মারলে আমরা সকলে মরব।'

ঋজুদা চুপ করে থাকল। কোনো কথা বলল না।

এদিকে সর্দার আরেকবার নস্যি নিল বনেটে বসা অবস্থাতেই। আর উইন্ডস্ক্রিন যে তুলে রাখা হয়েছিল তার ফাঁক দিয়ে নস্যি উড়ে এল হাওয়ার সঙ্গে। কী বিকট গন্ধ আর কী কড়া নস্যি রে বাবা! হাঁচতে হাঁচতে আমার চোখে জল এসে গেল।

ঋজুদা আর টেডি হাসতে লাগল আমার অবস্থা দেখে।

দূর থেকে মাসাই গ্রামটা দেখা যাচ্ছিল মারিয়াবো পাহাড়ের নীচে। গোল গোল বিরাট সব খড়ের ঘর। খড়ে-ছাওয়া বিরাট গোয়াল। এখন ফাঁকা। মেয়েরাও দারুণ লম্বা। সকলেই নানারকম পাথর ও হাড়ের গয়না পরেছে। ওদের গায়ের রং গাঢ় বাদামি, পোশাক সকলেরই হাতে-বোনা লাল গরম কাপড়ের, প্রায় কম্বলের মতো। কাঠের তৈরি বালতি ও নানারকম পাত্র দিয়ে ওরা কাজকর্ম করছে। অল্প ক-জন পুরুষ আমাদের দেখে এগিয়ে এল।

ঋজুদা বলল, 'ওই যে গোল ঘরগুলো দেখছিস, ওগুলোকে বলে বোমা।'

'বোমা!' আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ঋজুদা বলল, 'হ্যাঁ। আর ওই গোয়ালঘরগুলোর নাম, ক্রাল।'

ল্যান্ড-রোভার থামতেই জলের পাত্রগুলো নামিয়ে দেওয়া হল। টেডি গ্রামের মাসাইদের সঙ্গে চলে গেল ঝরনার দিকে।

আমরা নামতেই আমাদের বিরাট বিরাট পেঁপে আর কলা খেতে দিল ওরা। তারপর একটা কালো বাছুরকে ধরে নিয়ে এল। তার গলার শিরাতে দড়ি পরিয়ে দিয়ে একটুকরো কাঠ দিয়ে টার্নিকেট করে একটা শিরাকে একজন ফুলিয়ে দিল। তখন অন্যজন একটা ছোটো তির মারল কাছ থেকে-অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল ফোয়ারার মতো! আরেকজন একটা কাঠের জামবাটিতে সেই রক্ত ধরতে লাগল। বাটিটা ভরে গেল, একজন গিয়ে মাটি থেকে একমুঠো ধুলো তুলে থুতু দিয়ে সেই ধুলো তিরের সূক্ষ্ম ফুটোতে ঘষে দিল। তারপর ঠেলে ঢুকিয়ে দিল শিরাটাকে ভিতরে। চামড়াতে ঢেকে গেল সঙ্গে সঙ্গে শিরাটা, রক্তও বন্ধ হয়ে গেল। বাছুরটা লাফাতে লাফাতে খোঁয়াড়ে চলে গেল। প্রাণে না মেরেও দারুণ কায়দায় ওর রক্ত বের করে নিল এরা।

কিন্তু আমি বোধ হয় আর প্রাণে বাঁচলাম না। সেই কাঠের বাটিতে ফেনা-ওঠা তাজা রক্ত এনে একটা লোক সামনেই দাঁড়াল। আমি বয়সে সবচেয়ে ছোটো বলে আদর করে আমাকেই সবচেয়ে আগে খেতে দিল। অন্য একজন লোক দু-হাতের পাতায় থুতু ফেলে ভালো করে ঘষে সেই পাত্রটিকে সসম্মানে হাতে নিয়ে এসে ইঙ্গিতে চুমুক দিতে বলল।

আমি ইতস্তত করছিলাম। ভুষুন্ডা বলল, 'না খেলে এরা অপমানিত হবে এবং দায়ের এক কোপে তোমার মুণ্ডু শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে।'

ঋজুদাও ভুষুন্ডার কথায় মাথা নাড়ল।

আর কথা না বাড়িয়ে আমি বাটিতে চুমুক দিলাম। ফেনা-ওঠা টাটকা বাছুরের রক্ত। এক চুমুকে খেয়ে দেখলাম যে, তখনও বেঁচে আছি। মনে হল আমিও যেন ওদেরই মতো লম্বা হয়ে গেলাম, গায়ে জোর বেড়ে গেল অনেক। কিন্তু, ভীষণ বমি পাচ্ছিল।

আমার পর ঋজুদা, আর ভুষুন্ডাও খেল। টেডি জল নিয়ে আসেনি এখনও। সময় লাগবে। তাই ওকে খেতে হল না। বেঁচে গেল!

নাইরোবি সর্দার উবু হয়ে মাটিতে বসে মাটির উপরেই একটা তির দিয়ে এঁকে এঁকে ঋজুদাকে রাস্তা বোঝাতে লাগল। ভুষুন্ডা একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার জিনের ট্রাউজারের দু-পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল। ঋজুদা কম্পাস বের করে একটা সাদা কাগজে বলপয়েন্ট পেন দিয়ে কীসব লিখতে লাগল।

যে লোকটি আমাকে রক্ত খাওয়াল তার সঙ্গে একটু ভাব করার ইচ্ছে হল। ভুষুন্ডাকে বললাম, আমাকে সাহায্য করতে। ভুষুন্ডা ভাঙা ভাঙা মাসাইতে ওকে নাম জিজ্ঞেস করল।

লোকটা পিচিক করে থুতু ফেলে কয়েকটা শব্দ করল পরপর।

ভুষুন্ডা হেসে উঠল। সঙ্গেসঙ্গে লোকটাও।

বললাম, 'হাসির কী হল?'

ভুষুন্ডা বলল, 'ও এখন পুরোনো নামটা বদলে ফেলেছে, কিন্তু নতুন নাম এখনও রাখেনি। কাল রাখবে। নতুন নাম কী হবে ঠিক করেনি। আজ ভেবে ঠিক করবে।'

আমি বললাম, 'কী ঠাট্টা করছ ভুষুন্ডা। নাম আবার নতুন-পুরোনো হয় নাকি?'

ভুষুন্ডা বলল, 'ঠাট্টা? না, না, ঠাট্টা নয়। তুমি বানাকে জিজ্ঞেস করো, বানা জানে।' বলে, ঋজুদাকে দেখাল।

তারপর বলল, 'মাসাইরা ইচ্ছেমতো নিজেদের নাম বদলায়, জামাকাপড় পালটাবার মতো। একটা নাম পুরোনো হয়ে গেলেই সেটা বাতিল করে মনোমতো নতুন নামে ডাকে নিজেকে।'

আমি বললাম, 'ওরা তো সাপের মতো। খোলস বদলায়।'

ভুষুন্ডা কোমর দুলিয়ে ওর হাঁটুর নীচে নেমে আসা দুটো লম্বা লম্বা হাত দুলিয়ে কলার মতো চওড়া চোয়ালের ধবধবে সাদা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হিক-হিক করে হেসে উঠল। বলল, 'জব্বর বলেছ, জব্বর বলেছ!'

মাসাইরা সাপের মতোই, খোলস বদলায়, নাম বদলায়।

আমাদের ক্লাসের এক বন্ধুর নাম নিয়ে বড়ো দুঃখ। ওর দাদু নাম দিয়েছিলেন ব্যোমশংকর। তা ওর একেবারেই পছন্দ নয়। ও মাসাই হলে কেমন সহজে নামটা পালটে ফেলতে পারত!

দূর থেকে টেডিকে আসতে দেখা গেল। ওরা চার-পাঁচজন জল বয়ে নিয়ে আসছে ড্রামে এবং চামড়ার ছাগলে। পেছনে পেছনে একপাল ছেলে-মেয়ে এবং কয়েকটা ছাগল।

ছাগল দেখে আমার কারিব্যুর কথা মনে হল। কারিব্যুকে একটু দুধ খাইয়ে নেওয়া যায়। টেডির সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের একজনকে বলে ভুষুন্ডা একটা ছাগলকে ধরে কারিব্যুকে তার দুধ খাওয়াতে গেল। কারিব্যুর আপত্তি তো ছিলই, তার উপরে সেই পাজি ছাগলিটা পাগলির মতো এক লাথি মেরে দিল কারিব্যুর গায়ে।

ঋজুদা বলল, 'তুই বাচ্চাটাকে মেরেই ফেলবি দেখছি। আমরা যেভাবে দিন কাটাচ্ছি তাতে ওকে বাঁচানো এমনিতেই মুশকিল হবে। তার চেয়ে তুই সর্দারকে প্রেজেন্ট করে যা, ওদের ক্রালে থাকবে। অন্যান্য গোরু-বাছুরের সঙ্গে দিব্যি বড়ো হয়ে উঠবে কারিব্যু।'

আমি বললাম, 'ছাগলের দুধ খাচ্ছে না যে ও!'

ঋজুদা বলল, 'সকালে তুই পলতে করে অত কনডেনসড মিল্ক খাওয়ালি, তাই পেট ভরা। খিদে পেলে খুবই খাবে।'

আমি আর টেডি মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম। তারপর নাইরোবি সর্দারের হাতে দিলাম কারিব্যুকে। ওর পিঠের ঘা-টা তখনও লাল হয়ে ছিল। ভালো হয়ে উঠলেও ওর পিঠে গভীর দাগ থেকে যাবে। থমসনস গ্যাজেলদের গায়ের রং ভারি সুন্দর-হালকা বাদামি-তার উপর কালো ডোরা, তলপেটটা সাদা। ওর পিঠের ওই দাগ বিচ্ছিরি দেখাবে ও বড়ো হলে।

নাইরোবি সর্দারের কথায় কোথা থেকে একজন দৌড়ে এসে কীসব পাতা-টাতা বেটে এনে কারিব্যুর ঘায়ে লাগিয়ে দিল। সর্দার বলল, 'কারিব্যু এখন থেকে আমাদের গোরু-বাছুরের সঙ্গেই চরে বেড়াবে।'

ঋজুদা বলল, 'এবার আমরা উঠব।'

সর্দার বলল, 'দাঁড়াও।' বলে, ঋজুদার হাতে একটা গোল হলুদ পাথর দিল। বলল, 'কখনো প্রয়োজন হলে কোনো মাসাইকে এই পাথরটি দেখালে সে তোমাকে সবরকম সাহায্য করবে। এটাকে সাবধানে রেখো।'

সর্দার এবং অন্যান্যরা সার বেঁধে দাঁড়াল। আমরা সকলে হাত তুলে ওদের ধন্যবাদ জানালাম। বাচ্চারা ভিড় করে গাড়িটা দেখছিল। মনে হল, ওরা কখনো গাড়ি দেখেনি আগে। রওয়ানা হবার আগে, দু-হাতে আমার মুখটা আদর করে ধরে পিচিক করে আমায় মাথায় থুতু দিল সর্দার।

আমি গদগদ ভাব দেখিয়ে হাসলাম।

ঋজুদা বিড়বিড় করে বলল, 'তোকে যা পছন্দ করেছে সর্দার, হয়তো জামাই-ই করবে। রাজি না হলেই মুণ্ডু কাটা যাবে কিন্তু।'

ভয়ে আমি কুঁকড়ে গেলাম।

স্টিয়ারিংয়ে আমিই বসলাম এবারে। ঋজুদা পাশে বসল ম্যাপটা হাঁটুতে ছড়িয়ে। ভুষুন্ডা ঋজুদার পিছনে বসে ঋজুদার কাঁধের উপর দিয়ে ম্যাপটা দেখছিল। বুঝতে পেরে ঋজুদা বলল, 'ম্যাপটা ভালো করে বুঝে নাও ভুষুন্ডা। এর পরেও রাস্তা ভুল হলে কিন্তু তোমার নামে সেরোনারাতে আমি রিপোর্ট করতে বাধ্য হব।' বলে, ম্যাপটাকে হাতে নিল।

ট্রেলারে জলের ড্রামের সঙ্গে পেট্রোলের জেরিক্যানের ঠোকাঠুকি লেগে টংটং শব্দ হচ্ছিল। ঋজুদা গাড়ি থামাতে বলে নিজে নামল। নেমে টেডিকে বকল। ওরকম করে রেখেছে বলে। তারপর আমিও নেমে ঋজুদা ও টেডির সঙ্গে হাত লাগিয়ে, সব ঠিকঠাক করে রেখে আবার বেঁধেছেঁদে নিলাম। ভুষুন্ডা ম্যাপ দেখছিল। নামল না।

ঋজুদার কথামতো কম্পাসের কাঁটা দেখে চালিয়ে মাইল দশেক আসার পর যেন একটা পায়ে-চলা পথের মতো দেখা গেল ঘাসের মধ্যে মধ্যে। সবসময় যে ব্যবহার করা হয় এমন নয়। তবে ঘাসের চেহারা, রং আর আশেপাশের চিহ্ন দেখে মনে হয় এইখান দিয়ে মাঝে মাঝে মানুষ পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসা করে।

ঋজুদা বলল, ওই পথের চিহ্নকে দু-চাকার মধ্যে রেখে গাড়ি চালাতে।

সেইমতোই চালাতে লাগলাম।

একটু আগে একদল বুনো কুকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারা প্রথমে গাড়ির দিকে দৌড়ে এসেছিল। পরে, কী ভেবে আবার ফিরে গেল। আফ্রিকার জঙ্গলে এমন হিংস্র জানোয়ার আর নেই। আমাদের দেশেও নেই।

আজ অন্য কোনো জানোয়ারই দেখলাম না মারিয়াবো থেকে রওনা হবার পর। বুনো কুকুর যে অঞ্চলে থাকে সেখান থেকে অন্য সব জানোয়ার পালিয়ে যায় শুনেছিলাম। মনে হল, সেই কারণেই বোধ হয় কোনো জানোয়ারের টিকি দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বুঁউউউ আওয়াজ করে একটা সেৎসি মাছি উড়ে এল জানালার ফাঁক দিয়ে। ভুষুন্ডা সেৎসিকে দারুণ ভয় পায়। ভয় টেডিও পায়, তবে ভুষুন্ডার মতো নয়।

ওরা দু-জনেই দাঁড়িয়ে উঠে মাছিটাকে যায় যার টুপি দিয়ে ধরার এবং মারার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারল না। মাছিটা ঠক করে এসে উইন্ডস্ক্রিনে পড়ে, ডানা দুটো নাড়তে লাগল। সেৎসি মাছি যে কী জোরে ডানা নাড়ে এবং একটা ডানার উপর দিয়ে অন্য ডানাটা কীভাবে ঘুরোয় তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ঋজুদা গোর্খা টুপি দিয়ে এক বাড়ি মারতেই মাছিটা নীচে পড়ল।

আমি বললাম, 'এবারে তোমরা শান্ত হয়ে বোসো। সেৎসি মরেছে।'

'মরেছে? সেৎসি, অত সহজে?' বলেই, টেডি হেসে উঠল। বলল, 'সেৎসি মাছির দশটা জীবন। একটা নয়।' বলেই, আমার আর ঋজুদার মধ্যে দিয়ে ঝুঁকে আমাদের পায়ের কাছে পড়ে থাকা মাছিটাকে তুলে নিয়ে তার ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করল টেনে। তারপর বলল, 'এইবার বলা চলে যে, বাবু মরেছেন। এর এক সেকেন্ড আগেও বলা যেত না যে মরেছেন। এঁরা সহজ জিনিস নন।'

ঋজুদা আর আমি হাসলাম। মুণ্ডু-ছেঁড়া সেৎসি-হাতে টেডির বক্তৃতা শুনে।

ঋজুদা বলল, 'আজ রাত থেকে কিন্তু আমরা খুবই বিপজ্জনক এলাকাতে থাকব। এখানে ওয়ান্ডারাবো শিকারিরা থাকে। সামনে একটা ছোটো লেক আছে। ম্যাপে এই লেকের হদিশ নেই। খুব ছোট্ট সোডা লেক। তার চারপাশে লেরাই জঙ্গল। ওয়ান্ডারাবো শিকারিরা ওই জঙ্গলের গভীরে লুকিয়ে থাকে এবং শিকার করে। প্রতি

শীতে ওরা হাতি, গণ্ডার এবং অন্যান্য জানোয়ার মারতে আসে। নাইরোবি সর্দার ওদের কথা বলেছে আমাকে।'

আমি বললাম, 'ওয়ান্ডারাবোরা কী দিয়ে হাতি মারে? হেভি রাইফেলস ওরা পায় কোথায়?'

ঋজুদা বলল, 'রাইফেল দিয়ে তো মারে না, মারে ছোট্ট ছোট্ট বিষ-মাখানো তির দিয়ে!'

'ওই বিষ কোথায় পায় ওরা?'

ঋজুদা বলল, 'তুই কখনো জলপাই গাছ দেখেছিস?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ আমার মামাবাড়ির বাগানেই তো ছিল।'

'জঙ্গলের মধ্যে জলপাইয়ের মতো এক রকমের গাছ হয়। এই জাতের সব গাছই যে বিষাক্ত হয় এমন নয়। কিছু কিছু গাছের এই বিষ থাকে। গাছগুলোকে দেখতে শুকিয়ে যাওয়া জলপাই গাছের মতো। এদের বটানিকাল নাম অ্যাপোকানথেরা ফ্রিস্টিওরাম। জংলি ওয়ান্ডারাবোরা ওই গাছের নীচে পিঁপড়ে, কি ইঁদুর বা কাঠবেড়ালিকে মরে পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারে যে, বিষ আছে। তারপর সেই গাছের ডাল আর শেকড়গুলো সেদ্ধ করে কাথ বানিয়ে, ঘন করে, তাই বিক্রি করে দেয় ওরা চোরাশিকারিদের কাছে। এই গাছে লাল গোল গোল ফল হয়। তা দিয়ে খুব ভালো জ্যামও তৈরি হয়। জানিস? জ্যাম তো তোর প্রিয়।'

হঠাৎ ঋজুদা চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবধান, সাবধান!'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, একটা বিরাট দু-খড়্গা গণ্ডার জোরে ছুটে আসছে ডান দিক থেকে আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে। গাড়ির পেছনে ট্রেলার থাকায় খুব একটা জোরে গাড়ি চালানো যায় না। গণ্ডারের হাত থেকে বাঁচার মতো জোরে তো নয়ই। গণ্ডারটার কী হল, কে জানে। কোথা থেকে যে হঠাৎ উদয় হল তাও আশ্চর্য! ঘাসের মধ্যে কি শুয়ে ছিল?

ঋজুদাকে রীতিমতো চিন্তিত দেখাল। আবার বলল, 'সাবধান রুদ্র, খুব সাবধান!'

গণ্ডারটা তখনও পাঁচশো গজ দূরে ছিল।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি নেমে রাইফেলটা তুলে, ভয় দেখাবার জন্যেই চার পা তুলে ছুটে-আসা গণ্ডারটার পায়ের সামনে মাটিতে একটা গুলি করল। ধুলোঘাস সব ছিটকে উঠল, কিন্তু গণ্ডার ভয় পেল না।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বলল, 'গাড়ির মুখটা ওর দিকে ঘোরা তো! শিগগিরি।'

আমি স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে, খুব জোরে ইঞ্জিনকে রেস করালাম আর যত জোরে পারি ডাবল-হর্ন একসঙ্গে বাজিয়ে দিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে চললাম। এতদিনের মধ্যে এই

প্রথম হর্ন বাজালাম গাড়ির। গণ্ডারটা তো জোরে দৌড়ে আসছিলই, আমিও ওইদিকে জোরে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা আর গণ্ডারটা একেবারে মুখোমুখি এসে গেল। উইন্ডস্ক্রিন তুলে, তার ফাঁক দিয়ে রাইফেল বের করে ঋজুদা তৈরি হয়েছিল। নিজেদের বাঁচাতে হলেই একান্ত গুলি করবে, নইলে নয়।

আমিও যেমন ধুলো উড়িয়ে হঠাৎ ব্রেক করে গাড়িটাকে দাঁড় করালাম, গণ্ডারটাও তার গাবদাগোবদা খুরের পায়ের ব্রেক কষিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কান দুটো খাড়া, নাকের উপর পর পর দুটো খড়্গ, গায়ের চামড়া দেখে মনে হয় যেন কোনো স্থপতি কালচে-লালচে পাথর খোদাই করে থাকে থাকে তৈরি করেছেন তাকে। তার চোখ দুটো তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে। আগে হর্ন বাজিয়েছিলাম, ইঞ্জিন রেস করেছিলাম, এখন শুধু অ্যাক্সিলারেটরে পা ছুঁইয়ে ইঞ্জিন স্টার্টে রাখলাম।

ঋজুদা রাইফেলের ফ্রন্টসাইট আর ব্যাকসাইটের মধ্যে চোখ লাগিয়ে রাইফেলটা ধরে আছে গণ্ডারটার কপাল তাক করে। সকলে চুপ, স্তব্ধ; কী হয় কী হয় ভাব।

ঠিক সেই সময় টেডি হঠাৎ বলে উঠল, 'একটু নস্যি দিয়ে দেব ওর নাকে? নস্যি নাকে গেলেই সঙ্গেসঙ্গে পালাবে ব্যাটা।' বলেই বাঁ-হাতের তেলোতে তার চ্যাপটা কৌটো থেকে নস্যি ঢেলে, আমার আর ঋজুদার মধ্যের ফাঁক দিয়ে গলে উইন্ডস্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে, শরীরের অর্ধেকটা সড়াত করে বের করে গণ্ডারের নাক লক্ষ্য করে হাতের তেলোতে ফু দিতে গেল।

কিন্তু ওর কোমরের বেল্ট ধরে, এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঋজুদা বলল, 'টেডি!'

টেডি টানের চোটে পিছিয়ে এল।

ঋজুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'ওই দেখো।'

বলতেই, গণ্ডারটা আস্তে আস্তে ঘুরে আমাদের দিকে পিছন ফিরল। পিছন ফিরতেই দেখি ল্যাজটা তুলে আছে গণ্ডারটা, আর তার ঠিক ল্যাজের নীচে একটা এক ফুটের মতো লম্বা তির গাঁথা।

গণ্ডারটা আমাদের সকলের চোখের সামনে কয়েক পা হেঁটে গেল উলটো দিকে। তারপর কয়েক পা হেঁটে গিয়েই ধপ করে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে।

আমরা গাড়ি ছেড়ে সকলেই নামলাম। টেডি নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, 'ওয়ান্ডারাবো। ওয়ান্ডারাবো।'

অতবড়ো একটা জানোয়ার, কত তার গায়ে জোর, তাকে ওয়ান্ডারাবো শিকারি তার শরীরের সবচেয়ে নরম জায়গাতে বিষ-তির মেরে ঘায়েল করেছে।

টেডি গিয়ে গণ্ডারটার সামনে দাঁড়াতেই, সে একবার ওঠবার শেষ চেষ্টা করল। কিন্তু তারপরই শেষবারের মতো শুয়ে পড়ল ধুলো উড়িয়ে।

গণ্ডারটার ওজন আমাদের ল্যান্ড-রোভারটার চেয়েও বেশি হবে। তার খড়্গ কেটে বিক্রি করলে, সেই খড়্গ গুঁড়ো করে কারা কোন ওষুধ বানাবে-তাই তাকে মরতে হল এক-আকাশ রোদ আর হাওয়ার মধ্যে।

তারপর অনেকক্ষণ আমরা সকলে চুপ করে থাকলাম। হয়তো না জেনেই, মরে যাওয়া গণ্ডারটাকে সম্মান জানাবার জন্যে।

টেডি বলল, 'ওয়ান্ডারাবোরা কাছেই আছে। এই তির বেশিক্ষণ আগে ছোড়েনি।' বলেই, উঠে গিয়ে গণ্ডারটার চারপাশে ঘুরে ভালো করে বুঝে নিয়ে বাঁ-হাতে গণ্ডারের ল্যাজটা তুলে, ডান হাত দিয়ে একটানে তিরটা বের করে নিয়ে এল।

ঋজুদা সেটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে একটা টেস্ট-টিউবে তিরের গায়ে লাগা বিষমাখা রক্ত রেখে, টিউবটাকে তুলোয় জড়িয়ে একটা বাক্সে রাখল সেটাকে।

গণ্ডারটা ওখানেই পড়ে রইল। ওয়ান্ডারাবো শিকারিরা ওকে খুঁজে পাবে হয়তো। না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া, খুঁজে পেলেও তারা গাড়ির চাকার দাগ দেখে ভয় পেয়ে এদিকে হয়তো না-ও আসতে পারে। ওরা না এলে, শকুনরা আসবে। প্রথমে চোখ দুটো ঠুকরে খাবে। তারপর রোদে, হাওয়ায় গণ্ডারের ওই শক্ত চামড়াও গলে যাবে একদিন। দিনে-রাতে শকুনের, শেয়ালের আর হায়নার ভোজ হবে এখানে।

আমাদের সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল ভীষণ। ভুষুন্ডা বলল, 'এখানেই কাছাকাছি আমরা আজ ক্যাম্প করে থাকলে ওয়ান্ডারাবোদের সঙ্গে দেখা হতে পারে। গণ্ডার যখন মেরেইছে, তখন তার খড়্গ না কেটে তারা ফিরে যাবে না নিশ্চয়ই। তারা পায়ের দাগ দেখে দেখে এখানে এসে পৌঁছোবেই।'

ঋজুদা কী একটু ভাবল। তারপর বলল, 'নাঃ থাক। আমরা এগিয়ে যাব।'

টেডি এক-নাক নস্যি নিল গণ্ডারটার পিঠের উপর থেবড়ে বসে।

ঋজুদা পাইপ ধরিয়ে বলল, 'রুদ্র ওই রাইফেলটা গণ্ডারের গায়ে শুইয়ে রেখে পোজ দিয়ে দাঁড়া, আমি একটা ছবি তুলি তোর। ছবির নীচে লিখে দেব: মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। কী বলিস?'

আমি বললাম, 'মোটেই না।'

ঋজুদা বলল, 'এখনও ভেবে দেখ, একটা দারুণ চান্স ছিল কিন্তু কলকাতায় ফিরে বন্ধুদের গুল মারবার। ছবি থাকলে তো আর তাদের বিশ্বাস না করে উপায় নেই?'

আমি বললাম, 'ছবি তুলে দাও, তবে খালি হাতে। এই বেচারি গণ্ডারটার একটা ছবি থাকুক আমার কাছে।'

ভুষুন্ডা সিগারেটে টান লাগিয়ে ঋজুদাকে বলল, 'এইখানেই ক্যাম্প করার কথাটা আরেকবার ভেবে দেখলে পারতেন!'

ঋজুদা বলল, 'দেখেছি ভেবে। চলো, এগিয়েই যাই।'

ভুষুন্ডা গররাজি গলায় বলল, 'আপনি যা বলবেন।'

গণ্ডারটাকে ওখানে ফেলে রেখেই আবার রওনা হলাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে আমি ভেবেছিলাম, অজানা কোনো কারণে ঋজুদা আর ভুষুন্ডার মধ্যে কেমন যেন বনিবনার অভাব হচ্ছে। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না আমার।

ঘণ্টা-দেড়েক গাড়ি চালাবার পর দূরে লেরাই জঙ্গলের আভাস ফুটে উঠল। এদিকে সেৎসি মাছি বেশি। কিন্তু লেরাই জঙ্গল দেখতে খুব ভালো। এই অ্যাকাসিয়া গাছগুলোর গা আর ডালাপালা একটা মিষ্টি হলদে-সবুজ রঙের হয়। মনে হয়, শ্যাওলা পড়েছে। কিন্তু তা নয়, গাছের রংই ওরকম। সোয়াহিলিতে বড়ো বড়ো হাত-ছড়ানো অ্যাকাসিয়া গাছগুলোকে বলে মিগুংগা। আর হলুদ মিগুংগা হলে বলে লেরাই। লেরাই-জঙ্গল জলের কাছাকাছি হয়। তাই যেখানেই লেরাই-জঙ্গল থাকে, তার আশেপাশে অন্যান্য নানারকম জঙ্গলও থাকে। জন্তুজানোয়ারের ভিড়ও থাকে। অ্যাকাসিয়া অনেক রকমের হয়। ঋজুদা বলছিল। ছাতার মতো অ্যাকাসিয়াগুলোকে বলে আমব্রেলা অ্যাকাসিয়া। তা ছাড়া আছে অ্যাকাসিয়া টরটিলিস। গাম্মিফ্লোরা। অ্যাকাসিয়া অ্যাবিসিনিকা। অ্যালবিজিয়া বলে এক রকমের গাছ আছে, পাঁচ দিন আগে দেখেছিলাম, সেগুলোর পাতাগুলোই কাঁটার মতো। ওয়েট-আ-বিট র্থন নামেও এক রকমের কাঁটাগাছ হয় এখানে।

দুপুরের খাওয়ার জন্যে কোথাও থামিনি আমরা।

বিকেল চারটে নাগাদ লেরাই-জঙ্গলের কোলে পৌঁছে গেলাম। ঋজুদা গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে দূরের লেকটাকে দেখল। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম সেদিকে। এ রকম কোনো কিছুই দেখিনি এর আগে। লেকটার আশপাশের ডাঙা অদ্ভুত নীলচে ও ছাইরঙা। জল নেই বেশি, কিন্তু জল যেখানে আছে সেই দিকেও তাকানো যায় না, জলের ঠিক কাছাকাছি এমন উজ্জ্বল চকচকে কাচের মতো কোনো জিনিসের আস্তরণ পড়ে রয়েছে যে, চোখ চাওয়া যায় না। চোখে ধাঁধা লাগে। মনে হয়, বরফ পড়েছে বুঝি।

তাঁবু খাটিয়ে টেডি রান্নার বন্দোবস্ত করতে লাগল। আমি আর ঋজুদা জায়গাটা ভালো করে দেখার জন্যে বেরোলাম।

ঋজুদা বলল, 'রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে নে।'

ভুষুন্ডা বলল, 'আমি কি সঙ্গে যাব?'

ঋজুদা বলল, 'না! তুমি তার চেয়ে বরং টেডির কাছেই থাকো। বন্দুক রেখো হাতের কাছে।'

তাঁবু থেকে এখন আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি।

হঠাৎ সামনে পথের বাঁকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে চমৎকার কারুকাজ করা শিংওয়ালা খয়েরিরঙা একদল হরিণ দেখলাম। এই হরিণ কখনো দেখিনি আফ্রিকাতে আসার পর। দিনের শেষ রোদ পশ্চিম থেকে গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে এসে পড়েছে হরিণগুলোর গায়ে। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে!

আমাদের দেখতে পেয়েই হরিণগুলোর চমক ভাঙল। ছত্রভঙ্গ হয়ে ওরা লাফাতে লাফাতে চলে গেল পুবের অন্ধকারে। ওরা যখন তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল, ওরা যেন উড়ে যাচ্ছে।

ঋজুদা বলল, 'এদের নাম ইম্পালা।'

এই ইম্পালা! কত পড়েছি এদের কথা!

গতকাল রাতে যে ছোটো জানোয়ারটা উড়ে-লাফিয়ে চলছিল, যার চোখ জ্বলেনি সামনে থেকে, কিন্তু পাশ থেকে একটা চোখ টর্চের আলোয় জ্বলেছিল, সেই জানোয়ারটা কী জানোয়ার তা ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম।

ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঋজুদা তার বিবরণ জানল আমার কাছ থেকে। তারপর হেসে বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি। ওগুলো হচ্ছে লাফানো-খরগোশ। আসলে কিন্তু ওড়ে না, এমন করে লাফায়, যেমন এই ইম্পালারাও লাফায়, যেন মনে হয় উড়েই যাচ্ছে। আমাদের দেশে ফ্লাইং-স্কুইরেল আছে, কিন্তু সে কাঠবিড়ালি সত্যিই ওড়ে। লাফানি-খরগোশ শুধু লাফায়ই। আর ওই আরেকটা মজা। ওদের চোখে এমন কোনো ব্যাপার আছে যে, সামনে থেকে অন্ধকারে আলো ফেললে একটা চোখও জ্বলে না। অথচ পাশ থেকে ফেললে সেই পাশের চোখটা জ্বলে ওঠে। এইরকম খরগোশ শুধু এখানেই দেখা যায়।'

আমরা যখন হাঁটছিলাম, তখন এদিকে-ওদিকে, মাটিতে, ভালো করে নজর করে যাচ্ছিলাম। শুধু জংলি জানোয়ার নয়, তাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি হিংস্র ওয়ান্ডারাবো শিকারিরা এ জঙ্গলে আছে। আড়াল থেকে একটি বিষ-মাখানো তির ছুড়ে দেবে, ব্যস-স-টলে পড়ে যেতে হবে। গণ্ডারটার প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, তাই বেঁচে ছিল অনেকক্ষণ। মানুষদের মারলে সঙ্গেসঙ্গেই শেষ।

একটা ঝাঁকড়া ওয়েট-আ-বিট থর্ন গাছের নীচে ছোট্টো একটি বাদামি হরিণছানা দাঁড়িয়ে ছিল। ঋজুদা দেখতে পায়নি। আমি ঋজুদার হাতে হাত দিয়ে ওইদিকে দেখালাম। ফিসফিস করে বললাম, 'দেখো দেখো, কী সুন্দর হরিণছানাটা।'

ঋজুদা ভালো করে দেখে বলল, 'এটা হরিণছানা নয় রে, এ এক জাতের হরিণ। ওরা বড়ো হয়েও ওইটুকুই থাকে। ওড়িশার জঙ্গলে কতবার তো মাউস-ডিয়ার দেখেছিস। এগুলো ওইরকমই। এদের নাম ডিক-ডিক। এই জাতের হরিণ কেবল আফ্রিকাতেই পাওয়া যায়।'

মনে মনে উচ্চারণ করলাম দু-বার। ডিক-ডিক। কী সুন্দর নামটা।

আলো পড়ে আসছিল। ঋজুদা বলল, 'এখন আর দেরি না করাই ভালো। তাঁবু থেকে মাইল খানেক চলে এসেছি। চল, এখন ফিরে যাই। কাল আমরা চান করব লেকে এসে, কী বল?'

আমি বললাম, 'দারুণ হবে।' শেষ চান করেছিলাম সেরোনারাতে। কত্ত দিন আগে।

আমরা ফেরবার সময় অন্য রাস্তায় এলাম। এ রাস্তাটাও লেকের পাশ দিয়েই গেছে, তবে আরও গভীরে গভীরে। সামনেই একটা বাঁক। বাঁকের মুখটাতে আসতেই আমার মনে হল একটা লোক যেন পথ থেকে জঙ্গলে সরে গেল। ঋজুদা পশ্চিমে তাকিয়ে দারুণ আফ্রিকান সূর্যাস্ত দেখছিল, অ্যাকাসিয়া গাছের পটভূমিতে লাল-হওয়া আকাশে।

হঠাৎ ঋজুদা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কোনো মানুষ জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। তুই শব্দ পাচ্ছিস?'

আমি কানখাড়া করে শোনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না।

ঋজুদা রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল।

যেখান থেকে লোকটাকে সরে যেতে দেখেছিলাম, সেইখানে এসে পৌঁছোতেই নরম মাটিতে তার পায়ের দাগ দেখা গেল। প্রকাণ্ড দুটো পায়ের ছাপ। ছাপের গভীরতা দেখে মনে হচ্ছে লোকটা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথের বাঁ-দিকে কোনো জিনিসকে লক্ষ করছিল।

বাঁ-দিকে মুখ তুলতে যাচ্ছিলাম। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, 'লোকটা যেদিকে গেছে সেই দিকে তুই রাইফেল তুলে রেডি হয়ে খুব সাবধানে দেখ। কিছু দেখতে পেলেই আমাকে বলিস।'

আমি ওইদিকটা দেখছি।

একটু পর ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, 'দেখ রুদ্র, এদিকে দেখ।'

ঋজুদার কথামতো ওইদিকে তাকিয়ে দেখলাম, পথ থেকে হাত দশেক উপরে একটা মিগুংগা গাছের দুটো ডালের মাঝখানে রক্তাক্ত ইম্পালা হরিণের আধখানা শরীর ঝুলছে। আর সেই গাছের উপরেই, অন্য দুটো ডাল যেখানে মিলেছে সেইখানে

পথের দিকে পিছন ফিরে বসে একটি প্রকাণ্ড চিতাবাঘ, তার মুখে সেই হরিণের মাংস। চিতাটার পিঠে একটা তির গেঁথে আছে।

আমরা আর একটু এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখলাম। চিতাটা ততক্ষণে মরে গেছে। কিন্তু মরে গেলেও গাছ থেকে পড়ে যাচ্ছে না। এমনভাবে দুটো ডালের মাঝখানে তার শরীর আটকে আছে যে, পড়ে যাবেও না।

আমি বললাম, 'লোকটা যদি আমাদের দেখে থাকে?'

ঋজুদা বলল, 'তুই তো দেখেছিস এক ঝলক। কেমন দেখতে বল তো?'

আমি বললাম, 'দারুণ লম্বা, সবুজ আর লাল ছোপ ছোপ কাঙ্গার মতো লুঙ্গি পরা, গায়ে সবুজ চাদর, হাতে তির-ধনুক।'

ঋজুদা উত্তেজিত হয়ে গেছিল, বলল, 'তোকে দেখেছিল?'

বললাম, 'মনে হয় না। ও বোধ হয় এমনিতেই দৌড়ে চলে যাচ্ছিল।'

ঋজুদা বলল, 'ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি আয়। আর কথাবার্তা বলিস না।'

আমরা যখন তাঁবুর কাছে এলাম তখন অন্ধকার প্রায় নেমে এসেছে। তার সঙ্গে শীতটাও। টেডি খুব বড়ো করে আগুন জ্বেলেছে। এখানে শুকনো কাঠকুটোর অভাব নেই কোনো। আগুনের আভায় চারদিক লাল হয়ে উঠেছে।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছোলাম তখন টেডির কফি তৈরি। বিস্কুট আর কফি দিল ও আমাদের। রান্নাও চড়িয়ে দিয়েছে। আজও উগালি।

ভুষুন্ডাকে কিন্তু দেখা গেল না কোথাও। ঋজুদা জিজ্ঞেস করাতে টেডি বলল, 'সে তো আপনাদের পিছনে পিছনেই গেল। কেন, দেখা হয়নি?'

কিছুক্ষণ পর একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। এবং তারও কিছুক্ষণ পর দুটো বড়ো বড়ো ফেজেন্ট হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এল ভুষুন্ডা। এসে বলল, 'ওয়াইল্ড-বিস্ট আর গ্রান্টস গ্যাজেল খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছিল। তাই আনলাম। এক্ষুনি ছাড়িয়ে দিচ্ছি, রোস্ট করবে টেডি।'

ঋজুদা বলল, 'ভুষুন্ডা, তুমি ভালোভাবেই জান যে, এখানে চোরাশিকারিরা আছে, তবুও তুমি গুলি করলে কেন আমাকে জিজ্ঞেস না করে? এটা কি শিকার করার সময়, না জায়গা? গুলির শব্দ শুনলেই তো ওরা সব সরে যাবে, সাবধান হয়ে যাবে। তাতে তো আমাদেরই বিপদ। একথা কি তোমাকে শেখাতে হবে? তুমি এসব জান না, তা তো নয়!'

ভুষুন্ডা লজ্জিত হয়ে বলল, 'সরি। আমি অতটা ভাবিনি। আপনাদের খাওয়ার যাতে কষ্ট না হয় সেই ভেবেই মেরেছিলাম।'

ঋজুদা বলল, 'আফ্রিকার বনবাদাড়ে এত কষ্ট করে আমরা খাওয়ার সুখ করতে আসিনি। আমাদের দেশে আমরা ভালো-মন্দ খেতে পাই। সেরোনারাতে,

গোরোংগোরোতে অথবা ডার-এস-সালাম বা আরুশাতে গেলেও খেতে পাব। ভবিষ্যতে তুমি এসব কোরো না। তা ছাড়া তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছ বিশেষ কারণে। আমাদের খাওয়ার কষ্ট নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে।'

তারপরই কথা ঘুরিয়ে ঋজুদা বলল, 'এসো তো দেখি, এই জঙ্গলের আর লেকের একটা ম্যাপ বানিয়ে ফেলি দু-জনে আগুনের পাশে বসে।'

ভুষুন্ডা ছুরি হাতে করে উবু হয়ে বসে ফেজেন্ট দুটোর পালক ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'কী হবে ম্যাপ দিয়ে? এই জঙ্গল আমার মুখস্থ। কাল আমি চোরাশিকারিদের ডেরায় নিয়ে যাব আপনাদের। একেবারে হাতেনাতে ধরিয়ে দেব। তাহলেই তো হল। তবে খুব সাবধানে যাবেন। তির মারতে ওদের সময় লাগে না।'

ঋজুদা একাই ম্যাপ বানাতে বসে গেল, কফি খেতে খেতে।

তারপর ভুষুন্ডার দিকে চেয়ে বলল, 'ওয়ান্ডারাবোদের ভয় আমাকে দেখিয়ো না। কোনো কিছুর ভয়ই দেখিয়ো না।'

ভুষুন্ডা যেন একটু অবাক হল। তারপর ঋজুদাকে বলল, 'আপনার সাহস সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই কোনো। আপনার মতো সাহসী লোক কমই আছে।'

ঋজুদা চুপ করে গেল।

ভুষুন্ডার কথাটাতে, মনে হল, একটু ঠাট্টা মেশানো ছিল।

কফিটা শেষ করেই ঋজুদা বলল, 'কাল পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢুকব।'

ভুষুন্ডা মুখ না ঘুরিয়েই বলল, 'তাই-ই হবে। কাল ওয়ান্ডারাবোদের সঙ্গে মোলাকাত হবে আপনার।'

ঋজুদা বলল, 'ক্যাম্পে থাকবে টেডি। লাঞ্চ বানিয়ে রাখবে সকলের জন্যে।'

টেডি বলল, 'সে কী? আমিও সঙ্গে যাব। আমিও যাব।'

ঋজুদা মুখ নীচু করে কম্পাস আর কাগজ-পেনসিল নিয়ে কাজ করতে করতে বলল, 'আমি যেমন বলেছি, তেমনই করবে। আমার কথা অমান্য করবে না কেউ। বুঝেছ?'

টেডি মুখ নীচু করে বলল, 'বুঝেছি।'

ভুষুন্ডা টেডির দিকে মুখটা একটু ফেরাল। আগুনের আভায় মনে হল, ভুষুন্ডার মুখে এক অদ্ভুত হাসি লেগে আছে।

আমার, কেন জানি না, বড়োই অস্বস্তি লাগছে। কিছু একটা ঘটবে।

কিছুতেই ঘুম আসছিল না।

তির-খাওয়া গণ্ডারটা আর বড়ো চিতাবাঘটার কথা বার বার মনে পড়ছিল আমার। আমার গায়ে তির লাগলে কী হবে তাই-ই ভাবছিলাম। মানুষদের তির

মারলে কোথায় মারে ওয়ান্ডারাবোরা? যেকোনো জায়গাতে মারলেই হল। রক্তের সঙ্গে তিরের ফলার যোগাযোগ ঘটলেই কাজ শেষ। সঙ্গেসঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে হবে। ওদের তিরগুলো কিন্তু ছোটো ছোটো। ছ-ইঞ্চি থেকে এক ফুট।

একবার মনে হল, কেন যে বাহাদুরি করতে এলাম এই আফ্রিকাতে! না এলেই ভালো হত!

টেডি আজ আগুনের পাশে বসে ফেজেন্টের রোস্ট বানাতে বানাতে পিগমিদের গল্প বলছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট্ট মানুষ ওরা। গভীর জঙ্গলে পাতার কুঁড়েতে থাকে। আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকার জঙ্গলে পিগমিদের সঙ্গে টেডি ছিল অনেকদিন এক জার্মান সাহেবের সঙ্গে শিকারে গিয়ে। পিগমিদের সবচেয়ে বড়ো দেবতা খনভাম-এর কথা বলছিল ও।

তাঁবুর বাইরে লেকের দিক থেকে ও জঙ্গলের গভীর থেকে নানা অচেনা জন্তুজানোয়ার এবং রাতচরা পাখিদের ডাক ভেসে আসছিল। তারা আমার অচেনা বলেই ভয় করছিল। আমাদের দেশ হলে এইরকম ভয় করত না। কাছেই লেক আছে বলে এখানে ঠান্ডাও অনেক বেশি। কম্বলটা ভালো করে গুঁজে নিলাম পিঠের নীচে।

টেডি বলছিল প্রতিদিন যখন সূর্য মরে যায়, তখন খনভাম একটা বিরাট থলের মধ্যে তারাদের টুকরো-টাকরাগুলো সব ভরে নেন, তারপর সেই তারাদের টুকরোগুলো নিভে যাওয়া সূর্যের মধ্যে ছুড়ে দেন, যাতে সূর্য পরদিন ভোরে আবার জ্বলে ওঠে তার নিজের সমস্ত স্বাভাবিক উত্তাপের সঙ্গে।

খনভাম আসলে একজন শিকারি। শিকারি পরিচয়টাই তাঁর আসল পরিচয়। বিরাট দুটো সাপকে বেঁধে তাঁর ধনুক তৈরি করেছিলেন তিনি। বৃষ্টি-শেষে যখন আকাশে রামধনু দেখি আমরা-আসলে সেটা রামধনু নয়, খনভামের ধনুক। পৃথিবীর মানুষদের কাছে খনভাম কোনো ছোটো জানোয়ারের রূপ ধরে দেখা দেন, নয়তো হাতি হয়ে। আকাশে যে বাজের শব্দ শুনি আমরা, সেটাও আসলে বাজ নয়। খনভাম কথা বললে ওইরকম আওয়াজ হয়। খনভামের গলার স্বরই বাজপড়ার শব্দ।

দারুণ লাগছিল আমার। কিন্তু আগুনের পাশে বসে টেডির গল্প শুনতে শুনতে আমার গা-ছমছমও করছিল। কঙ্গো উপত্যকার অন্ধকার গভীর জঙ্গল, যেখানে গোরিলারা থাকে, খনভামও থাকেন, সেখানেই যেন চলে গেছিলাম।

খনভামের চেলা আছেন অনেক। তাঁরা সব নানা দৈত্যদানো। সন্ধ্যের পর পিগমিদের পাতার কুঁড়ের সামনে আগুন জ্বালিয়ে বসে আজকের রাতের মতোই এইসব দৈত্যদানোর গল্প করত পিগমিদের সঙ্গে টেডি, তার সাহেবের জন্যে রান্না করতে করতে। এখন যেমন আমাদের জন্যে করছে।

এক রকমের দানো আছেন, তাঁর নাম গুগুনোগুম্বার। তিনি কেবল আস্ত আস্ত গিলে খান ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের। আরেকজন বামন-দানো আছেন, তাঁর নাম ওগরিগাওয়া বিবিকাওয়া। তিনি সাপের বা অন্য কোনো সরীসৃপের মূর্তি ধরে দেখা দেন।

তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্পখাটে শুয়ে শুয়ে এসব ভাবছি। বাইরে আগুনটা পুটপাট করে জ্বলছে। এক রকমের পোকা উড়ছে অন্ধকারে আশ্চর্য একটানা মৃদু ঝরঝর শব্দ করে। মনে হচ্ছে, যেন দূরে ঝরনা বইছে কোনো। আকাশে একটু চাঁদ উঠেছে। ফিকে চাঁদের আলো তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে এসে পড়েছে। দরজাটা দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। ঋজুদা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমার চোখে ঘুম নেই। টেডি একা শুয়েছে অন্য তাঁবুতে। ভুষুন্ডা গাড়ির মধ্যে কাচ-টাচ বন্ধ করে। যেমন রোজ শোয়।

হঠাৎ খুবই কাছ থেকে একটা সিংহ ডেকে উঠল দড়াম করে। তারপরই শুরু হল সাংঘাতিক কাণ্ড। চারদিক থেকে প্রায় গোটা আটেক সিংহ তাঁবু দুটোকে ঘিরে প্রচণ্ড হুমহাম শুরু করে দিল। ট্রেলারের উপরে ত্রিপল-ঢাকা গ্রান্টস গ্যাজেল আর ওয়াইল্ড-বিস্ট-এর স্মোক করা মাংস ছিল। সেগুলোর গন্ধ পেয়ে ওরা ট্রেলারের উপর চড়ে বসল। ওদের থাবাতে চচ্চড় শব্দ করে ট্রেলারের উপরের ত্রিপল ছিঁড়ে গেল শুনতে পেলাম। চতুর্দিকে সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে, আমাদের আর তাদের মধ্যে তাঁবুর পাতলা পর্দা শুধু। বেচারি টেডি কি বেঁচে আছে? না সিংহরা তাকে খেয়েই ফেলল? কিন্তু টেডির কাছে তো বন্দুক আছে, সে গুলি করছে না কেন?

চ্যাঁচামেচিতে ঋজুদার ঘুম চটে গেল। সত্যি। কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোয় ঋজুদা।

আমি ভাবলাম, ঋজুদা উঠে আমাকেও উঠিয়ে নিয়ে সিংহ মারবে এবং তাড়াবে। এবং এই ফাঁকে কম্বলের তলায় শুয়ে শুয়ে আমার জীবনের প্রথম সিংহ-শিকার হয়ে যাবে! কিন্তু ঋজুদা উঠে বোতল থেকে একটু জল খেল, তারপর আবার কম্বলের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'ব্যাটারা বড়ো জ্বালাচ্ছে তো।' বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি হাঁ করে একবার ঋজুদার দিকে তাকিয়ে তারপর ক্যাম্পকটে সোজা হয়ে উঠে বসে, আবার হাঁ করে তাঁবুর ফাঁক-করা দরজা দিয়ে সজাগ চোখে চেয়ে রইলাম।

একটা প্রকাণ্ড সিংহের মাথা তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম। এ কী? সে যে তাঁবুর ভিতরে কী আছে তা ঠাহর করে দেখছে ভিতরে উঁকি মেরে। মানুষের গন্ধ পেয়েছে নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি রাইফেল বাগিয়ে ধরে আমি সেইদিকেই চেয়ে রইলাম।

কিন্তু সিংহটা সরছেই না। থাবা গেড়ে গ্যাঁট হয়ে বসে হেঁড়ে মাথাটা তাঁবুর দরজায় লাগিয়ে রেখে দেখছে আমাকে।

সেই চাউনি আর সহ্য করতে না পেরে আমি পাঁচ ব্যাটারির বড়ো টর্চটা জ্বেলে তার মুখে ফেললাম। আগুনের ভাঁটার মতো চোখ দুটো জ্বলতে লাগল আলো পড়ে। আর ঠিক সেই সময় 'মর, হতভাগা' বলে, ঋজুদা তার এক পাটি চটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে সোজা সিংহটার নাক লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল।

নাকের উপর সোজা গিয়ে লাগল চটিটা। আমার হৃৎপিণ্ড থেমে গেল। রাইফেল-ধরা হাত ঘেমে উঠল। কিন্তু সিংহরাজ ফোঁয়াও করে হঠাৎ একটা ছোট্ট আওয়াজ করেই পরক্ষণেই ক্রমাগত হুঁয়াও হুঁয়াও করে ডাকতে ডাকতে সরে গেল।

কতক্ষণ যে ওরা ছিল জানি না। শেষকালে সিংহের ডাকের মধ্যেই, মানে ডাক শুনতে শুনতেই, ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। আমার চারপাশে পাঁচ-দশ হাতের মধ্যে এক ডজন সিংহকে ঘুরে বেড়াতে দিয়ে আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে যে কেউ তাঁবুর মধ্যে নির্বিকারে ঘুমোতে পারবে একথা আগে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। ধন্য ঋজুদা।

ঘুম ভাঙল শয়ে শয়ে স্টার্লিং পাখিদের কিচিরমিচিরে। লেকের পশ্চিমদিক থেকে ফ্লেমিংগোদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ফ্লেমিংগো ছাড়া লেকে আর কোনো পাখি ছিল না। কাল বিকেলেই লক্ষ করেছিলাম।

এই স্টার্লিং পাখিগুলো ভারি সুন্দর দেখতে। উজ্জ্বল নীল, গাঢ় কমলা আর সাদায় মেশা ছোটো ছোটো মুঠিভরা পাখি। ওরা যেখানেই থাকে, সেখানটাই সরগরম করে রাখে। আমাদের দেশের ময়নার মতো ওরাও খুব নকলবাজ। অন্য যেকোনো পাখির এবং মানুষের গলার স্বর হুবহু নকল করে ওরা। তাই আফ্রিকাতে অনেকেই বাড়িতে পোষেন এই সুন্দর পাখি।

টেডি বলল, 'গুটেন মর্গেন।'

এদিকে জার্মানদের দাপট বেশি ছিল বলে এরা সকলেই ভাঙা ভাঙা ইংরেজির মতো জার্মানও জানে। গুটেন মর্গেন হচ্ছে জার্মান গুড মর্নিং।

আমি বললাম, 'গুটেন মর্গেন, তুমি বেঁচে আছ?'

টেডি হেসে বলল, 'প্রায় মরে যাবারই অবস্থা হয়েছিল কাল সিম্বাদের জন্যে। রাইফেলধারীরা তো দিব্যি ঘুমোলে। আমার কাছে একটা শটগান। তা দিয়ে ক-টা সিম্বা মারব? আমার পুরো নস্যির কৌটোটা কাল শেষই হয়ে গেছে। হাতের তেলোতে নস্যি রেখে তাঁবুর দরজা-জানলা দিয়ে ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে সব নস্যিই শেষ। এখন কী যে করব জানি না।'

ঋজুদা বলল, 'কোনো চিন্তা নেই। আমার পাইপের টোব্যাকো গুঁড়ো করে এই লেকের সোডা ক্রিস্টাল নিয়ে গুঁড়ো করে মিশিয়ে নাও, দারুণ নস্যি হয়ে যাবে। তুমি

জান তো, সবচেয়ে ভালো নস্যি বানাতে এইসব সোডা লেকের কদর কতখানি?'

তারপরই আমাকে তাড়া দিয়ে বলল, 'পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা বেরোচ্ছি রুদ্র। এখন গল্প করার সময় নেই। ভুষুন্ডা তৈরি হয়ে নাও।'

ভুষুন্ডা তার টুপির ব্যান্ডে কতগুলো নীলচে জংলি ফুল লাগাচ্ছিল। বলল, 'আমি তৈরিই আছি।'

দেখতে দেখতে টেডি আমাদের ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দিল। ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুটের উপর কালকের ভুষুন্ডার মারা ফেজেন্টের লিভার সাজিয়ে সঙ্গে নাইরোবি সর্দারের দেওয়া মারিয়াবো পাহাড়ের ইয়া ইয়া মোটা কলা। তারপর কফি।

ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বাজে। আমরা সারাদিনের মতো তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ডাইরি, নোটবই, ক্যামেরা, টেলিফোটো লেন্স, রাইফেল, জলের বোতল, দূরবিন-এইসব চাপাল ঋজুদা আমার ঘাড়ে। নিজের ঘাড়েও অবশ্য কম জিনিস উঠল না। হেভি ফোর-ফিফটি ফোর হান্ড্রেড রাইফেলটা টেডির হেপাজতে রেখে দিল ঋজুদা। লাইট থার্টি ও সিক্স ম্যানলিকার শুনার রাইফেলটা পিঠের স্লিং-এ ঝুলিয়ে নিয়েছে। আমার হাতে দিয়েছে শটগান। ভুষুন্ডাকে দিয়েছে খাওয়ার হ্যাভারস্যাক আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস।

আমরা রওনা হলাম। সিংগল ফর্মেশানে। টেডি হাত নেড়ে টা টা করল।

যেতে যেতে ঋজুদাকে ঠাট্টা করে বললাম, 'প্রেজেন্ট-ট্রেজেন্টস নিয়েছ তো? দেবে না ওদের?'

ঋজুদা ঠাট্টা না করে বলল, 'ওদের সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই দেব। প্রথম দেখা হবে, আর উপহার দেব না? এ কি একটা কথা হল?'

আমি বললাম, 'তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যাদের সঙ্গে প্রথম দেখা নয়, অনেক পুরোনো দেখা, তাদের জন্যেও তো কিছু প্রেজেন্ট আনতে পারতে।'

ঋজুদা বলল, 'তারা কারা?'

বললাম, 'এই যেমন আমি!'

ঋজুদা গম্ভীর মুখে পকেটে হতে ঢুকিয়ে দারুণ একটা চকোলেট দিল আমাকে।

আমি বললাম, 'এটা কী? পেলে কোথায়? এরকম তো কলকাতায় কখনো দেখিনি।'

ঋজুদা বলল, 'দেখবার তো কথা নয়। এটা সুইটজারল্যান্ডে তৈরি। তোরই জন্যে ডার-এস-সালামে কিনেছিলাম। ছেলেমানুষ!'

'ঋজুদা!'

ঋজুদা বলল, 'আহা! রাগ করিস কেন? পুরোটা নাহয় না-ই খেলি। অর্ধেকটা আমায় দে।'

আমি চকোলেটটাকে তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে রেখে, আর দু-ভাগ ঋজুদা আর ভুষুন্ডাকে দিলাম। ঋজুদা নিজের ভাগটা একেবারেই মুখে পুরে দিল। কিন্তু ভুষুন্ডা বলল, ও খাবে না। ফেরত দিল আমাকে।

অসভ্য! আমার খুব রাগ হল। আমিও মাসাই হলে ওর ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিতাম এতক্ষণে! বেঁচে গেল জোর।

আমরা তখনও একটু ফাঁকায় ফাঁকায় চলেছি। ঋজুদাকে বললাম, 'তুমি তো উপহার নিয়ে যাচ্ছ ওদের জন্যে। নাইরোবি সর্দারকেও তো উপহার দিলে। ওয়ান্ডারাবোরা যদি তোমাকে বিষের তির উপহার দেয়?'

ঋজুদা হাসল। বলল, 'আমরা গান্ধী-চৈতন্যের দেশের লোক। ওরা তির মারলেও, আমরা ভালোবাসবই।'

আমি হেসে বললাম, 'তোমাকে কিছুই বিশ্বাস নেই। সারারাত ভয়ে আমার ঘুম হল না, চারদিকে সিংহরা হুড়ুম-দাড়ুম করে বেড়াল, আর তারই মধ্যে তুমি কী করে যে বেমালুম ঘুমোলে তা তুমিই জান। তার উপর অতবড়ো একটা সিংহকে কেউ যে রাবারের চটি ছুড়ে মারতে পারে তা কোনো লোকে বিশ্বাস করবে?'

ঋজুদা বলল, 'রুদ্র, তুই বড্ড কথা বলছিস। একদম চুপচাপ। সারা রাস্তাতে আর একটাও কথা বললে বিপদ হবে। এত বকবক করিস কেন?'

ভুষুন্ডা, মনে হল, মুখ টিপে হাসল।

আমার রাগ হল। কিন্তু চুপ করে গেলাম। বাইরের লোকের সামনে ঋজুদা এমন করে প্রেস্টিজ পাংচার করে দেয় যখন তখন যে, বলার নয়। ভীষণ খারাপ।

আমাকে কথা বলার জন্যে বকেই, নিজেই সঙ্গেসঙ্গে বলল, 'ঃআ, সামনে চেয়ে দেখ, কী সুন্দর দৃশ্য।'

আমি দেখলাম। কিন্তু কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না। কথা বলব না আর।

ভুষুন্ডা আগে আগে চলেছে। লেকটাকে পাশে রেখে, কোনাকুনি তার পাড় বেয়ে পেরিয়ে এলাম আমরা। এইসব লেক পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম আর সোডিয়ামের জন্যে বিখ্যাত। ঋজুদা বলছিল, সোডার সোয়াহিল। নাম হচ্ছে মাগাডি। মাগাডি নামেই কেনিয়াতে খুব বড়ো একটা সোডা লেক আছে। সেরোনারার কাছে একটা ছোটো লেক আছে এরকম। তার নাম লেক লাগাজা।

আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। একদল বেবুন আমাদের দেখে দাঁত-মুখ বের করে, বিশ্রী মুখভঙ্গি করে, চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল। চার-তলা বাড়ির সমান উঁচু একটা জিরাফ লেরাই গাছের পাশে দাঁড়িয়ে মগডালের পাতা খাচ্ছিল, আমাদের দেখতে পেয়েই ছুট লাগাল ল্যাগব্যাগ করতে করতে। একটু পরই একটা ডিক-ডিক

দৌড়ে গেল জঙ্গলের গভীরে। কালকের ডিক-ডিকটাও হতে পারে। ডিক-ডিক নাকি খুব বেশি দেখা যায় না। ঋজুদা কালকে বলছিল।

ভুষুন্ডা বড়ো বড়ো পা ফেলে মুখ নীচু করে আগে আগে চলেছে। ভুষুন্ডার পিছনে ঋজুদা। তার পিছনে আমি।

ঋজুদা অর্ডার দিয়েছে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনটা ভালো করে দেখতে। কিন্তু ঘাড়ের উপর এত মালপত্র যে, ঘাড় ঘোরাতেই পারছি না। মনে হচ্ছে, স্পন্ডিলাইটিস হয়েছে। একদিক দিয়ে অবশ্য ভালোই হয়েছে। আমার পুরো পিছন দিকটাই মালপত্র ঢাকা। পায়ে অ্যাঙ্কল বুট। হাঁটুর ঠিক পিছনে না মারলে তির কোথাও আমার লাগবে না। ঋজুদা জেনেশুনেই আমাকে এই বর্ম পরিয়ে পিছনে দিয়েছে কি না, কে জানে?

একটা ঢালু জায়গা পেরোতেই আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম। এবারে সত্যিই ভয় করছে। আধঘণ্টা খানেক চলেছি আমরা, এমন সময় সামনের জঙ্গলের মধ্যে থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলাম।

ঋজুদা আমার দিকে তাকাল। আমি ঋজুদার দিকে।

তারপর বন্দুকে গুলি ভরে নিলাম। ঋজুদা রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল।

ভুষুন্ডা ধোঁয়া দেখে কিছু বলবে, ভেবেছিল ঋজুদা। কিন্তু ভুষুন্ডা কিছুই না বলে সেই ধোঁয়ার দিকেই এগিয়ে চলল এঁকেবেঁকে। ভুষুন্ডার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। ওর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। একেই বলে সাহস! হাতে বন্দুক রাইফেল থাকলে তো অনেক বীরত্বই দেখানো যায়।

ভুষুন্ডা সত্যিই যে কত ভালো গাইড তা এবারে বোঝা যাচ্ছে! কী সহজে ও চলেছে। দোমড়ানো ঘাস, ভাঙা গাছের ডাল, ছেঁড়া পাতা-এই সবের চিহ্ন দেখে ও লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে। মাঝে মাঝে পিছিয়ে এসে ডাইনে-বাঁয়ে গিয়ে নতুন পথ ধরছে। আমরা ওকে অন্ধের মতো অনুসরণ করছি। এবারে জঙ্গল আরও গভীর। বড়ো বড়ো লতা। ফুল ধরেছে তাতে।

হঠাৎ ভুষুন্ডা দু-হাত দু-দিকে কাঁধের সমান্তরালে ছড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'পোলে, পোলে।'

ঋজুদা বাঁ-হাতটা উপরে তুলে পিছনে আসা আমার উদ্দেশে বলল, 'পোলে, পোলে।'

আমি চলার গতি আস্তে করলাম।

এই পরিবেশে ঋজুদাও যেন ইংরেজি-বাংলা সব ভুলে গেছে। নইলে ভুষুন্ডার মতো নিজেও 'পোলে পোলে' বলত না।

ভুষুন্ডা আর ঋজুদা আমার থেকে হাত দশেক সামনে ছিল। ওরা দু-জন ফিসফিস করে কী বলাবলি করল। তারপর ইশারাতে আমাকে ডাকল।

এগিয়ে যেতেই ভুষুন্ডা আবার এগিয়ে গিয়েই একটা উতরাইতে নামতে লাগল। একটু নামতেই নাকে পচা গন্ধ এল আর সেই গন্ধ আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সামনেই ধোঁয়া উড়ছে গাছপালার আড়ালে।

তারপরই যা দেখলাম, তার জন্যে একেবারেই তৈরি ছিলাম না। সেরকম কিছু যেন কখনো কাউকে দেখতে না হয়।

কতকগুলো পাশাপাশি কুঁড়েঘর, খড়ের। তার সামনে একটা বড়ো আগুন তখনও জ্বলছে। তিরতির করে একটা নদী বয়ে চলেছে সেই ঘরগুলোর পাশ দিয়ে। ঘরগুলোর সামনে বড়ো বড়ো কাঠের খোঁটার সঙ্গে বাঁধা দড়িতে প্রায় কয়েক-শো জানোয়ারের রক্তমাংস লেগে থাকা চামড়া ঝুলছে। তার মধ্যে জেব্রা, ওয়াইল্ড বিস্ট, ইম্পালা, গ্রান্টস ও থমসনস গ্যাজেল, এলান্ড, টোপি, বুশবাক, ওয়াটার বাক, বুনো মোষ-সব কিছুর চামড়াই আছে। সমস্ত জায়গাটা রক্তে-মাংসে বমি-ওঠা দুর্গন্ধে যেন নরক হয়ে আছে একেবারে।

আমরা অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম গাছগাছালির আড়াল থেকে। আগুনটা নিশ্চয়ই কাল রাতের। এখন নিভে এসেছে। একজনকেও দেখা গেল না ওখানে। ওরা সারারাত কাজ করে এখন বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

রাইফেলটা তাক করে ঋজুদা এবারে আগে গেল। তারপর ভুষুন্ডা। ভুষুন্ডার পেছনে আমি।

ঋজুদা আমাকে ডেকে বলল, 'তুই বন্দুক তৈরি রেখে বাঁ-দিকে যা, আমি ডান দিকে যাচ্ছি। আমরা জায়গামতো গিয়ে দাঁড়ালে, ভুষুন্ডা তুমি এইখান থেকে জোরে জোরে কথা বলবে।'

ওয়ান্ডারাবোদের ডেরায় এসে খালি হাতে দাঁড়িয়ে কথা বলা আর আত্মহত্যা করা একই ব্যাপার। কিন্তু ভুষুন্ডা একটুও ভয় পেল না। আমার মনে হল ঋজুদা যেন চাইছে ভুষুন্ডার বিপদ ঘটুক!

আমরা সরে দাঁড়াতেই ভুষুন্ডা অজানা ভাষায় জোরে জোরে কথা বলতে লাগল। আমার মনে হল মেশিনগান থেকে গুলি ছুটছে ট্যা-র্যা-র্যা-র্যা-র্যা-ট্যা-র্যা করে। কী অদ্ভুত ভাষা রে বাবা!

কিন্তু তবুও ওই কুঁড়েঘর থেকে কেউই বেরোল না। যখন একজনও বেরোল না, তখন ঋজুদা হাত দিয়ে ইশারা করল আমাকে। আমরা দু-জনে রাইফেল ও বন্দুক তৈরি রেখে আস্তে আস্তে কুঁড়েঘরগুলোর দিকে দু-দিক থেকে এগিয়ে গেলাম। ভুষুন্ডা আমাদের আগে আগে ডোন্ট-কেয়ারভাবে খালি হাতে এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধের

মালপাত্র সব আগুনের পাশে নামিয়ে রেখে নিভুনিভু আগুনের মধ্যে একটা কাঠি ঢুকিয়ে আগুন জ্বেলে সিগারেট ধরাল। তারপর আগুনের পাশেই ফেলে-রাখা একটা বিরাট তাল গাছের গুঁড়িতে বসে আরামে সিগারেট টানতে টানতে কুঁড়েঘরগুলোর দিকে পিছন ফিরে আমাদের দেখতে লাগল।

তখনও যখন কাউকে দেখা গেল না, তখন আমরা সাবধানে সামনের কুঁড়ের মধ্যে ঢুকলাম। কুঁড়ের মধ্যে বস্তা বস্তা নুন, ফিটকিরি, নানারকম ছুরি ও বড়ো বড়ো অনেক লোহার তারের গোলা দেখতে পেলাম।

ঋজুদা বলল, 'লাইন। এগুলোকে স্নেয়ার বলে। তারের ফাঁদ। এই তার বেঁধে রাখে জানোয়ারদের যাতায়াতের পথে জালের মতো। একসঙ্গে অনেক জানোয়ারকে ধরতে পারে এবং মারতে পারে এরা এমন করে।'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু ওরা সব গেল কোথায়?'

'সব পালিয়েছে। কাল রাতে ভু-বাবুর বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনেই বোধ হয় ওরা বুঝেছিল।'

আমি বললাম, 'পালিয়ে যাবে কোথায়? চলো, আমরা ফিরে গিয়ে গাড়ি নিয়ে ওদের ধাওয়া করি। এই জঙ্গল পেরিয়ে তো ওদের ফাঁকা জায়গা দিয়ে অনেকটাই যেতে হবে। তারপরে না হয় আবার জঙ্গল পাবে।'

ঋজুদা বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু আমরা তো ওদের সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি। ওদের ধরতেও আসিনি। এসেছি ওদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে। এই কুঁড়েঘরগুলো ভালো করে খুঁজলে ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাবে। কয়েকদিন ভুষুন্ডা নাহয় গাড়ির কাছেই তাঁবুতে থাকবে। টেডিকে এখানে ডেকে আনব। তারপর দিন-কয়েক এখানে ওদের থাকার রকম-সকম দেখব। তাতে ওরা কোন পথ দিয়ে আসে যায়, কী কী জানোয়ার বেশি মারে, কেমন করে মারে, কেমন করে চামড়া শুকোয়, কী খায় ওরা, কেমন ভাবে থাকে, কীভাবে টন টন স্মোকড করা মাংস পাচারই-বা করে বিক্রির জন্যে-এসব জানতে পারব।'

ভুষুন্ডা সিগারেট খেতে খেতে বলল, 'পাখিরা উড়ে গেছে।'

ঋজুদা বলল, 'তাই তো দেখছি।'

বাঁ-দিকের কোনায় একটা বড়ো ঘর ছিল। তার মধ্যে ঢুকে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। দেখি, বিরাট বিরাট হাতির দাঁত শোয়ানো আছে মাটিতে। হাতির ল্যাজের চুল কেটে গোছ করে রাখা হয়েছে। অনেকগুলো হাতির পা হাঁটুর নীচ থেকে কেটে মাংস কুরে বের করে তার মধ্যে ঘাস পুরে রেখেছে।

আমি বললাম, 'ইসস।'

ঋজুদা বলল, 'হাতির ল্যাজের চুল দিয়ে সুন্দর বালা তৈরি হয়। আর পা দিয়ে হয় মোড়া বা টেবিল। দাঁত দিয়ে তো অনেক কিছুই হয়। বল তো ওই দাঁতটার দাম কত হবে আন্দাজ?'

আমি বললাম, 'দশ হাজার টাকা?'

ঋজুদা বলল, 'কম করে দু-লাখ টাকা।'

'দু-লাখ! বলো কী?'

'হ্যাঁ। কম করে।' তারপরেই বলল, 'কী বুঝলি? বুঝলি কিছু?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। দু-লাখ।'

ঋজুদা বলল, 'তা নয়। এতগুলো দাঁত ওরা এভাবে ছেড়ে যাবে না। ওরা আসলে চলে যায়নি। আশেপাশেই আছে হয়তো। আমাদের দেখছে আড়াল থেকে। এখানে কম করে দশ-বারো লাখ টাকার হাতির দাঁতই আছে শুধু। অন্য চামড়া-টামড়ার কথা ছেড়ে দে। ওরা নিশ্চয়ই যায়নি। খুব হুঁশিয়ার রুদ্র। এক মিনিটও অসাবধান হবি না। তা ছাড়া, এই ভুষুন্ডাকে আমার কেমন যেন লাগছে। প্রথম দিন থেকেই। কী যে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আমি আর ঋজুদা ওই বড়ো কুঁড়েটা থেকে মাথা নীচু করে বেরোব, ঠিক সেই সময় খট করে কী একটা জিনিস এসে লাগল। ঘরের খুঁটিতে।

তাকিয়ে দেখি, একটা লম্বা তির। আর তার পিছনের পালকের কাছে এক টুকরো শুকনো সাদাটে তাল পাতা বাঁধা। ঋজুদা তাড়াতাড়ি তাল পাতাটা একটানে খুলে নিয়ে পড়ল। পড়েই, আমার হাতে দিয়েই, আমার হাত ধরে ঘরটার ভিতর দিকে সরে এল।

দেখলাম, তাল পাতার টুকরোটার উপরে কোনো গাছের ডাল বা আঙুল রক্তে ভিজিয়ে কেউ বিচ্ছিরি হাতের লেখাতে এবড়ো-খেবড়ো করে ইংরেজিতে লিখেছে: SURRENDER OR ঔকং।

আমি বললাম, 'বেরোব এখান থেকে?'

ঋজুদা বলল, 'একদম নয়।'

আমার বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করছিল। বললাম, 'দু-হাত উপরে তুলে বেরোব? সারেন্ডার করবে?'

ঋজুদা পাইপের ছাই ঝেড়ে নিল একটু, তারপর বলল, 'তোর লজ্জা করল না ওকথা বলতে?'

তারপরই বলল, 'ভুষুন্ডাকে দেখতে পাচ্ছিস? নীচু হয়ে দেখ তো।'

নীচু হয়ে দেখলাম। ভুষুন্ডা যেখানে বসেছিল, সেখানে নেই তো। বললাম, 'না। দেখতে তো পাচ্ছি না।'

'হুমম!' ঋজুদা বলল।

ঘরটার মুখের ডান দিক থেকে-যাতে আমাদের রাইফেল বন্দুকের সামনে না পড়তে হয়, এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন লোক জোরে জোরে চারটে উদ্ভট শব্দ উচ্চারণ করল।

ঋজুদা তার উত্তরে ওইরকম উদ্ভট শব্দ উচ্চারণ করেই যেদিক থেকে শব্দটা এসেছিল, সেইদিকে রাইফেলের ব্যারেল ঘুরিয়ে খড়ের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে গুলি চালিয়ে দিল। দিয়েই আমাকে বলল, 'তুই ডাইনে, বাঁয়ে ও পিছনেও গুলি কর থেমে থেমে খড়ের দেওয়ালের এপাশ থেকে।'

বলেই, পাইপের আগুনটা ঢেলে দিল খড়ের দেওয়ালের উপর। দেখতে দেখতে ঘরটাতে আগুন ধরে গেল।

আমি বললাম, 'ঋজুদা, কী করছ? আমরা যে পুড়ে মরব?'

ঋজুদা বলল, 'দারুণ ধোঁয়া হবে এতে চারদিকে। এই ঘরগুলো রেড-ওট ঘাসের। চারদিক ধোঁয়াতে ঢেকে গেলেই আমরা বাঁচতে পারব ওদের বিষের তিরের হাতে থেকে। নইলে আর বেঁচে ফিরতে হবে না।' এইটুকু বলেই, ঋজুদাও ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে রাইফেল দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগল বাইরের দিক লক্ষ্য করে। গুলির তোড়ে খোলা দরজার সামনে এসে যে কেউ আমাদের তির মারবে সে-উপায় ছিল না ওদের।

এদিকে এমনই ধোঁয়া হয়ে গেছে ভিতরে যে, নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। চালেও আগুন লাগো লাগো। চালে আগুন লাগলে আগুন চাপা পড়েই মরতে হবে। আর উপায় নেই।

আমি ভেবেছিলাম, ঋজুদা পেছন দিয়ে খড়ের দেওয়াল ফাঁক করে পালাবে। কিন্তু তা না করে এই ঘরের লাগোয়া যে ঘর আছে সেই দিকের দেওয়ালের খড়ে

রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে ফুটো করল। আমিও টেনে টেনে খড় সরালাম। আগুনে চড়চড় করে খড় পোড়ার শব্দ হু-হু হাওয়ায় শোনা যাচ্ছিল। সামনে থেকে কারা যেন খুব চেঁচিয়ে কথা বলছে। চারদিকে এত তাপ আর ধোঁয়া যে আমরাই কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বাইরের লোকেরাও নিশ্চয়ই পাচ্ছে না।

দেওয়ালটা ফুটো হতেই ঋজুদা ফুটো দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে পড়ল। আমিও পিছন পিছন। ওই ঘরেও তখন আগুন লেগে গেছিল। ঋজুদা দৌড়ে গিয়ে আবার সেই ঘরের দেওয়াল অমনি করে ফুটো করতে করতে আমাকে লাইটারটা ছুড়ে দিয়ে বলল, 'এই ঘরের চারদিকের দেওয়ালে আগুন লাগিয়ে দে।' আমরা যখন সেই ঘর পেরিয়ে তার পাশের ঘরে ঢুকলাম তখন দু-নম্বর ঘরটাও দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল। এমনি করে যখন আমরা পাঁচ নম্বর ঘর পেরিয়ে বাইরে বেরোলাম ততক্ষণে সমস্ত জায়গাটা জতুগৃহের মতো জ্বলছে। আগুনে পোড়া নানা মাংস ও চামড়ার উৎকট গন্ধে মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট শ্মশানে এসে পড়েছি।

বাইরে বেরিয়ে ওই শেষ ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল ঋজুদা। ধোঁয়াতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছিল আমাদের। কাশিও পাচ্ছিল ভীষণ। ভয়ে কাশতে পারছিলাম না। কোন দিকে যাব আমরা ভাবছি, ঠিক সেই সময় দুটো লোক তির-ধনুক হাতে নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল প্রথম কুঁড়েটার দিকে, যেখানে হাতির দাঁত ছিল। তারপর কী মনে করে ওরা আবার দৌড়ে ফিরে এল, বোধ হয় ভেবেছিল, আমরা ওই প্রথম কুঁড়েটার পিছন দিকেই বেরোব। অথবা আগুনে ঝলসে গেছি। এবারও লোকগুলো আমাদের দেখতে পায়নি-আমরা দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে ছিলাম-তা ছাড়া ওখানে যে থাকতে পারি আমরা তা ওদের ধারণারও বাইরে ছিল। কিন্তু দুটো লোকের মধ্যে পিছনের লোকটা পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই, বাঁ-দিকে তাকাল আমাদের মুখে। কুচকুচে কালো, মোটা মোটা ঠোঁটে, গুঁড়িগুঁড়ি চুলে লোকটাকে ভয়াবহ দেখাচ্ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে ও ধনুকটা আমাদের দিকে ঘোরাল, আর সঙ্গেসঙ্গে আমার বন্দুক থেকে, যেন আমার অজান্তেই গুলি বেরিয়ে গেল। বোধ হয় এল.জি. ভরা ছিল। গুলি আর দেখাদেখির সময় ছিল না। যে গুলি পাচ্ছিলাম তাই-ই ভরছিলাম অনেকক্ষণ থেকে। চার হাত দূর থেকে বুকে অ্যালফাম্যাক্স-এর এল.জি. খেয়ে লোকটা ঘুরে পড়ে গেল। হাতের ধনুক-তির হাতেই রইল।

আমি গুলি করতে-না-করতেই ঋজুদা বাঁ-দিকে ঝুঁকে পড়ে অন্য লোকটাকে গুলি করল রাইফেল দিয়ে। সে ততক্ষণে ফিরে দাঁড়িয়ে তির ছুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তিরটা গিয়ে লাগল ঋজুদার গায়ে নয়, আমার গুলি-খেয়ে-পড়ে-যাওয়া লোকটারই গায়ে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। লোকটার বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল; ঠোঁটটা নড়ল, কপালে ঘাম ভরে এল। আমি খুনি! মানুষ মারলাম আমি! এক্ষুনি একজন মানুষকে মেরে ফেললাম!

ঋজুদা আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েই বলল, 'দৌড়ো। ওরা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে হয়তো।'

দৌড়োতে দৌড়োতে ভাবছিলাম যে, হয়তো শুনতে পায়নি ওরা-আগুনের জন্যে যা শব্দ হচ্ছে চতুর্দিকে, আর যা ধোঁয়া। ওরা নিশ্চয়ই কিছু দেখতেও পায়নি।

আমরা দৌড়োতে দৌড়োতে এসে লেকের পাশে পৌঁছোলাম, কিন্তু ফাঁকা জায়গায় না বেরিয়ে লেরাই জঙ্গলের নীচের ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলাম। লেকটা পেরিয়ে একটু গিয়েই আমাদের তাঁবু। টেডি নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে উৎকণ্ঠার সঙ্গে একা একা অপেক্ষা করছে সেখানে দুপুরের খাওয়ার বন্দোবস্ত করে। আজও উগালি? দুসস।

আমি ফিসফিস করে ঋজুদাকে বললাম, 'ভুষুন্ডাকে খালি হাতে আনা আমাদের উচিত হয়নি। ওরা বোধ হয় ভুষুন্ডাকে মেরে ফেলেছে এতক্ষণে।'

ঋজুদা বলল, 'বোধ হয় না। দেখাই যাক।' তারপর আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'খুব সময়মতো গুলিটা করেছিলি তুই। লোকটা ধনুকের ছিলাতে টান দিয়েছিল, আর এক সেকেন্ড দেরি হলে-ওয়েল-ডান।'

আমি বললাম, 'ইসস, মানুষ মারলাম!'

ঋজুদা বলল, 'শখ করে তো আর মারিসনি। তা ছাড়া ওরা জঘন্য অপরাধ করছে। আমাদের মেরেও তো ফেলত একটু হলে। না মারলে, আমরা নিজেরাই মরতাম! করার তো কিছু ছিল না।'

ওখানে বসে বসেই দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের পিছনে বহু দূরে জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর ভস্মীভূত রেড-ওট ঘাস উড়ছে আকাশে। ফ্লেমিংগোগুলো জলে তাদের শরীরের গোলাপি ছায়া ফেলে অদ্ভুত উদাস স্বরে ডাকছে। জলের উপরে তাদের গলার স্বর ভেসে যাচ্ছে অনেক দূর অবধি।

আমি বললাম, 'ওরা যেই জানবে যে আমরা ওদের দু-জনকে মেরে পালিয়ে গেছি তখন প্রতিশোধ নিতে তাঁবুতে যাবে না তো! আমাদের মেরে তবে নিশ্চিত হবে হয়তো ওরা।'

ঋজুদা বলল, 'অত সাহস হবে না। এ যাত্রা ওরা হয়তো পালিয়েই যাবে। যারা নিজেরা অন্যায় করে এবং জানে যে, তারা অন্যায় করছে, তাদের মেরুদণ্ডে জোর থাকে না। সাহসের অভাব হয় ওদের। যে কারণে বড়ো বড়ো যুদ্ধেও দেখা যায় যে, অনেক বেশি বলশালী হয়েও যে-দেশ অন্যায় করে তারা হেরে যায় যাদের উপর

অন্যায় করা হয়েছে সেই দেশের সৈন্যদের মনের জোরের কাছে। অন্যায় যারা করে, তারা একটা জায়গায়, একটা সময়ে পৌঁছে ভীরু হয়ে যায়ই। মানুষ অন্য সকলকেই ঠকাতে পারে, পারে না কেবল নিজের বিবেককে। যদি সে মানুষ হয়!'

আমরা ওখানে প্রায় দু-ঘণ্টা চুপ করে বসে রইলাম। লেকের অন্য পাশে যে পথটা তাঁবুর দিকে গেছে তা দিয়ে একদল এলান্ড আর টোপি এন্টেলোপ চলে গেল। এই টোপিগুলো বেশ বড়ো হয়। আমাদের দেশের শম্বরের মতো, তবে শিং বড়ো হয় না। শরীরের সঙ্গে যেখানে পা মিলেছে সেখানটা কেমন নীল রঙের হয়-আর শরীরটা খয়েরি। এলান্ডও বেশ বড়ো হয়।

তারা চলে যাবার পর একটা মস্তবড়ো বেবুন-পরিবার চলে গেল কিরখির করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে। কিন্তু কোনো মানুষকেই দেখা গেল না। এদিকে বেলা অনেক হয়েছে। কী করে যে এত সময় কেটে গেল, বোঝাই গেল না। এতক্ষণ ঋজুদা পাইপও খায়নি, পাছে ওয়ান্ডারাবোরা ধোঁয়া দেখতে পায়।

আমরা এবার উঠে সাবধানে এগোলাম। আস্তে আস্তে সমস্ত পথটা পেরোলাম। লেকটা পেরিয়ে এলাম, আবার লেরাই জঙ্গল, তারপর দূর থেকে তাঁবুটা দেখা গেল। এবারে পুরো তাঁবুটাই দেখা যাচ্ছে। তাঁবুর বাইরে আগুনের উপর রান্নার বাসন ছড়ানো আছে। কিন্তু আগুন নিভে গেছে। টেডি বোধ হয় খাবার গরম করবে আমরা ফিরলে।

হঠাৎ ঋজুদা বলল, 'ল্যান্ড-রোভার?'

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম! কোথায় গেল? আমাদের ট্রেলারসুদ্ধু ল্যান্ড-রোভার?

ঋজুদার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'যা ভেবেছিলাম!' তারপরই বলল, 'চাবিটা তুই নিজের কাছে রাখিসনি? কাল তো তুই-ই গাড়ি চালিয়ে এসেছিলি!'

আমি বললাম, 'আমার কাছেই তো ছিল। কাল সন্ধ্যে বেলায় ভুষুন্ডা চেয়ে নিয়েছিল। ড্রাইভিং সিটের দরজা বাইরে থেকে লক করে শোবে বলে-যাতে সিংহ-টিংহ এলে ভয় না থাকে। সিংহ তো এসেও ছিল রাতে।'

ঋজুদা এবারে দৌড়োতে লাগল তাঁবুর দিকে। আমিও পিছনে পিছনে।

আমি ডাকলাম, 'টেডি, টেডি!'

টেডিও কি ভুষুন্ডার মতো বিশ্বাসঘাতকতা করল আমাদের সঙ্গে? কত ভালো টেডি! কত সুন্দর গল্প বলবে বলেছিল আমাকে ও আজ রাতে!

টেডি বাইরে কোথাও নেই। তাঁবুর ভিতরেও নেই; আমাদের তাঁবুর ভিতরে ঢুকে দেখলাম, কারা যেন সব লণ্ডভণ্ড করেছে। ঋজুদার কাগজপত্র, অন্যান্য জিনিস, আমাদের বন্দুক-রাইফেলের গুলি যা তাঁবুতে ছিল সবই নিয়ে গেছে তারা। ঋজুদার

ফোর-ফিফটি ফোর হান্ড্রেড রাইফেলটা পর্যন্ত। আমাদের খাবারদাবার, বন্দুক, রাইফেলের গুলির বাক্স, পেট্রোল, আরও সমস্ত জিনিসপত্র যা ট্রেলারের ভিতরে রাখা ছিল সবই গেছে ট্রেলারের সঙ্গে।

ঋজুদা বলল, 'রাইফেল নিয়েছে বটে, কিন্তু লকটা আমার কাছে। ও দিয়ে গুলি ছুড়তে পারবে না।'

কিন্তু টেডি? টেডি কোথায় গেল? টেডিও কি আমাদের শত্রুপক্ষ? ঋজুদা এত বোকা! যখন ওদের ইন্টারভিউ করে আরুশাতে এসে তিন মাস আগে সিলেক্ট করে তখন ওদের সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজখবরও নেয়নি?

আমাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে তাঁবুর পিছনে যেতেই, আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এল। টেডি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। যেন তার কিছুই হয়নি। যেন ও ঘুমাচ্ছে। শুধু একটা ছোট্ট তির গেঁথে রয়েছে ওর গলাতে।

ঋজুদা এসে আমার পাশে দাঁড়াল। বলল, 'ভুষুন্ডা!'

বলেই, তাঁবুর সামনে এসে নীচু হয়ে ধুলোর মধ্যে কী যেন খুঁজতে লাগল। নিজের মনেই বলল, 'ঠিক।'

আমি বললাম, 'কী?'

ঋজুদা বলল, 'ভুষুন্ডা টেডিকে মেরে ফেলার পর ওয়ান্ডারাবোরা ওর সংকেতে এখানে আসে। তারপর ল্যান্ড-রোভার ও ট্রেলারে চড়ে ভুষুন্ডার সঙ্গে পালিয়ে যায়। কয়েকজনকে রেখে যায় হয়তো আমাদের শেষ করে মালপত্র নিয়ে হাঁটা-পথে যাওয়ার জন্যে।

'কী সাংঘাতিক! এখন আমরা কী করব ঋজুদা?' আমি একেবারে ভেঙে পড়ে বললাম!

ঋজুদা বলল, 'দাঁড়া! দাঁড়া। ভয় পাস না। কিন্তু আগে টেডিকে কবর দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। নইলে রাতে হায়না আর শেয়ালে বেচারাকে ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু এখানের মাটি যে খুব শক্ত!'

আমি আর ঋজুদা টেডিকে বয়ে নিয়ে গেলাম লেকের কাছে। তাঁবুর খোঁটা গাড়বার শাবল দিয়ে আমরা দু-জনে মিলে কয়েক ঘণ্টা ধরে একটা বড়ো গর্ত করলাম। তারপর টেডিকে তার মধ্যে শুইয়ে, জঙ্গল থেকে অনেক ফুল তুলে এনে উপরে ছড়িয়ে দিলাম। আমরা যখন টেডিকে কবর দিচ্ছিলাম তখন ওয়ান্ডারাবোদের আর কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না।

পশ্চিমাকাশে একটা দারুণ গোলাপি রং ছড়িয়ে গেছিল। রংটা কাল খুব খুশির মনে হয়েছিল। আজ মনে হল বড়ো দুঃখের।

একটা সাদা কাগজে বড়ো বড়ো করে ঋজুদা লিখল, টেডি মহম্মদ, আমাদের বিশ্বস্ত, আমুদে, সাহসী বন্ধু, এইখানে শুয়ে আছে। তার নীচে লিখল, ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি-অপারেশন: ওয়ান্ডারাবো ওয়ান। তারও নীচে তারিখ দিয়ে লিখে দিল, ঋজু বোস অ্যান্ড রুদ্র রায়চৌধুরী।

আমি ভাবছিলাম, আমাদের বন্ধু টেডি এখানেই শুয়ে থাকবে। শীতের শিশির পড়বে ওর কবরের উপর। স্টার্লিং পাখিরা কিচিরমিচির করে গান গাইবে কানের কাছে। নরম পায়ে ডিক-ডিক হরিণ হেঁটে যাবে। বর্ষাকালে ফিসফিস করে বৃষ্টি আলতো করে হাত ছোঁয়াবে ওর গায়ে। রামধনু-হাতে খনভাম এসে দেখে যাবেন টেডিকে। বাজপড়ার শব্দ হয়ে কথা বলবেন টেডির সঙ্গে। হয়তো কোনো গাঢ় অন্ধকার রাতে গুগুনোগুম্বার অথবা ওগরিগাওয়া বিবিকাওয়া চুপিসারে কোনো কুচকুচে কালো লোমশ জানোয়ারের মূর্তি ধরে এসে টেডির কবরের কাছে থাবা গেড়ে বসে ওকে পাহারা দেবেন।

পশ্চিমে অল্প ক-টি অ্যাকাসিয়া গাছের পাহারায়, ধু-ধু দিগন্তের উপরে সূর্য হারিয়ে গেল আজ। টেডিও হারিয়ে গেল। চিরদিনের মতো।

আমার চোখ জলে ভরে এল।

কাল রাতে আমাদের ঘুম হয়নি। ঘুমোবার সাহসও হয়নি। ঋজুদা ম্যাপ নিয়ে আঁকিবুঁকি করেছিল তাঁবুর সামনে বসে, আর বই পড়েছিল। আমাকে তাঁবুর মধ্যে ঘুমোতে বলেছিল বটে, কিন্তু একটু করে শুয়েছি আর ঋজুদার কাছে এসে বসেছি বারবার আগুনের সামনে।

কাল রাতেও সিংহগুলো এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু দূর দিয়ে চলে গেছিল। ওরা বোধ হয় কোনো বড়ো জানোয়ার, মোষ অথবা টোপি মেরে থাকবে। বেশ শান্ত-সভ্য ছিল রাতে। আমাদের কাল কিছুই খাওয়া হয়নি। খাওয়ার মতো মনের অবস্থাও ছিল না। আজ সকালে জিনিসপত্র হাতড়ে একটা বিস্কুটের টিন বেরোল। সেই বিস্কুট আর কফি খেলাম আমরা।

আমি বললাম, 'কী হবে ঋজুদা! চলো আমরা মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে যাই নাইরোবি সর্দারের গ্রামে। তাও তো এখান থেকে ষাট-সত্তর মাইল কম করে। জলও তো সব ট্রেলারেই ছিল। এই জায়গাতে নাহয় ঝরনা আছে। এই জায়গা ছেড়ে গেলে আমরা জল পাব কী করে? তার চেয়ে চলো ফিরে যাই।'

ঋজুদা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'এখানে আমরা কেন এসেছিলাম?'

আমি ঋজুদার চোখে তাকিয়ে লজ্জা পেলাম। মুখ নীচু করে বললাম, 'তা ঠিক!'

ঋজুদা বলল, 'ভুলে যাস না রুদ্র যে, তুই মানুষ! মানুষ মনের জোরে কী না পারে, কী না করতে পারে? একা একা পালতোলা নৌকোতে মানুষ সমুদ্র পেরোয়নি? মরুভূমি পেরোয়নি পায়ে হেঁটে? এইসব জায়গায় যখন প্রথম ইংরেজ ও জার্মান পর্যটকরা আসেন, শিকারিরা আসেন, বিজ্ঞানীরা আসেন, তাঁরা কি গাড়ি করে এসেছিলেন? এই অঞ্চলেই একজন জার্মান প্রজাপতি-সংগ্রাহক একা একা প্রজাপতি খুঁজতে এসে রিফটভ্যালিতে মানুষের হাড় কুড়িয়ে পেয়ে ফিরে গিয়ে বার্লিন মিউজিয়ামে জমা করেন। তার থেকে আবিষ্কার হয় ওলডুভাই গর্জ-এর। ডা. লিকি সস্ত্রীক এসে বছরের পর বছর এই রকমই জায়গায়, তাঁবু খাটিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি চালান সেখানে। আবিষ্কৃত হয় কত নতুন তথ্য, কত কী জানতে পারেন।'

একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, 'রুদ্র, তুই না অ্যাডভেঞ্চারের লোভে প্রায় জোর করেই আমার সঙ্গে এসেছিলি আফ্রিকায়? এরই মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের শখ মিটে গেল! তোর বয়সি গুজরাটি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি ছেলেরা বিদেশ বিভুঁইতে একা একা ব্যাবসা করতে চলে আসে। দেখলি তো ডার-এস-সালাম-এ, আরুশাতে কত ভারতীয় ব্যাবসা করছে। তার মধ্যে বাঙালি দেখলি একজনও?'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তুই তাহলে আমার সঙ্গে এলি কেন? আমি তো এখানে ছেলেখেলা করতে আসিনি। জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেই এসেছি।'

ঋজুদার হাঁটুতে হাত দিলাম। বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করো। বলো, আমরা এখন কী করব?'

ঋজুদা আমার হাতে হাত রেখে বলল, 'আমরা এখন জিপের চাকার দাগ ধরে এগোব। প্রথমত, ওরা কোথায় যায় তা দেখতে চাই আমি। আমি যে কাজে এসেছি তার জন্যে ওদের চলাচলের পথ জানা দরকার। দ্বিতীয়ত, ওরা ট্রেলারটা কিছুদূর গিয়েই ছেড়ে দেবে। কারণ ট্রেলার নিয়ে জোরে গাড়ি চালাতে পারবে না। ট্রেলারটা পেলে আমরা মালপত্র পেয়ে যাব। ওইসব মাল ওরা ভয়ে নেবে না-পাছে চোরাই মাল সন্দেহে পুলিশ ওদের ধরে।'

আমি বললাম, 'তুমি কি পায়ে হেঁটে ওদের গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে?'

ঋজুদা বলল, 'তা পারব, যদিও সময় লাগবে। তা ছাড়া ভুষুন্ডার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। আসলে ও তো কর্মচারী। এই যেসব লোক দেখছিস, এইসব নানা চোরাশিকারির দল, ভুষুন্ডার মতো অর্ধশিক্ষিত লোকেরা, সব এক বিরাট দলের মধ্যে আছে। এইসব দলকে চালায় খুব ধনী ব্যবসায়ীরা। তাদের জন্য ব্যাবসার আড়ালে এটাও তাদের একটা লাভের ব্যাবসা। আমি যে-কাজে এসেছি, তা সফল হলে, অনেক রাঘববোয়ালের মাথা ধরে টান পড়বে। তাই তারা আগেভাগেই বুদ্ধি করে ভুষুন্ডাকে আমার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। সরষের মধ্যেই ভূত ঢুকিয়ে দিয়েছিল, ভূত

আর ঝাড়বে কী করে বল ওঝা? ভুষুন্ডা একা লোক নয়। ও এক বিরাট চক্রের একটি যন্ত্র মাত্র। ও তো সামান্য চাকর। আমার দরকার ভুষুন্ডার মালিকদের। ফয়সালা তাদেরই সঙ্গে। তবে ভুষুন্ডার সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হবে টেডির কারণে। টেডির মৃত্যুর প্রতিশোধ এই আফ্রিকার জঙ্গলেই আমি নেব।'

আমি বললাম, 'চলো তাহলে, আর দেরি কেন?'

ঋজুদা উঠল। দু-জনের হ্যাভারস্যাকে যা-যা অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়া যায় তা ভরে নিয়ে, দু-জনের কাঁধে দুটো জলের ছাগল উঠিয়ে ভালো করে বেঁধে নিয়ে আমরা রওনা হলাম নিরুদ্দেশ যাত্রায়। পিছনে পড়ে রইল তাঁবু দুটো-আমাদের ক্যাম্প-কট, বিছানা, জুতো, জামা, অনেক কিছু জিনিস, যা বইবার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর পড়ে রইল টেডি, চিরদিনের জন্যেই পড়ে রইল।

ল্যান্ড-রোভার আর ট্রেলারের চাকার দাগ দেখে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। মাইল দুয়েক আসার পর পিছনের সব কিছু ধু-ধু মাঠের রোদের তাপে আর হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এখন আমরা আবার ঘাসের সমুদ্রে এসে পড়লাম। কম্পাসই সম্বল এখন। আর সূর্য। এই সাভানা! পৃথিবীর এক ভৌগোলিক আশ্চর্য!

সারাদিনে হেঁটে আমরা কত মাইল এলাম বলা মুশকিল, কিন্তু আমরা এখনও ল্যান্ড-রোভারের চাকার দাগ হারাইনি। মাঝে একবার গোলমাল হয়ে গেছিল দুপুরের দিকে। তারপর ঋজুদা আবার খুঁজে পেয়েছিল। যেদিকে চোখ যায় শুধু ধু-ধু হলুদ ঘাসের প্রান্তর। একটাও গাছ নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই, মানুষ নেই-শুধু জানোয়ারের মেলা। সেৎসি মাছির জন্যে এখানে মাসাইরাও বিশেষ গোরু চরাতে পারে না। বসবাস করতে পারে না রাইফেল-বন্দুকধারী মানুষও। এমনই সাংঘাতিক এই মৃত্যুবাহী মাছিরা!

সন্ধ্যের আগে আগে আমরা কিছুটা ঘাস পরিষ্কার করে জিনিসপত্র নামিয়ে বসলাম। এক টিন ককটেল সসেজ বেরোল। কফি এখনও আছে! কফি আর সসেজ খেয়ে, হ্যাভারস্যাকে মাথা দিয়ে রাইফেল পাশে রেখে কম্বল মুড়ে শুয়ে পড়লাম দু-জনে। পাশাপাশি! রাতে ভালো ঠান্ডা পড়বে।

আস্তে আস্তে তারারা ফুটে উঠল। কাল থেকে আজ চাঁদের জোর বেশি। দিনভর হেঁটে দু-জনেই খুব ক্লান্ত ছিলাম। ঋজুদা তো কাল রাতে একটুও ঘুমোয়নি। তাই দু-জনেই শুতে-না-শুতেই ঘুমোলাম।

মাঝরাতে কী যেন একটা শব্দে আমি চমকে উঠলাম। মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝি! হঠাৎ হাজার হাজার খুরের জোর শব্দে ঘুমচোখে উঠে বসে দেখি, ঋজুদা আমাদের দু-জনেরই পাঁচ ব্যাটারির টর্চ দুটো জ্বালিয়ে রেখেছে সামনে। আর সেই

আলোতে দূরে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার জানোয়ার জোরে ছুটে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুবে প্রচণ্ড শব্দে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে।

আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম, কী ব্যাপার?

কিন্তু আমার গলার স্বর গলার মধ্যেই মরে গেল। এত আওয়াজ!

অনেকক্ষণ, কতক্ষণ ধরে যে ওরা দৌড়ে গেল তার হিসেব করতে পারলাম না। শব্দ থামলে দেখা গেল, ধুলোর মেঘে আকাশের চাঁদ-তারা সব ঢেকে যাওয়ার জোগাড়।

ঋজুদা বলল, 'আশ্চর্য! এই সময় তো মাইগ্রেশানের সময় নয়! ওরা এমন করে দৌড়ে গেল কেন? কোনো আগ্নেয়গিরি কি জেগে উঠল? নিশ্চয়ই কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটবে। নইলে এরকম হত না!'

কত হাজার জানোয়ার যে ছিল বলতে পারব না। লক্ষও হতে পারে। জেব্রা, ওয়াইল্ড-বিস্ট আর গ্যাজেলস।

ঋজুদা বলল, 'আমরা এতক্ষণে কিমা হয়ে মিশে যেতাম ওদের পায়ে পায়ে। দূর থেকে শব্দ শুনে উঠে পড়ে ভাগ্যিস দুটো টর্চ একসঙ্গে জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাতে লেগেছিলাম। তাতেই সামনে যারা আসছিল তারা দয়া করে পথ একটু পালটাল। নইলে পুরো দলটাই আমাদের উপর দিয়ে চলে যেত।'

আমি বললাম, 'ঋজুদা! ল্যান্ড-রোভারের চাকার দাগ তো আর দেখা যাবে না। ওরা বোধ হয় কয়েক মাইল জায়গা একেবারে সাদা করে দিয়ে গেছে পায়ে পায়ে। তাই না?'

ঋজুদা বলল, 'ঠিক বলেছিস তো! আমার তো খেয়ালই হয়নি!'

বললাম, 'এখন কী করবে তবে?'

ঋজুদা বলল, 'ঘুমোব। নে, শুয়ে পড়। আর মনে কর, তোদের বাড়ির দক্ষিণের ঘরে, গ্রিল দেওয়া জানালার পাশে ডানলোপিলোর বিছানায় ধবধবে সাদা চাদরে ঘুমিয়ে আছিস। ঠিক ছ-টার সময় জনার্দন ট্রেতে করে ফলের রস এনে বলবে, ওঠো গো দাদাবাবু! আর কত ঘুমোবে?'

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'তুমিও সেইরকম ভাবো।'

বলে, দু-জনেই শুয়ে পড়লাম।

ভোর হল শকুনের চিৎকারে। আমাদের চারধারে বড়ো বড়ো বিশ্রী দেখতে লাল মাথা প্রায় একশো শকুন উড়ছে, বসছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে হাঁটছে। আমরা কি মরে গেছি? নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলাম, না তো! দিব্যি নিশ্বাস পড়ছে। ঋজুদা দেখলাম ছবি তুলছে শকুনগুলোর।

আমি উঠে বসতেই ঋজুদা বলল, 'আশ্চর্য! এরা কি আমাদের মড়া ভাবল! ব্যাপারটা কী বল তো?'

আমার মনে পড়ল টেডি বলেছিল একটা প্রবাদের কথা। শকুন যদি কোনো জীবন্ত মানুষের তিন দিকে ঘিরে থাকে তাহলে সে-মানুষ তিন দিনের মধ্যে মরে যায়। শকুনগুলো আমাদের চারদিক ঘিরে রয়েছে।

ঋজুদাকে এই কথা বলতেই সে বলল, 'তোর লেখাপড়া শেখা বৃথা হয়েছে।'

বলেই, গুলিভরা শটগানটা তুলে নিয়ে দুমদাম করে দু-দিকে দুটো গুলি করে দিল। দুটো শকুন উলটে পড়ল। অন্য শকুনগুলো সঙ্গেসঙ্গে বিচ্ছিরি চিৎকার করে উড়ে গেল।

ঋজুদা বলল, 'চল তো এই ভাগাড় থেকে পালাই।' বলে মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চলল। পিছন পিছন আমি।

আমরা একটু দূরে গিয়ে, ঘাস পরিষ্কার করে, খাবারদাবারের বন্দোবস্ত করছি, এমন সময় দেখি অন্য শকুনগুলো ওই দুটো মরা শকুনকে খেতে লেগেছে।

ঋজুদা সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'এদের দেখে আমার মানুষদের কথা মনে পড়ছে। সংসারে কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা এই শকুনগুলোর মতো।'

আমি বিস্কুটের টিন বের করলাম। নাইরোবি সর্দারের দেওয়া দুটো কলা ছিল। মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, সব ভুলে গেছি। জল কোথায়? খাওয়ার জলই যেটুকু আছে তাতে ক-দিন চলবে ঠিক নেই। ঋজুদাকে কলা ও বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে কফির জল চড়ালাম, কফির খালি টিনে।

ঋজুদা বাইনোকুলারটাকে তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে এদিকে-ওদিকে দেখতে লাগল। আমি খেতে খেতে ফুটন্ত জলের দিকে লক্ষ রাখলাম।

হঠাৎ ঋজুদা বাইনোকুলারটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'ভালো করে দেখ তো, রুদ্র। কিছু দেখতে পাস কি না?'

ফোকাসিং নবটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভালো করে দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম! জাইস-এর বাইনোকুলার। খুবই পাওয়ারফুল। তাতে দেখলাম দূরদিগন্তের একটি জায়গায় একটু সবুজ-সবুজ ভাব-যেন জঙ্গল আছে, আর তার ঠিক সামনে একটা ল্যান্ড-রোভার ট্রেলারসুদ্ধু।

বাইনোকুলারটা নামিয়ে খালি চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না।

ঋজুদা বলল 'কী দেখলি?'

আমি বললাম, 'দেখলাম।'

ঋজুদা বলল, 'তবে এবার খেয়েদেয়ে চল। যাওয়া যাক।'

খাওয়া শেষ করে আমরা আবার মালপত্র কাঁধে নিয়ে রওনা হলাম।

ট্রেলারটা ভুষুন্ডা ছেড়ে যাবে ভেবেছিলাম। ঋজুদা তেমনই বলেছিল। কিন্তু জিপটাও যখন ট্রেলারের সঙ্গে আছে তখন ব্যাপারটা কী বোঝা যাচ্ছে না মোটেই। ওরা কি তবে ওখানেই আছে? গাড়ির কাছে? নাকি গাড়ি এবং ট্রেলার হজম করতে পারবে না বলে পথেই ফেলে গেছে।

একটু যেতেই হঠাৎ গুড়-গুড়-গুড় একটা শব্দ শুনতে পেলাম। চারধারে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না আমি। ঋজুদা আকাশে তাকাতে বলল। তাকিয়ে দেখি, এক-ইঞ্জিনের একটা সাদা আর হলুদ রঙের মোনোপ্লেন উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছে।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি মালপত্র নামিয়ে রেখে তার জামার কলারের নীচে ভাঁজ করে রাখা লাল সিল্কের রুমালটা জোরে জোরে নাড়তে লাগল। আমিও ক্যামেরা-মোড়া হলুদ কাপড়ের টুকরোটাকে পতাকার মতো ওড়াতে লাগলাম হাওয়াতে। কিন্তু প্লেনটা আমাদের দেখতে পেল বনে মনে হল না। যেমন যাচ্ছিল, তেমনই উড়ে চলল। দেখতে দেখতে একটি ছোটো হলুদ সাদা পাখির মতো দিগন্তে হারিয়ে গেল প্লেনটা।

আমরা আবার মালপত্র তুলে নিয়ে এগোলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর খালি চোখেই গাড়িটাকে দেখা গেল দিগন্তে একটা গুবরে পোকার মতো। আমরা এগিয়ে চললাম। ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর গাড়িটার কাছাকাছি এসে ঋজুদা বলল, 'এবারে একসঙ্গে নয়। তুই বাঁ-দিকে চলে যা, আমি ডান দিকে যাচ্ছি। গুলি ভরে নে তোর শটগানে। কোনো লোক দেখলেই গুলি চালাবি। ওদের তির যতখানি দূরে পৌঁছোতে পারে সেই দূরত্বে পৌঁছোনোর অনেক আগেই গুলি চালাবি। আর কোনো খাতির নেই। কোনো রিস্ক নিবি না। খুব সাবধান। ওরা গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে। তাহলে একেবারে কাছে না যাওয়া অবধি কিন্তু বুঝতেই পারবি না।'

সুতরাং খু-উ-ব সাবধান।

আমরা ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে ঋজুদা আরেকবার বাইনোকুলার দিয়ে ভালো করে দেখে নিল, গাড়িটা এবং তার চারপাশে।

তারপর বলল, 'গুড লাক, রুদ্র।'

আমরা দু-জনে দু-দিকে ছড়িয়ে যেতে লাগলাম। ক্রমশ দু-জনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যেতে লাগল। যখন আমি গাড়িটা থেকে দু-শো গজ দূরে তখন আমার দিকে লক্ষ্য করে গাড়ির দিক থেকে কেউ গুলি ছুড়ল। আমি কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। গাদা-বন্দুকের গুলি। আমার সামনে পড়ল গুলিটা। ধুলো উড়ে গেল। আমি গুলি করার আগেই ঋজুদার রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল। আমি দৌড়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম এবার। আমার শটগানের এফেক্টিভ রেঞ্জ একশো গজ। তার চেয়ে বেশি দূর

থেকে গুলি করে লাভ নেই। আরও একবার গুলি হল। এবার দেখতে পেলাম, দু-জন লোক একজন লোককে বয়ে নিয়ে জঙ্গলের দিকে যাবার চেষ্টা করছে। ওই লোকটার গায়ে নিশ্চয়ই ঋজুদার গুলি লেগেছে। আমি এবারে গুলি করলাম এল.জি. দিয়ে। দুটো লোকের মধ্যে একটা লোক পড়ে গেল। তখন বাকি লোকটা তাকে ও অন্য লোকটিকে ফেলে খুব জোরে দৌড়ে পালাল। লোকটার দৌড়োনোর ধরন ও জামাকাপড় দেখে মনে হল যে, সে ভুষুন্ডা। আমার ভুলও হতে পারে। অল্পক্ষণের মধ্যেই যে লোকটি দৌড়োচ্ছিল সে পিছনের নিবিড় জঙ্গলে পৌঁছে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

আমি আর ঋজুদা প্রায় একসঙ্গেই দৌড়ে গিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছোলাম।

ঋজুদা ট্রেলারের উপর উঠে গাড়ির ভিতরটা ভালো করে দেখে নিল। তারপর মাটিতে শুয়ে থাকা লোক দুটোর দিকে এগিয়ে এল। আমি ওই দিকেই যাচ্ছিলাম। এমন সময় সাঁ করে একটা তির ছুটে এল আমার দিকে। যে লোকটা গুলিতে ধরাশায়ী হয়েছিল সে-ই তিরটা ছুড়েছিল। কিন্তু শুয়ে শুয়ে ছোড়ার জন্যেই হোক, বা যে কারণেই হোক, তিরটা আমার মাথার অনেক উপর দিয়ে চলে গেল এবং সঙ্গেসঙ্গে ঋজুদার রাইফেলের গুলি লোকটাকে স্তব্ধ করে দিল। লোকটা একটু নড়ে উঠে পা-দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দিল। তির-ধনুক-ধরা হাত দুটো দু-দিকে আছড়ে পড়ল ঘাসের উপর।

আমরা গিয়ে লোক দুটোর কাছে দাঁড়ালাম। প্রথম লোকটি, যাকে বাকি দু-জন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ততক্ষণে মরে গেছে। ঋজুদার রাইফেলের গুলি তার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। দ্বিতীয় লোকটিও মারা যাবে এক্ষুনি। আমরা কাছে যেতেই বিড়বিড় করে কী বলল।

ঋজুদা ওয়াটার-বটল খুলে তার মুখে জল ঢেলে দিল। এক ঢোক খেল সে। তারপরই মুখটা বন্ধ হয়ে গেল, কষ বেয়ে জল গড়িয়ে গেল, মাথাটা একপাশে এলিয়ে গেল। দুটো খোলা চোখ স্থির হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

আমার গা বমি বমি লাগছিল। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

ঋজুদা বলল, 'বেচারিরা! ওরা কেউ নয়। যারা ওদের আড়ালে থাকে চিরদিন, তাদের মারতে পারলে তবেই হত।'

তাড়াতাড়ি ট্রেলারের উপরের দড়ি কেটে কয়েক টিন খাবার বের করে নিল ঋজুদা। পাইপের টোব্যাকো, দেশলাই এবং রাইফেল ও বন্দুকের গুলিও। তারপর বলল, 'আর নষ্ট করার মতো সময় নেই। চল রুদ্র।'

আমরা দৌড়ে চললাম যেদিকে ওই লোকটা দৌড়ে গেছিল সেদিকে।

দৌড়োতে দৌড়োতে আমি ঋজুদাকে শুধোলাম, 'ভুষুন্ডা?'

ঋজুদা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। মুখে কোনো কথা বলল না।

জঙ্গলের কিনারাতে দৌড়ে যেতেই পরিষ্কার দেখা গেল একটা পায়ে-চলা পথ। আমরা সেই পথের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক সেইসময় কে যেন আবার গুলি করল অনেক দূর থেকে গাদা-বন্দুক দিয়ে। সিসের গুলিটা ঠক করে আমাদের একেবারে সামনে একটা বড়ো গাছের গুঁড়িতে এসে আটকে না গেলে কী হত বলা যায় না।

আমরা শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়োলাম! পথ ছেড়ে।

কিন্তু শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে দৌড়ে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। এমনকী কারও পায়ের চিহ্নও নয়। তবে কি গাছ থেকে কেউ গুলি ছুড়ল? ভুষুন্ডা কি এই জঙ্গলে একা, না সঙ্গে আরও লোক আছে? কিছুটা এগিয়ে যাবার পরই সামনে একটু দোলামতো জায়গা দেখলাম। সেখানে চাপ চাপ ঘাস হয়েছে সবুজ। বর্ষাকালে নিশ্চয়ই জলে ভরা থাকে জায়গাটা। সেই জায়গাটাতে নেমে গেল ঋজুদা, তারপর আমাকেও ইশারাতে ডেকে নামতে বলল। সেই দোলার মধ্যে থেকে একটা প্রকাণ্ড বড়ো গাছ উঠেছে। ফিকাস গাছ। ঋজুদা আমাকে আগে উঠতে ইশারা করল, আমার পেছনে পেছনে নিজে উঠল। আমরা কুড়ি ফুট মতো উঠে দুটো বড়ো ডাল দেখে পাশাপাশি বসলাম। ওই মালপত্র নিয়ে গাছে ওঠা সহজ কথা নয়। কিন্তু আমাদের তো সবই গেছে-এখন এই সবেধন নীলমণি যা আছে তা খোয়ালে বাঁচাই মুশকিল হবে। তাই এগুলোকে কাঁধছাড়া করা যাচ্ছে না এক মুহূর্তও।

কারও মুখে কথা নেই কোনো। আমরা দু-জনে দু-দিকে দেখছি। হঠাৎ নীচের সবুজ দোলা থেকে প্রচণ্ড জোরে কে যেন শিস দিল। এত জোরে হল শব্দটা যে, মনে হল কোনো গাড়ির টায়ার পাংচার হল বুঝি।

ঋজুদা চমকে উঠল। মনে হল, একটু ভয়ও পেল। ভয় পেতে তাকে বড়ো একটা দেখিনি। পরমুহূর্তেই বলল, 'তোর কাছে এক নম্বর কি দু-নম্বর শটস আছে?'

আমি হ্যাভারস্যাকে হাত ঢুকিয়ে বের করলাম একটু দু-নম্বর গুলি।

ঋজুদা বলল, 'তোর বন্দুকের ডান ব্যারেলে ভরে রাখ। এক্ষুনি।'

ডান ব্যারেল থেকে এল.জি. বের করে শটস ভরে নিলাম। ঠিক সেই সময় আবার শব্দটা হল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

কিছুক্ষণ পর সেই শব্দটা আরও দূরে, জঙ্গলের গভীরে শুনলাম। আমরা যেদিক থেকে এলাম সেদিকে।

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, 'গুলি আবার বদলে নিয়ে বোস।'

ওই গাছে বসেই লক্ষ করলাম যে, আমাদের বাঁ-দিকে, জঙ্গলের প্রায় গায়ে একটা প্রকাণ্ড কোপি আছে। বিরাট বিরাট বড়ো বড়ো কালো পাথর আর গুহায় ভরা টিলার মতো। এমন অদ্ভুত টিলা আমাদের দেশে দেখা যায় না।

আমি ঋজুদাকে ইশারাতে দেখালাম। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওইদিকে, তারপর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঋজুদার।

কী একটা ছোটো কাঠবিড়ালির মতো জানোয়ার সামনের একটা গাছে উঠছিল নামছিল। ছাই আর সবুজ-সাদা রং, ন্যাড়া মুখটা।

ঋজুদাকে দেখালাম ওই দিকে। ঋজুদা বলল, 'ওটা কাঠবিড়ালি নয়। একটা পাখি। ওদের নাম গো-এওয়ে। ওদের ডাক শুনলে মনে হয় বলছে, গো-এওয়ে, গো-এওয়ে।'

আমি বললাম, 'ও তো তাহলে আমাদের চলে যেতে বলছে?'

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, 'আপাতত এখানেই শুয়ে ঘুমো। এত মোটা মোটা ডাল। খাটের চেয়েও চওড়া। তবে দেখিস, নাক ডাকাস না যেন।'

দুপুরেও কোনো আওয়াজ পেলাম না কারও। গাছের ডালে বসেই ক্যানড স্যামন খেলাম আমরা। আর জল।

আমার অধৈর্য লাগছিল। গাছের ডালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁদরের মতো বসে থেকে কী লাভ?

এদিকে ভুষুন্ডা হয়তো কত মাইল ভিতরে চলে গেছে এতক্ষণে। ঋজুদা কী যে করে, কেন যে করে, সেসব আমার বোঝা ভার। মাঝে মাঝে বিরক্তি লাগে। মুখে বলেও না কিছু যে, মতলবটা কী তার!

বিকেলে যখন আলো পড়ে এল তখন আস্তে আস্তে আমরা গাছ থেকে নামলাম। ঋজুদা বলল, 'একদম শব্দ করবি না। আর আলোও জ্বালাবি না।'

বাইরের বিস্তীর্ণ মাঠে যদিও তখন অনেক আলো, বনের ভিতরে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। নানা জাতের হরিণ, পাখি ও বেবুনের ডাকে জঙ্গল সরগরম। সেৎসি মাছির পাখার গুঞ্জরন শোনা যাচ্ছে বনাঞ্জা প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দের মতো।

ঋজুদা আস্তে আস্তে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। কিন্তু যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম তা থেকে প্রায় তিন-চারশো গজ বাঁ-দিক দিয়ে একেবারে গভীর জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে চলেছি আমরা। সামনেই একটা নদী আছে। জলের কুলকুল শব্দ আসছে। আর একটু এগোতেই খুব জোর হাপুস-হুপুস শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হল, হাতির দল বোধ হয় নদীতে নেমেছে। জলের কাছাকাছি এসে সামান্য আলোয় দেখলাম জলের মধ্যে এক-দেড় হাত লম্বা মতো কী কতগুলো লালচে লালচে, ফোলা ফোলা জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভাসছে আর মাঝে মাঝে তাদের গা থেকে ফোয়ারার মতো জল ছিটকে উঠছে।

এমন জিনিস আমাদের দেশে কখনো দেখিনি আমি। অবাক হয়ে জলের পাড়ে দাঁড়িয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলাম, ওগুলো কী জানোয়ার।

এমন সময় ঋজুদা আমার কাঁধে জোর চাপ দিয়ে বলল, 'এগিয়ে চল। দাঁড়াস না।'

আমি ফিসফিস করে একেবারে ঋজুদার কানের সঙ্গে কান লাগিয়ে বললাম, 'কী? কুমির?'

ঋজুদা বলল, 'হিপোপটেমাস। জলহস্তী! পালিয়ে চল।'

আমি তাড়াতাড়ি পা চালাতে চালাতে ভাবলাম, কত বড়ো জানোয়ার-অথচ সমস্ত শরীরটা জলে ডুবিয়ে শুধু নাকটা বের করে রয়েছে, যেমন কুমিরেরা করে। জলহস্তী উভচর জানোয়ার। তবে জল বেশি ভালোবাসে।

আমরা জঙ্গল আর রেড-ওট ঘাসের বনের সীমানাতে এসে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে পড়লাম। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, 'অন্ধকার হয়ে গেলে আমি একা গাড়ির কাছে যাব। চাবিটা গাড়িতেই লাগানো আছে দেখেছিলাম। তারপর হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে সোজা চলে যাব আস্তে আস্তে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভুষুন্ডা পথের আশেপাশে কোনো গাছে বা ঝোপঝাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করছে। ও জানে যে, আমরা গাড়ির লোভ ছাড়তে পারব না। সারা দিন ওকে খুঁজে না পেয়ে আমরা ঠিকই ফিরে যাব গাড়িতে। এবং হয়তো গাড়িতেই থাকব রাতে। অথবা গাড়ি নিয়েই চলে যাব একেবারে। যা পেট্রোল আছে আমাদের, তাতে গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির কাছে মাসাইদের বস্তিতেও চলে যেতে পারব। একবার যদি বড়ো রাস্তায় উঠতে পারি, তাহলে অন্য গাড়ির দেখা পাবই। আর পেলে, সেরোনারাতে খবর চলে যাবে। তখন কোনো অসুবিধা হবে না আর। যে কারণে আমি যাচ্ছি তোকে এখানে একা রেখে, সেই কারণটা হচ্ছে এই যে, ভুষুন্ডা গাড়ির কাছেও গিয়ে পৌঁছে থাকতে পারে দিনে দিনেই। ও হয়তো গাড়ির মধ্যেই অপেক্ষা করছে। কারণ ও জানে যে, ও যা করেছে এতদিন, এবং টেডিকে অকারণে খুন করেছে-সেই সবের শাস্তি ওকে পেতেই হবে যদি আমার অথবা তোর দু-জনের মধ্যে একজনও বেঁচে ফিরি। তাই ও আমাদের ছেড়ে কোথাও পালাতে পারবে না। আমরা বেঁচে ফেরা মানে ওর সর্বনাশ। ওদের পুরো দলেরই সর্বনাশ! ও বোধ হয় ভেবেছিল, টেডি ছাড়া, গাড়ি ছাড়া আমরা সিংহ আর সেৎসিদের হাতে সেরেঙ্গেটিতেই মরে যাব। আমরা যে পায়ে হেঁটে ওর পিছু নেব এমন কথা ও ভাবতেও পারেনি। ও এখন নানা কারণে মরিয়া হয়ে আছে। ও যদি গাড়িতেই গিয়ে থাকে, আমি নিজেই যেতে চাই। তোকে পাঠানো ঠিক হবে না।'

ঠিক এমন সময় আমাদের অনেক ডান দিকে তিন-চার জন লোকের উত্তেজিত গলা শুনলাম। তাদের মধ্যে কী নিয়ে যেন তর্ক লেগেছে। ওদের মধ্যেই কেউ বকা দেওয়াতে ওরা সব চুপ করে গেল।

ঋজুদা যেন কী ভাবল। তারপর বলল, 'নাঃ। ওরা অনেকে আছে। তুই-ই যা রুদ্র। খুব সাবধানে অনেকখানি বাঁ-দিকে গিয়ে আস্তে আস্তে গাড়িতে পৌঁছোবি। গাড়িতে যদি কাউকে দেখতে পাস তবে সঙ্গেসঙ্গে গুলি চালাবি। আর কাউকে দেখতে না পেলে গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা গাড়ি চালাবি। এক সেকেন্ডও দেরি করবি না। তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে যাবি। একেবারে মাইল দশেক গিয়ে গাড়ি থামিয়ে, গাড়ির কাচটাচ সব বন্ধ করে, খাওয়াদাওয়া করে গাড়িতেই বসে থাকবি। গাড়ির মুখটা এদিকে ঘুরিয়ে রাখিস। যদি এরা আমাকে ঘায়েল করতে পারে, তবেই তোর কথা ভাববে।'

আমি বললাম, 'ঋজুদা, খুব সাবধান। তোমাকে একা ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

ঋজুদা বলল, 'যে কম্যান্ডার তার কথা শুনতে হয়। গুড লাক। বি আ ব্রেভ ম্যান। উ্য আর নো মোর আ বয়।'

আমি আস্তে আস্তে ভূতুড়ে চাঁদের আলোতে ভূতুড়ে ছায়ার মতো জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে ঘাসবনে উঠে গেলাম। তারপর বাঁ-দিকে আরও কিছুদূর চলে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম।

সঙ্গেসঙ্গেই প্রায় মেঘে ঢেকে গেল আকাশ। এত মেঘ যে কোন দিগন্তে লুকিয়ে ছিল কে জানে? হয়তো খনভাম ভুষুন্ডা আর তার সঙ্গীদের মিছিমিছি এত জানোয়ার মারার কারণে দারুণ চটে গিয়ে চাঁদকে ঢেকে দিলেন মেঘে যাতে আমাকে ওরা দেখতে না পায়। কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেলে ঋজুদাও ওদের আর দেখতে পাবে না। মহা মুশকিলে পড়া গেল। ঠান্ডা ভিজে হাওয়া বইতে লাগল আর মেঘের মধ্যে গুড়গুড় করে বাজের ডাক শোনা যেতে লাগল। খনভাম কথা বলছেন। এখন খনভামের গলার স্বর, টেডি, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? আমরা তোমার মৃত্যুর বদলা নিতে এসেছি।

আহা! টেডি মানুষটা বড়ো সরল আর ধার্মিক ছিল।

কতক্ষণ পর আমি আন্দাজে গাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছোলাম তা নিজেই জানি না। অন্ধকারে যতটুকু দেখা যায় তাতে ভালো করে দেখে নিলাম দূর থেকে। কানখাড়া করে শুনলাম কোনো আওয়াজ পাই কি না। হায়নার দল এসে সেই মরা লোক দুটোকে খাচ্ছে। দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েই তারা হাঃ হাঃ হাঃ করে বুক-কাঁপানো হাসি হেসে উঠল।

কিন্তু নাঃ। হায়নার আওয়াজ ছাড়া কোনোই আওয়াজ নেই।

আফ্রিকার হায়নারা যে শুধু মরা মানুষ বা পশুর মাংসই খায়, তাই নয়; তারা দল বেঁধে বুনো কুকুরদের মতো শিকারও করে। যদিও শিকারের কায়দাটা অন্যরকম।

তাই আফ্রিকান হায়নারা সিংহের চেয়ে কম ভয়াবহ নয়। খুব সাবধানে বন্দুকের ট্রিগার-গার্ডে আঙুল ছুঁইয়ে আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম।

গাড়ির দরজাটা আস্তে করে খুলে, দরজাটা বন্ধ না করে লাগিয়ে রাখলাম। যাতে, শব্দ না হয় কোনো। তারপর অন্ধকারেই সুইচটার সঙ্গে চাবি আছে কি না হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দেখলাম।

একবার খুব জোরে বিদ্যুৎ চমকাল। ড্যাশবোর্ডের আলো জ্বালিয়ে তেল দেখলাম। আমার গলা শুকিয়ে গেল। তেল একেবারেই নেই। পিছনের জেরিক্যানে হয়তো আছে, যদি না ওরা তা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে; কিন্তু এখন তো তেল থাকলেও ঢালা যাবে না! ড্যাশবোর্ডের আলো জ্বালাবার পরই আমার খেয়াল হল যে, ওই আলোর সঙ্গে সাইড লাইটও নিশ্চয়ই জ্বলে উঠেছিল বাইরে। ওরা তাহলে জেনে গেছে যে, গাড়িতে কেউ ঢুকেছে।

আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাল। আমি মাথা নামিয়ে নিলাম। ঠিক এমনি সময়ে গাড়ির নীচ থেকেই যেন সেই দুপুরে শোনা শব্দটা আবার শুনলাম, হিসসসস। যেন গাড়ির টায়ার পাংচার হল। আমি চমকে উঠলাম। বন্দুকটা শক্ত করে ধরলাম। জানোয়ারটা যে কী তা ঋজুদা একবারও বলেনি। দৈত্যদানো নয় তো! গুগুনোগুম্বার বা ওগরিকাওয়া বিবিকাওয়া কোনো আশ্চর্য জানোয়ারের রূপ ধরে আসেনি তো এই দুর্যোগের রাতে?

এখন গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। জেরিক্যান থেকে তেল ঢাললেও শব্দ হবে অনেক। কী করব বুঝতে না পেরে আমি সামনের উইন্ডস্ক্রিনের নবটা ঘুরিয়ে যাতে বন্দুকের নল বের করা যায় ততটুকু তুলে, চুপ করে বসে রইলাম। এবারে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছিল। একবার খুব জোর বিদ্যুৎ চমকাল। আর আমি মাথা নামানোর আগেই দেখলাম, চার জন লোক গাড়ির বেশ কাছে চলে এসেছে। ওরা দৌড়ে আসছে। নিঃশব্দে।

বন্দুকের নলটা বাইরে বের করে বাঁ-হাতের তেলোর উপরে রাখলাম; যাতে শব্দ না হয়। ট্রিগার-গার্ডেও হাত ছুঁইয়ে রইলাম।

বিদ্যুতের আলোতে দেখেছিলাম যে, ওদের তিন জনের হাতে তির-ধনুক ও এক জনের হাতে বন্দুক আছে। ওদের দেখে হায়নাগুলো আবার ডেকে উঠল। কিন্তু ভোজ ছেড়ে নড়ল না।

ওরা আরও একটু কাছে আসুক, একেবারে সিওর রেঞ্জের মধ্যে, আমি ব্যারেল ঘুরিয়ে একসঙ্গে দুটো ব্যারেলই ফায়ার করব।

সাঁত করে হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম। একটা হায়না সঙ্গেসঙ্গে আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বুঝলাম, বিষের তির ছুড়ছে ওয়ান্ডারাবোরা। সঙ্গেসঙ্গে অন্যান্য হায়নাগুলো পড়ি-কি-মরি করে পালাল। লোকগুলো প্রায় এসে গেছে, ঠিক সেই সময় হিসসসস শব্দটা আবার শুনলাম গাড়ির তলা থেকে। তারপরই কিছু বোঝার আগেই লোকগুলো চোঁ-চা দৌড় লাগাল যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। আর গাড়ির তলা থেকে একটা কিছু যেন ব্যালিস্ট্রিক মিসাইলের মতো গতি আর শব্দে লোকগুলোর দিকে ধেয়ে গেল।

কী যে হল, কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি।

লোকগুলো ভয় পেয়ে শোরগোল করে উঠল। এবং অন্ধকারের মধ্যেও শব্দ শুনে মনে হল, যেন ওদের মধ্যে এক জন ধুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। অন্যরা কিন্তু দৌড়েই চলে যেতে লাগল। এদিকে আর এলই না। মিনিট দশেক পরেই গভীর বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে জঙ্গলের দিক থেকে একটা রাইফেলের আওয়াজ পেলাম। এবং তার একটু পরই একটা গাদা-বন্দুকের আওয়াজ। তারপরই সব চুপচাপ।

ঋজুদার কি কিছু হল?

আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা কাটল! ওদিক থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমনি সময় হঠাৎ গাড়ির পিছন দিক থেকে হাতির ডাক শুনতে পেলাম, প্যাঁ-এ-এ-এ করে।

আমি মুখ ফিরিয়ে পিছন ফিরে দেখি আমার পেছনে স্লেট-কালো ভেজা আকাশের পটভূমিতে একটা ঘন কালো চলমান পাহাড়শ্রেণি এগিয়ে আসছে। ওদিকে গুলির শব্দের পর ঋজুদারও কোনো খবর নেই। এদিকে আমার এই অবস্থা! গাড়িটা যদি দুমড়ে-মুচড়ে খেলনার মতো ভেঙে দিয়ে যায় তাতেও কিছু করার নেই। আমি ভয়ে আর পিছনে তাকালামই না। সামনে তাকিয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। এই শটগান দিয়ে হাতিদের সামনে কিছুই করার নেই। আমার সামনে গুলি খেয়ে মরা দু-দুটো মানুষ পড়ে আছে। তাদের ফুলে-ওঠা মৃতদেহ হায়নারা খেয়ে গেছে খুবলে খুবলে। আরেকটা মানুষ পড়ে গেছে আরও সামনে। সে কেন পড়ল, বেঁচে আছে কি না তাও জানি না। কী জিনিস যে গাড়ির তলা থেকে ছুটে গেল তাও অজানা। যে হিসসসস শব্দ করেছিল, সেই কি? জানোয়ারটা কী? তাদেরই মধ্যে পড়ে আছে বিষ-তির-খাওয়া একটা হায়না। আর পিছনে ছুটে আসছে হাতির দল।

আশ্চর্য! হাতিগুলো গাড়িটাকে মধ্যে রেখে দু-পাশ দিয়ে আমার সামনে এল। সমস্ত দিক গাঢ় অন্ধকার হয়ে গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। উইন্ডস্ক্রিনের সামনেই যে হাতিটা দাঁড়িয়ে ছিল সেটা একটা দাঁতাল। তার দাঁতটা এত বড়ো যে, গাড়ির

ছাদটা সেই দাঁতের মাঝামাঝি পড়ছিল। নীচে প্রায় মাটিতে লুটোচ্ছিল সেই দাঁত। আমার মনে হল, ওই হাতিটা যেকোনো চকমিলানো দোতলা বাড়ির সমান।

হাতির দল নানারকম শব্দ করছিল শুঁড় দিয়ে-ফোঁসফাঁস, ফোঁ-ফাঁ করে। শুঁড় হেলাচ্ছিল, দোলাচ্ছিল। গাড়ির বনেট আর উইন্ডস্ক্রিন আর ট্রেলারের উপরে শুঁড় বোলাচ্ছিল। মিনিট দশেক তারা গাড়িটাকে এরকম করতে থাকল। ভাগ্যিস নাইরোবি সর্দারের কলা আর পেঁপে শেষ হয়ে গেছিল, নইলে মুশকিল ছিল আমার। ভুষুন্ডা আর টেডির উগালির ভুট্টা ও আমাদের চাল-ডালও সব তাঁবুতেই পড়ে আছে। ওসব খাবার যদি ট্রেলারে থাকত, তবে খুবই বিপদ হত।

এর পরই একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হল। হাতিগুলো ওই লোকগুলোর মৃতদেহ দুটো শুঁড়ে তুলে নিয়ে লোফালুফি করতে লাগল। করতে করতে ক্রমশই সামনের জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। যত দূরে যেতে লাগল গাড়ি থেকে, ততই তাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। বৃষ্টির মধ্যে তাদের জলভেজা যুদ্ধজাহাজের মতো শরীরগুলো বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে উঠছিল।

ঘটনার পর ঘটনাতে স্তম্ভিত মন্ত্রমুগ্ধ আমি ভাবছিলাম, এসবই হয়তো খনভামের কীর্তি। নইলে কেন হাতিগুলো আমার কোনো ক্ষতি করল না। তার বদলে, যে বীভৎস দৃশ্য আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না, তারা সেই দৃশ্যও আমার চোখের সামনে থেকে শুঁড়ে শুঁড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল কেন?

গাড়ির মধ্যে বসে বসে ঘুম পেয়ে গেল। এত বেশি উত্তেজিত ও ক্লান্ত ছিলাম যে, খিদের কথা মনেও এল না। ওয়াটার-বটল থেকে একটু জল খেলাম, তারপর নিজের জীবনের, ঋজুদার জীবনের সব দায়িত্ব খনভামের উপর চাপিয়ে দিয়ে পা-ছড়িয়ে, বন্দুকটার নল বাইরে করে বসে রইলাম, টুপিটা চেপে মাথায় বসিয়ে। গাড়ির ভিতরটাই এত ঠান্ডা হয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে, ফ্রিজের মধ্যে বসে আছি। বাইরে না-জানি আজ কী ঠান্ডা! ঋজুদা এখন কী করছে, বেঁচে আছে কি না কে জানে? ঋজুদা যদি কাল সকাল বেলাতে ফিরে না আসে, তাহলে আমি কী করব, কী কী করা উচিত-ভাবতে পারছিলাম না। কিন্তু ভাবতে হচ্ছিল।

এবারে পরপর যেসব ঘটনা ঘটল, চোখের সামনে যত মৃত্যু ঘটতে দেখলাম, এবং আশ্চর্য-নিজেও ঘটালাম, এরপর ঋজুদা অথবা আমি মরে গেলেও অবাক হবার কিছু নেই।

দেখতে দেখতে চোখের সামনে ভোর হয়ে এল। বনে-জঙ্গলে, নদীতে-পাহাড়ে সূর্য-আসা আর সূর্য-যাওয়া প্রতিদিনের যে কত বড়ো দুটো ঘটনা তা যাঁদের চোখ-কান আছে তাঁরাই জানেন। কত আশ্চর্য রঙের হোরিখেলা, কত রাগরাগিণীর আলাপ,

কত শিল্পীর তুলির আঁচড়, কত শান্ত, নরম, আলতো গন্ধ-সব মিলিয়ে মিশিয়ে যিনি সব গায়কের গায়ক, সব শিল্পীর শিল্পী, সব সুগন্ধের গন্ধরাজ, তিনিই এই পৃথিবী-ঘরের বাতি নেভান, বাতি জ্বালান। ঘরের বাইরে এলেই, দেশে এবং এই বিদেশেও তাঁকেই দেখি, দেখতে পাই। ঋজুদা যেমন আমাকে শিখিয়েছে, তেমনই আমি আকাশ বাতাস জল স্থল পাখি হরিণ মানুষ ফড়িং-এই সবের মধ্যেই তাঁকে দেখি।

ভোর হয়েছে কিন্তু সূর্য এখনও মেঘে ঢাকা। অন্ধকার কেটেছে প্রায় পনেরো মিনিট। ঋজুদা তবু এল না। এবার যা করার নিজেকেই বুদ্ধি করে করতে হবে। কম্যান্ডারের এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল।

গাড়ির দরজা খুলে চাবিটা পকেটে নিলাম। এই চাবি হাতছাড়া করাতেই ভুষুন্ডা এমন একটা লং-রোপ পেয়ে গেছিল। লোডেড বন্দুক কাঁধে আবার জঙ্গলের দিকে চলতে লাগলাম। কাল যেখান দিয়ে বেরিয়েছিলাম সেই দিকে। সাবধানে জঙ্গলের কিনারা, কিনারার আশেপাশের গাছ ইত্যাদি দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল কতগুলো শকুন উড়ছে বসছে, কামড়াকামড়ি করছে রেড-ওট ঘাসের বন যেখানে ঢালু হয়ে জঙ্গলে নেমেছে সেইখানে।

আমার বুকটা ধক করে উঠল। কী দেখব কে জানে?

আর একটু এগোতেই দেখি, কালকে হাতিরা সেই মৃতদেহগুলিকে এখানে এনে ফেলেছে আর শকুনরা ভোজে লেগেছে, হায়নাদের পর।

তাড়াতাড়ি সরে এলাম। সরে আসার সময় লক্ষ করলাম যে, কালকে যে কোপিটা দেখেছিলাম তার উপরেও দুটো শকুন উড়ছে চক্রাকারে। ওইদিকে চেয়ে আমার মন যেন কেমন করে উঠল। এমনই করে। যাঁরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরেন, তাঁরা জানেন একেই বলে সিক্সথ সেন্স। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই; ব্যাখ্যা হয় না।

আমি আস্তে আস্তে কোপির দিকেই চলতে লাগলাম। সামনের বনে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। মনে হচ্ছে, মৃত্যু হাত বুলিয়ে গেছে এর উপর। কতগুলো বেবুন চিৎকার করছে আর একদল ব্যাবলার ও থ্র্যাশার সরগরম করে রেখেছে জঙ্গল, বৃষ্টি ধরে যাওয়ার আনন্দে।

কোপির নীচে পৌঁছেই আমি চমকে উঠলাম। চাপ চাপ রক্ত পড়ে জমে রয়েছে পাথরের উপর। তারপর রক্তের ছড়া চলে গেছে ভিতরে। বৃষ্টিতে যা ধুয়ে গেছে তা গেছে খোলা জায়গায়। যা ধোয়নি তা জমে আছে।

রক্তের দাগ দেখে উপরে উঠতে লাগলাম। একটু গিয়েই, যে সার্ডিনের টিন খুলে আমরা কাল দুপুরে গাছের উপর বসে খেয়েছিলাম, সেই খালি টিনটা উলটো পড়ে আছে দেখলাম। শকুনগুলো ঘুরে ঘুরে উড়ছিল উপরে।

আমি বন্দুকটা সামনে ধরে, একটা বড়ো পাথরের আড়ালে শরীরটা লুকিয়ে ডাকলাম, 'ঋজুদা! ঋজুদা!'

কোনো উত্তর পেলাম না। কিন্তু ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। ঋজুদা কি...? নাকি ভুষুন্ডাদের ডেরায় এসে পড়েছি আমি?

এমন সময় কারা যেন নেমে আসছে উপর থেকে শুনলাম। জুতো পায়েও নয়, খালি পায়েও নয়; যেন নূপুর পায়ে কারা নেমে আসছে। আরও ভয় পেয়ে গেলাম আমি। এ কী ব্যাপার। বন্দুকটা ওদের আসার পথে ধরে আমি তৈরি হয়ে রইলাম। ঠিক সেই সময় পাঁচটা আফ্রিকান স্ট্রাইপড জ্যাকল একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে নেমে এল উপর থেকে। ওদের পায়ের নখের শব্দ পাথরের উপর ওইরকম শোনাচ্ছিল।

আমাকে দেখতে পেয়েই দুটো শেয়াল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এল। পাছে গুলি করলে শব্দ হয়, তাই ট্রিগার-গার্ডে হাত রেখে ব্যারেল দিয়ে গুঁতো দিলাম ওদের। তাতেও কাজ না হলে গুলি করতে বাধ্য হতাম।

গ-র-র-গররর করতে করতে ওরা নেমে গিয়ে পাথরের আড়ালে যেখানে রক্ত জমে ছিল, সেইখানে হুড়োমুড়ি করে চাটতে লাগল।

আমি আরও এক ধাপ উঠে গিয়ে ডাকলাম, 'ঋজুদা! তুমি হলে সাড়া দাও। ঋজুদা!'

এমন সময় মনে হল কেউ বলল, 'আমি। আয়।'

এত ক্ষীণ যে, ভালো করে শুনতে পেলাম না। মনে হল ভুল শুনলাম না তো!

আবারও যেন শুনলাম, 'আয়-'

একপাশে ঘেঁষে, বন্দুক রেডি করেই, পাথরটা টপকে বাঁক নিলাম। নিয়েই...

ঋজুদার বাঁ-পায়ে ঊরুর কাছে গুলি লেগেছে। গাদা বন্দুকের গুলি। বড়ো সিসার একটা তাল। পায়ের হাড় ভেঙে গেছে কি না কে জানে! রক্তে সারা জায়গাটা

থকথক করছে। ঋজুদার ঠোঁট ফ্যাকাশে নীলচে। আমাকে দেখে আমার দিকে হাত তুলল। আমি হাতটা হাতে নিয়ে খুব করে ঘষে দিলাম। তারপর বললাম, 'ভুষুন্ডা?'

ঋজুদা ডান হাতটা তুলে হাতের পাতাটা নাড়ল।

ফার্স্ট-এইড বাক্সটা হ্যাভারস্যাক থেকে বের করে ডেটল আর মার্কুরিয়োক্রোমের শিশি আর তুলো বের করতে করতে বললাম, 'ডেড?'

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, 'পালিয়ে গেছে। আমি মিস করেছিলাম। এত অন্ধকার হয়ে গেল! মিস করলাম।'

'ভুষুন্ডা কোথায়?' আমি শুধোলাম।

ঋজুদা বলল, 'বোধ হয় চলে গেছে। চলে না গেলে ও আমাকে শেষ করে যেত। ওর গুলিতে আমি যে পড়ে গেছি, তা ও দেখেছে।'

আমি যখন ঋজুদার ট্রাউজারটা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে ঋজুদাকে ড্রেস করছিলাম, তখন ঋজুদা আমার এল-জি ভরা বন্দুকটা দু-হাতে ধরে পাথরের পথের দিকে চোখ রাখছিল।

আমি বললাম, 'শেয়ালরা তোমাকে কিছু করেনি তো!'

'নাঃ। তুই না এলে করত হয়তো। শকুনরাও করত। ওরা ঠিক টের পায়।'

পা-টা একেবারে থেঁতলে গেছে গুলিতে। কত যে টিসু আর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে তা ভগবানই জানেন। আধঘণ্টা লাগল ঋজুদাকে ড্রেস করতে। তারপর দুটো কোডোপাইরিন খাইয়ে বললাম, 'ঋজুদা, তুমি এখানে থাকো। আমি গাড়িতে জেরিক্যান থেকে তেল ভরে, গাড়িটা কোপির যত কাছে আনতে পারি তত কাছে এনে তোমাকে তুলে নেব।'

ঋজুদা বলল, 'ভুষুন্ডা যদি চলে না গিয়ে থাকে তবে তো গাড়ির আওয়াজ শুনেই এসে তোকে মারবে।'

আমি বললাম, 'এখন তো আর রাত নয়, দিন। আমি তোমার থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলটা নিয়ে যাচ্ছি। এখানে শর্ট রেঞ্জে বন্দুক অনেক বেশি এফেকটিভ। দু-ব্যারেলে এল-জি পোরা থাকল। তুমি এটা বুকের উপর নিয়ে শুয়ে থাকো।'

ঋজুদার হ্যাভারস্যাকটাকে ঠিকঠাক করে বালিশের মতো করে দিলাম। তাতে একটু আরাম হল। তারপর রাইফেলের ম্যাগাজিন ভরতি করে চেম্বারেও একটা গুলি ঠেলে দিয়ে সেফটি ক্যাচে হাত রেখে আমি নেমে গেলাম।

নিজের অজান্তে আমার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল। চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল। না-ঘুমোনোর জন্যে নয়, প্রতিহিংসায়। তারপরই চোখ দুটো ভিজে এল আমার। ঋজুদার সামনে পারিনি। ঋজুদা কষ্ট পেত।

এখন পরিষ্কার দিনের আলো। আজ সকালে ভুষুন্ডা যদি পাঁচশো গজের মধ্যেও তার চেহারা একবার আমাকে দেখায় তাহলে অস্ট্রিয়ায় তৈরি এই ম্যানলিকার শুনার রাইফেলের সফট-নোজড গুলি তার বুকের পাঁজর চুরমার করে দেবে। ঋজুদার কাছে রাইফেল চালানো কতটুকু শিখেছি তার পরীক্ষা হবে আজ।

কোপি থেকে নামতে নামতে দাঁতে দাঁত চেপে আমি বললাম, 'ভুষুন্ডা! তোমার আজ শেষ দিন।'

ফাঁকায় বেরিয়ে আমি হরিণের মতো দৌড়ে যেতে লাগলাম গাড়ির দিকে। হরিণ যেমন কিছুটা দৌড়ে যায়, তারপর থেমে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, আমিও সেরকম করছিলাম। অবশ্য শিকারি ঠিক ওই থমকে দাঁড়ানোর মুহূর্তেই হরিণকে গুলি করে। ভাবছিলাম, ভুষুন্ডা যদি এখনও থেকে থাকে তাহলে গুলি করে আমাকে আবার হরিণ না বানিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন বন্দুকের ও তিরের পাল্লার বাইরে চলে গেলাম, তখন হেঁটে যেতে লাগলাম পেছনে তাকাতে তাকাতে।

রাইফেলটাকে গাড়ির বনেটের উপর শুইয়ে রেখে পিছনে গিয়ে দুটো জেরিক্যান থেকে তেল ঢাললাম ট্যাঙ্কে। মাঝে মাঝেই ওইদিকে দেখছিলাম। নাঃ। কোনো লোকজনই নেই।

রাইফেলটা ভিতরে তুলে নিয়ে, সুইচ টিপতেই গাড়ি কথা বলল। বড়ো মিষ্টি লাগল সেই কথা! তারপর গিয়ারে ফেলে এগিয়ে চললাম কোপিটার দিকে। কাছে গিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখলাম। ট্রেলার থাকলে গাড়ি ব্যাক করতে ভারি অসুবিধা হয়।

ভালো করে চারপাশে দেখে নিয়ে রাইফেল হাতে দৌড়ে উঠে গেলাম উপরে। গিয়ে দেখি, ঋজুদা নিজেই ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল মুখ।

আমি বললাম, 'কী করছ? চলো, আমার কাঁধের নীচে তোমার পিঠটা লাগাও।' বলে ঋজুদাকে কাঁধের ওপর নিয়ে খুব সাবধানে নামতে লাগলাম। ওই অবস্থাতেও ঋজুদা শটগানটা দু-হাতে ধরে ব্যারেলটা সামনে করে রাখল।

কোপির নীচে এসে দেখলাম, নাঃ, কেউ কোথাও নেই।

ঋজুদাকে গাড়ি অবধি নিয়ে বাঁ-দিকের দরজা খুললাম। কিন্তু ঋজুদা বলল, 'আমি তো বসতে পারব না ওইভাবে!'

'তবে? কোথায় বসলে সুবিধে হবে তোমার?'

ঋজুদা বলল, 'আমি তো এখন একটা বোঝা। যার নিজের হাত-পায়ে জোর নেই, সে বোঝা ছাড়া কী? আমাকে ট্রেলারের উপর উঠিয়ে দে। ট্রেলারে শুয়ে গেলেই যেতে পারব।'

আমি বললাম, 'সে কী? ধুলো লাগবে, ঝাঁকুনি লাগবে। ঝাঁকুনিতে আরও রক্ত বেরোবে।'

ঋজুদা হাসবার চেষ্টা করল। বলল, 'উপায় কী বল? নইলে তো আমাকে এখানে রেখে তোর একাই চলে যেতে হয়। এই ভালো, রোদ পোয়াতে পোয়াতে, ঘুমোতে ঘুমোতে দিব্যি যাব।'

আমি পিছনের সিট খুলে তার গদি দুটো এনে ট্রেলারের মালপত্রের উপরে পেতে দিলাম। তারপর ঋজুদাকে যতখানি আরাম দেওয়া যায় দিয়ে গুলিভরা শটগান, জলের বোতল, ব্রান্ডির বোতল, হ্যাভারস্যাক সব হাতের কাছে রেখে, রাইফেলটা নিয়ে আমি ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলাম।

গাড়ি স্টার্ট করে, একটু পরই টপ-গিয়ারে ফেলে দিলাম, যাতে তেল কম পোড়ে। কিন্তু ঋজুদার যাতে কম ঝাঁকুনি লাগে সেই জন্যে খুব সাবধানে আস্তেই চালাতে লাগলাম।

সামনে যতদূর চোখ যায় ঘাসবন। এখন মেঘ কেটে গেছে। পনেরো ডিগ্রি ইস্ট এবং ডিউ সাউথ-এর বেয়ারিং নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি। মাঝে মাঝে কম্পাস ও ম্যাপ দেখছি।

জঙ্গলে এসে ল্যান্ড-রোভার বা জিপে বা গাড়িতে সামনের সিটে আমি একা এই প্রথম। হয় ঋজুদা চালায়, আমি পাশে বসি, নয় আমি চালাই, ঋজুদা পাশে বসে। আজ ঋজুদা ট্রেলারে শুয়ে আছে। খুব তাড়াতাড়ি কোনো ভালো হাসপাতালে ঋজুদাকে দেখাতে না পারলে গ্যাংগ্রিন সেট করে যাবে। পা-টা হয়তো কেটে বাদই দিতে হবে। কে জানে? ঋজুদা, লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, ভাবাই যায় না। ঋজুদাকে বাঁচানো যাবে না আর?

আমি আর ভাবতে পারছিলাম না!

মাঝে একবার গাড়ি থামিয়ে ঋজুদার পা আবার ড্রেসিং করে দিলাম। ট্রেলারের ঝাঁকুনিতে বেশ রক্ত বের হচ্ছে। মুখে কিছু বলছে না ঋজুদা, কিন্তু মুখের চেহারা দেখেই বুঝছি যে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। গায়ে হু-হু করছে জ্বর। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। ট্রেলারের উপর সবুজ কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে তবুও আমার সঙ্গে দু-একটা রসিকতা করতে ছাড়ছে না।

ম্যাপটা একবার দেখিয়ে নিলাম ভালো করে। যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে তবে কে আমাকে গাইড করবে!

ঋজুদা বলল, 'ঠিকই যাচ্ছিস। আমরা তো আর তাঁবুগুলো কালেক্ট করতে আগের জায়গায় যাব না-সোজাই চলে যাব। যাতে গোরোংগোরো-সেরোনারার মেইন রাস্তাতে পড়তে পারি।'

তারপর বলল, 'তাঁবুগুলো তুলতে মোট দশ মাইল মতো ঘোরা হত, কিন্তু ওখানে আমার অবস্থার কারণ ছাড়াও অন্য কারণেও যাওয়া ঠিক নয়। ওয়ান্ডারাবোরা যে আবার ওখানে ফিরে এসে ম্যাসাকার শুরু করেনি তা আমরা জানছি কী করে?'

দুপুর বেলা খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম ও ঋজুদার পরিচর্যার জন্য থামলাম আর একবার। ঋজুদার গায়ে জ্বর, তবু আমি চিজ দিয়ে চারটে বিস্কুট, মালটি-ভিটামিন ট্যাবলেট আর ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলাম ওঁকে।

ট্রেলারের তলায় হেলান দিয়ে উদাস চোখে দূরে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

হঠাৎ ঋজুদা গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'কী ভাবছিস? আমি মরে যাব? দূর বোকা! আমি যখন মরব, তখন আমার সুন্দর দেশেই মরব। বিদেশে মরতে যাব কোন দুঃখে। তা ছাড়া, এখন মরলে তো চলবে না আমার রুদ্র। ভুষুন্ডার অ্যাকাউন্ট সেটল করতে আমাকে আবার আফ্রিকাতে আসতেই হবে। হয়তো এখানে নয়, অন্য কোনোখানে। সেবার একেবারে একা একা শুধু ভুষুন্ডার সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই আসতে হবে। আফ্রিকার যে প্রান্তেই সে থাক না কেন, খুঁজে বের করতেই হবে। তা যদি নাই পারি, তাহলে হেরে গিয়ে হেরে থেকে বেঁচে লাভ কী? সে বাঁচা কি বাঁচা?'

আমি বললাম, 'সেবার আমাকে সঙ্গে আনবে তো?'

ঋজুদা হাসল। বলল, 'পরের কথা পরে। এখন ভালো করে খেয়ে নিয়ে গাড়িটা স্টার্ট কর। পা-টা যদি কেটে বাদই দিয়ে দেয়, তাহলে তো তোর উপর নির্ভর করতেই হবে। আর সেই জন্যেই কি মতলব করছিস যে, সাধের পা-টা আমার বাদই যাক?'

আমি ঋজুদার পাইপটা ভালো করে পরিষ্কার করে ভরে লাইটারটা হাতের কাছে দিয়ে সামনে যেতে যেতে বললাম, 'আচ্ছা ঋজুদা, আমরা যখন কাল দুপুরে ওই দোলামতো জায়গাটাতে বসেছিলাম তখন হিসসসস করে খুব জোরে কী একটা জানোয়ার ডেকেছিল? তুমি আমাকে গুলি বদলাতে বলেছিলে, মনে আছে?

ঋজুদা পাইপে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, 'আছে। ওই আওয়াজের মতো ভয়ের জিনিস আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে খুব কমই আছে। একধরনের সাপ। প্রকাণ্ড বড়ো, আর বিষধর। নাম গাব্বুন ভাইপার। আমাদের দেশের শঙ্খচূড়ের চেয়েও মারাত্মক। যদি কাউকে কামড়াবে বলে ঠিক করে, তাহলে দু-মাইল যেতেও পিছপা হয় না। অনেকখানি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ছোবল মারে।'

আমার গা শিরশির করছিল, যখন মনে পড়েছিল যে, ওই সাপকেই গাড়ির নীচে নিয়ে আমি কাল রাতে অতক্ষণ ছিলাম। ঋজুদাকে বললাম, কী করে সাপটা আমাকে বাঁচিয়েছিল আক্রমণকারীদের হাত থেকে।

ঋজুদা সব শুনে খুবই অবাক হল।

আমি স্টিয়ারিংয়ে গিয়ে বসলাম।

এখন দু-পাশে আবার অনেক জানোয়ার দেখা যাচ্ছে। শয়ে শয়ে থমসনস ও গ্রান্টস গ্যাজেল, টোপি, ওয়াইল্ডবিস্ট, ওয়ার্টহগস, জেব্রা। জিরাফ আর উটপাখি কম।

খুব বড়ো একদল মোষের সঙ্গেও দেখা হল। আফ্রিকাতে বলে, 'ওয়াটার বাফেলো'। জলে-কাদায় ওয়ালোয়িং করে ওরা। সব দেশের মোষই করে। বিরাট দেখতে মোষগুলো-গায়ের রং বাদামি-কালো। মোটা মোটা ঘন লোম। তবে শিংগুলো আমাদের দেশের জংলি মোষের মতো অত ছড়ানো নয়।

মাঝে মাঝে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখছি। ঋজুদা ঠিক আছে কি না। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাঁ-হাতটা চোখের উপরে রেখে চোখ আড়াল করে ডান হাতে বন্দুকটার স্মল অব দ্যা বাট ধরে শুয়ে আছে ঋজুদা। খাওয়ার সময় জ্বরটা বেশ বেশি দেখেছিলাম। যে চরিত্রের লোক ঋজুদা, যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ নিজে মুখে একবারও বলবে না যে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। জ্বর আরও বেড়েছে।

বড়ো অসহায় লাগছে আমার। আজ সন্ধ্যে অবধি গাড়ি চালানোর পর কাল কতখানি তেল অবশিষ্ট থাকবে জানি না। আর জেরিক্যান নেই। কী হল তা ভুষুন্ডাই বলতে পারে। যে বেয়ারিং-এ যাচ্ছি তাতে গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরি আর সেরোনারার মধ্যের পথটার কাছাকাছি আমাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা। এখন কী হবে, কে জানে? ঋজুদাকে তাড়াতাড়ি কোনো হাসপাতালে না নিয়ে যেতে পারলে বাঁচানোই যাবে না। আর কিছুক্ষণ পর থেকেই গ্যাংগ্রিন সেট করবে।

স্টিয়ারিং ধরে সোজা বসে আছি। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে ঘুমে। কাল রাতে ঘুম হয়নি-সামান্য তন্দ্রা এসেছিল শুধু শেষরাতে। মারাত্মক ভুল। সেই তন্দ্রাকেই চিরঘুম করে দিতে পারত ভুষুন্ডা। কী পাজি লোকটা। কে ভেবেছিল ও অমন চরিত্রের মানুষ? কেবলই ভুষুন্ডার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আমার। আর টেডি? হ্যাঁ, টেডির মুখটাও। ওর মুখের উপর এখন অনেক মাটি!

ঘণ্টা দুয়েক চলার পর এক বার দাঁড়িয়ে পড়ে ঋজুদাকে দেখে নিলাম। চুপ করে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। কাছে গিয়ে বললাম, 'কেমন আছ ঋজুদা?'

ঋজুদা চোখ খুলে হাসল একটু। বলল, 'ফাইন।'

তারপরই বলল, 'চল রুদ্র। জোরে চল। থামলি কেন?'

আমি দুটো ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিলাম ঋজুদাকে। তারপর আবার স্টিয়ারিংয়ে বসলাম। ভয়ে আমার তলপেট গুড়গুড় করতে লাগল। ঋজুদা একেবারেই ভালো নেই। নইলে আমাকে জোরে চলার কথা বলত না। পা-টার দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ চলার পর ঠক করে একটা আওয়াজ শুনলাম উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে। তারপরই ভিতরে। দুটো সেৎসি মাছি ঢুকে পড়েছে। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে আমার টুপি দিয়ে ও দুটোকে মারতে যাব, ঠিক এমন সময় পিছন থেকে ঋজুদার গলা শুনলাম যেন। যেন আমাকে ডাকছে!

তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দৌড়ে যেতেই ঋজুদা বলল, 'রুদ্র, রুদ্র, তাড়াতাড়ি আয়-' বলেই উঠে বসার চেষ্টা করে পড়ে গেল।

আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। জানোয়ারের সঙ্গে বন্দুক-রাইফেল নিয়ে মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু এদের সঙ্গে আমি কী করে লড়ব? রক্তপিশাচ মাছিগুলো থিকথিক করছে ঋজুদার পায়ে। আর শুঁড় ঢুকিয়ে রক্ত টানছে।

আমাকে একটাই কামড়েছিল ওই মাছি। যখন হুলটা ঢোকায়, তখন সাংঘাতিক লাগে, তারপর মনে হয়, কেউ সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে রক্ত টানছে। কামড়াবার অনেকক্ষণ পর অবধি জায়গাটা জ্বালা করতে থাকে অসম্ভব। একটা মাছি! আর এখানে অগুনতি।

আমি পাগলের মতো করতে লাগলাম। হাত দিয়ে, টুপি দিয়ে যা পারি, তাই দিয়ে। কিন্তু ওরা ঠিকই বলেছিল, সেৎসিদের দশটা জীবন। আমাকেও কামড়াতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে আমিও অজ্ঞান হয়ে যাব। আর ঋজুদার যে কী হচ্ছে তা সে নিজেও হয়তো জানে না।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। গাড়ির পিছনের সিটে টেডির বিরাট মাপের ডিসপোজালের ওভারকোটটা পড়েছিল। দৌড়ে গিয়ে ওটা নিয়ে এলাম। তারপর কোমরের বেল্ট থেকে ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলে, টুপি দিয়ে হাওয়া করতে করতে ঋজুদাকে ওভারকোটটা দিয়ে ঢেকে দিলাম পুরো। ঢাকবার সময় লক্ষ করলাম, ঋজুদার চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

বললাম, 'ঋজুদা, কেমন আছ?'

ঋজুদা প্রথমে উত্তর দিল না। তারপর অনেকক্ষণ পর, যেন অনেকদূর থেকে বলল, 'ফাইন।'

তাড়াতাড়ি দু-হাত এলোপাতাড়ি ছুড়তে ছুড়তে আমি স্টিয়ারিংয়ে বসে যত জোরে গাড়ি যেতে পারে তত জোরে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম। ভয় ছিল, ঝাঁকুনিতে ঋজুদা ট্রেলার থেকে পড়ে না যায়। কী ভাবে যে গাড়ি চালাচ্ছি তা আমিই জানি। এত মাছি ঢুকে গেছে! কিন্তু ওই মাছির এলাকা না পেরোলে আমরা এদের হাতেই মারা পড়ব।

প্রায় আধ ঘণ্টা জোরে গাড়ি চালিয়ে গিয়ে থামলাম। প্রথমে গাড়ির মধ্যে যে ক-টা মাছি ঢুকে আমাকে আক্রমণ করেছিল তাদের মারলাম। শুধু মারলামই না। এদের

কামড়ে এতই যন্ত্রণা হয় যে, সত্যিই এদের মেরে ধড় থেকে মুণ্ডুটা টেনে আলাদা না করলে, মনে হয় প্রতিহিংসা ঠিকমতো নেওয়া হল না। এখন বুঝতে পারছি, কেন এই হাজার হাজার মাইল ঘাসবন এমন জনমানবশূন্য। এখানকার জংলি জানোয়ারেরা আদিমকাল থেকে এখানে থাকতে থাকতে এই মাছিদের কামড়ে ইমিউন হয়ে গেছে। প্রকৃতিই ওদের এমন করে দিয়েছে, নইলে এখানে ওরা থাকত কী করে?

দরজা খুলে নেমে আবার ঋজুদার কাছে গেলাম। বোধ হয় জ্ঞান নেই। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বার বার ডাকলাম। অনেকক্ষণ পর যেন আমার নাম ধরে সাড়া দিল একবার।

আমি কী করব? এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এত জ্বরে ঋজুদা বাইরের ঠান্ডায় কী করে শোবে?

সেদিনকার মতো ওইখানেই থাকব ঠিক করলাম। এখন যা-কিছু করার, সিদ্ধান্ত নেবার, সব আমাকেই করতে হবে।

ঋজুদার গা থেকে টেডির ওভারকোট সরিয়ে দিলাম। চারটে মাছি তখনও তার নীচে ছিল। রক্ত খেয়ে ফুলে বোলতার মতো হয়ে গেছে প্রায়। সেই চারটেকে মারা কঠিন হল না। নড়বার ক্ষমতা ছিল না ওদের। আমি জ্যান্ত অবস্থাতেই ওদের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করলাম।

তারপর হাত ধুয়ে এসে ঋজুদার জন্যে খাবার বানাতে বসলাম। শক্ত কিছু খাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। এদিকে গরম কিছু দেব তারও উপায় নেই। না আছে সঙ্গে স্টোভ, না কোনো জ্বালানি। ট্রেলারের কোণ থেকে একটা প্যাকিং বাক্স বের করে সেটাকে ভেঙে ঘাস পরিষ্কার করে একটু আগুন করলাম। কফির জল চাপিয়ে, তার মধ্যে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট দিয়ে দিলাম গোটা ছয়েক। সেগুলো গলে গেলে তার মধ্যে এক চামচ কফি দিলাম। দুধ ছিল না। আমার হ্যাভারস্যাকে যে ওষুধ-ব্র্যান্ডি ছিল তার চার চামচ ঢেলে দিলাম সেই মগে। তারপর ভালো করে নেড়ে ঋজুদার কাছে গিয়ে তার মাথাটা কোলে নিলাম। ঋজুদা অনেক কষ্টে চোখ খুলল। বললাম, 'মাছিরা আর নেই। এবারে খেয়ে নাও।'

ঋজুদা হাত নেড়ে অনিচ্ছা জানাল।

আমি ছাড়লাম না। বললাম, 'খেতেই হবে।' জোর করে মগটাকে ঠোঁটের কাছে ধরলাম।

একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে ঋজুদা পুরোটা চোখ খুলল। খাওয়া শেষ হলে আমি তুলে বসালাম ঋজুদাকে। বললাম, 'পাইপ খাবে না? তুমি কতক্ষণ পাইপ

খাওনি, ওই জন্যেই তো এত খারাপ লাগছে তোমার। যার যা অভ্যেস। আমি ভরে দেব?'

ঋজুদা একটু হাসল। তারপর মাথা নাড়ল।

হ্যাভারস্যাকের পকেট থেকে পাইপটা বের করে নতুন তামাক ভরে দিলাম।

কয়েক টান দিয়েই ঋজুদাকে অনেক স্বাভাবিক দেখাল। হ্যাভারস্যাকে হেলান দিয়ে বসে বলল, 'পা-টা একটু তুলে দে তো রুদ্র।'

তুলে দিলাম। ঋজুদা আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'জানিস, আমার বন্ধুরা বিয়ে করিনি বলে কত ভয় দেখিয়েছে। বলেছে-'

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল ঋজুদার। তবু টেনে টেনে বলল, 'বলেছে যে, আমাকে দেখার কেউ নেই। থাকবে না।'

তারপর একটু পর বলল, 'ওরা ভুল। একেবারে ভুল।'

দম নিয়ে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ঋজুদা বলল, 'রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, আত্মীয়তা দু-রকমের হয়। রক্তসূত্রের আর ব্যাবহারিক সূত্রের। প্রথম আত্মীয়তার বাঁধনে কোনো বাহাদুরি নেই, চমক নেই। কেউ রাজার ছেলে, কেউ ভিখিরির মেয়ে। কিন্তু তোর-আমার আত্মীয়তার গর্ব আছে। তুই আমার জঙ্গলের বন্ধু। তুই আমার সেভিয়ার।'

একটু দম নিয়ে বলল, 'বড়ো ভালো ছেলে রে তুই।' বলে, আমার চুল এলোমেলো করে দিল বাঁ-হাত দিয়ে।

আমার চোখ জলে ভরে এল। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি।

তারপর আমিও খেয়ে নিলাম ওই কফি আর বিস্কুট। ঋজুদা কথা বলছিল দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল। খাওয়ার পর টেডির বড়ো ওভারকোটটার কোনায় ট্রেলারের ত্রিপলের দড়ি বেঁধে তাঁবুর মতো ঋজুদার মাথার উপরে টাঙিয়ে দিলাম, যাতে ঠান্ডা না লাগে রাতে।

পশ্চিমাকাশে শেষ সূর্যের গোলাপি মাখামাখি হয়ে ছিল। দুটো ম্যারাবুও সারস উড়ে যাচ্ছিল ডানা মেলে। হলুদ মাথা বড়ো বড়ো কতগুলো ফেজেন্ট দৌড়ে যাচ্ছিল সিঙ্গল ফর্মেশানে দূর দিয়ে। আমাদের ডান দিক থেকে সিংহের ডাক ভেসে এল কয়েকবার।

আজও রাত জাগতে হবে। ঋজুদার পাশে ট্রেলারের উপর মাঝে মাঝে শুয়ে নেব। অন্য সময় গাড়ির চারপাশে পায়চারি করব। ঋজুদার পায়ের এই রক্তের গন্ধ হয়তো অনেক জানোয়ারকে ডেকে আনবে। সকাল বেলার শেয়ালগুলোর মতন। বোধ হয় শুক্লা অষ্টমী কি নবমী, চাঁদটা ভালোই উঠবে সন্ধ্যের পরে।

সূর্য ডুবে যেতেই রাইফেল ও বন্দুকে গুলি ভরে হাতের কাছে ঠিকঠাক করে রেখে ঋজুদাকে কম্বল মুড়ে ভালো করে শুইয়ে দিলাম আরও দুটো ঘুমের বড়ি খাইয়ে। আর কিছু দেবার মতো নেই। তার আগে পা-টা আবার ডেটল দিয়ে ধুইয়ে, ওষুধ লাগিয়ে দিলাম।

ঋজুদার এখন যা অবস্থা তাতে প্রয়োজন হলেও বন্দুক-রাইফেল কিছুই ছুড়তে পারবে না। তা ছাড়া একটু আগেই বন্দুক লোড করার সময় প্রথম জানতে পারলাম যে, গুলিও ফুরিয়ে এসেছে। অনেক গুলি তাঁবু থেকে ভুষুন্ডা এবং তার ওয়ান্ডারাবো বন্ধুরা নিয়ে গেছিল। তা ছাড়া আমরা তো আর শিকারে আসিনি। তাই খুব বেশি গুলি এবারে আনেওনি ঋজুদা।

বন্দুকের গুলি দু-ব্যারেলে দুটো পোরার পর আর চারটে আছে। আমার উইন্ডচিটারের পকেটে রেখেছি সে ক-টাকে। আর থার্টি ও সিক্স রাইফেলের ম্যাগাজিনে ও ব্যারেলের দুটো গুলি বাদ দিয়ে আর আছে তিনটে গুলি। ফোর ফিফটি ফোর হান্ড্রেড রাইফেলটাকে ভুষুন্ডা তাঁবু থেকে নিয়ে গেছিল কিন্তু ঋজুদা ওটা তাঁবুতে রেখে যাবার আগে তার লকটা খুলে নিয়ে নিজের হ্যাভারস্যাকে রেখেছিল। খালি স্টক আর ব্যারেল নিয়ে গেলে তো গুলি ছুড়তে পারবে না। আর সে কারণেই ঋজুদা এখনও বেচে আছে। ভুষুন্ডার হাতে গাদা-বন্দুক না থেকে যদি ওই রাইফেল থাকত তবে গুলি লাগার সঙ্গেসঙ্গে শকেই মরে যেত ঋজুদা।

অন্ধকার হয়ে আসতে-না-আসতেই চাঁদ উঠল। তারা ফুটল। সিংহগুলোর ডাক ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। এখন আর ওরা ডাকছে না, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে এদিকে। সবসুদ্ধু গোটা সাতেক আছে। আরও কাছে আসতে দেখলাম দুটো সিংহ, দুটো সিংহী আর তিনটে বাচ্চা। একেবারে ছোটো বাচ্চা নয়, মাস চারেকের হবে।

গুলি করলে আক্রমণ করতে পারে। তা ছাড়া ওরা বিপদ না ঘটালে গুলি করবই বা কেন? আমি একা। গুলি নেই বেশি। তারপর রাত। তাই রাইফেল না তুলে আমি বড়ো টর্চ দুটো ওদের দিকে ফেললাম। বন্ড-এর টর্চ। পাঁচ ব্যাটারির। খুব সুন্দর আলো হয়। সামনের সিংহী দুটো আলোতে থমকে দাঁড়াল। তারপর টর্চ দুটো নিয়ে আমি নাইরোবি সর্দার যেমন করেছিল গাড়ির বনেটের উপর দাঁড়িয়ে, তেমনি ট্রেলারের উপর দাঁড়িয়ে আলো নিয়ে মশালের মতো কাটাকুটি করতে লাগলাম উপরে-নীচে।

সিংহগুলো কিছুক্ষণ গরর গরর করে ফিরে গেল। আসলে ওরা ব্যাপারটা কী তাইই বোধ হয় দেখতে এসেছিল। কেউ যদি ঘুম ভেঙে উঠে তার বাড়ির উঠোনে একটা মস্ত গাছ হয়েছে দেখতে পায়, তো অবাক হবে না? ওদেরও সেই অবস্থা।

নিজেদের আদিগন্ত ঘাসবনে অদ্ভুত দেখতে এই নতুন চাকা লাগানো জন্তুটা কী তাই বোধ করি ভালো করে দেখতে এসেছিল।

প্যাঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল ঘাস-ইঁদুরের খোঁজে। ঘাসের মধ্যে এদিক-ওদিক সরসর, শিরশির আওয়াজ শুনতে লাগলাম। রাতের প্রাণীরা সব জেগেছে। সাপ, ইঁদুর, নানারকম পোকা, প্যাঁচা, খরগোশ। দূর দিয়ে একদল ওয়ার্ট-হগ মাটিতে ধপ ধপ আওয়াজ করে দৌড়ে চলে গেল। চাঁদের আলো পরিষ্কার হলে দেখা গেল আমাদের সামনে অনেক দূরে মস্ত একটা ওয়াইল্ড-বিস্টের দল চরে বেড়াচ্ছে।

বসে থাকতে থাকতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ে থাকব। আচমকা ঘুম ভাঙতে, ঘড়িতে দেখি বারোটা বাজে। তার মানে বেশ ভালোই ঘুমিয়েছিলাম, রাইফেল-বন্দুক পাশে রেখে। ভুষুন্ডার লোকেরা এতদূরে পায়ে হেঁটে আমাদের কাছে আসতে পারবে না, কিন্তু জন্তুজানোয়ার আসতে পারত। ঘুমোনো খুব অন্যায় হয়েছে। শিশির পড়েছে খুব। হলুদ ঘাসের সাভানা-সমুদ্রকে কুয়াশায় চাঁদের আলোয় শিশিরে মিলেমিশে মাঝ-রাতে কেমন নীলচে-নীলচে দেখাচ্ছে।

আমি ঋজুদার কপালে হাত দিলাম। জ্বর ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কাল যদি আমরা রাস্তায় পৌঁছোতে না পারি বা কোনো একটা উপায় না হয়, তাহলে ঋজুদাকে এখানেই রেখে যেতে হবে। ঋজুদাকে রেখে গেলেও আমি যে যেতে পারব, তারও কোনো স্থিরতা নেই। এই প্রসন্ন অথচ নিষ্ঠুর, তেরো হাজার বর্গমাইল ঘাসের মরুভূমিতে জলের অভাবে খাবারের অভাবে তিল তিল করে শুকিয়ে মরে যাব। ভুষুন্ডা। ভুষুন্ডাই এর জন্যে দায়ী। ওক্কে, ভুষুন্ডা! দেখা হবে!

আমি ট্রেলার থেকে নেমে আবার একটু আগুন করলাম। ঠান্ডায় আমার নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। কান দুটো আর নাকটা ঠান্ডায় এমন হয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে কেউ বুঝি কেটেই নিয়ে গেছে।

আবার কফি বানিয়ে দুটো বিস্কুট গুঁড়ো করে, তাতে ব্র্যান্ডি ঢেলে ঋজুদাকে জাগিয়ে তুললাম।

ঋজুদা বলল, 'কে? গদাধর? ভালো আছিস? চিঠি যা এসেছে, আমাকে দে।'

আমি চমকে উঠলাম। ঋজুদা ভুল বকছে নাকি? কলকাতায় তার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাট যে দেখাশোনা করে, সেই বহুদিনের বিশ্বস্ত পুরোনো লোক গদাধর। যার জন্যে আমরা বনবিবির বনে গেছিলাম, সে।

আমি বললাম, 'ঋজুদা! আমি! আমি রুদ্র।'

'ও। রুদ্র। সেই গানটা শোনাবি একটু।'

'কোন গান ঋজুদা?'

'সেই গানটা রে। ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, তুই বড়ো ভালো গাস গানটা।'

আমি বললাম, 'এইটা খেয়ে নাও ঋজুদা। অনেক ঘণ্টা হয়ে গেছে আগের বার খাওয়ার পরে।'

ঋজুদা প্রতিবাদ না করে খেল। তারপর আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'রুদ্র, তুই আমাকে এখানে ফেলে রেখে যাস না রে। মরেও যদি যাই, তাহলেও দেশে কিন্তু নিয়ে যাস আমাকে। আমাকে কবর দিতে বলিস আমাদের দেশের কোনো সুন্দর জঙ্গলে, আমারই প্রিয় কোনো জায়গায়। তুই তো সবই জানিস।'

আমি বললাম, 'ঃআ ঋজুদা! পাইপ খাও। খাবে?'

ঋজুদা মাথা নাড়ল। বলল, 'না, ঘুমোব।'

আমি আর একটা ঘুমের বড়ি দিলাম ঋজুদাকে। কম্বল ভালো করে গুঁজে দিলাম গলায়, ঘাড়ে। নাড়াতে গিয়ে দেখি, ফুলে শক্ত হয়ে গেছে পা-টা। আমার ঘুম-টুম সব উবে গেল। জল চড়ানোই ছিল, তাই কফি খেলাম একটু। গা-টা গরম হল।

তারপর অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম রাইফেল কাঁধে গাড়ির চারদিকে। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, এখন এনার্জি নষ্ট করা ঠিক নয়। কী যে লেখা আছে কপালে ভগবানই জানেন। হয়তো এনার্জির শেষ বিন্দুটুকুও প্রয়োজন হবে ভীষণভাবে।

ঋজুদার পাশে গিয়ে ট্রেলারে বসলাম। চারধারে নীলচে চাঁদের স্বপ্ন স্বপ্ন আলো হলুদ ঘাসবনে ছড়িয়ে আছে। বসার আগে চারধার ভালো করে দেখে নিলাম। নাঃ, কিছুই নেই কোথাও।

নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দুঃস্বপ্নের মধ্যে জেগে উঠলাম। আঁ-আ-আ-আ করে এক সাংঘাতিক চিৎকারে। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি আমার প্রায় গায়ের উপরে ক-টা বিদঘুটে জানোয়ার বসে আছে আর ঋজুদার পা কামড়ে ধরেছে আর একটা। আর ট্রেলারের তিন পাশে কম করে আরও আট-দশটা জানোয়ার দাঁত বের করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার সংবিৎ ফিরতেই বন্দুকটা তুলে নিয়ে, ব্যারেল দিয়ে, যে জানোয়ারটা ঋজুদার পা কামড়ে ধরেছে তাকে ঠেলা মারলাম-পাছে গুলি করলে গুলি ঋজুদারই গায়ে লাগে। ঠেলা মারতেই সে মাথা তুলল-সঙ্গেসঙ্গে তার মাথার সঙ্গে প্রায় ব্যারেল ঠেকিয়ে গুলি করে দিলাম। হায়নাটা টাল সামলাতে না পেরে পিছন দিকে উলটে ট্রেলারের বাইরে পড়ে গেল। গুলির শব্দে আমার কাছেই যে হায়নাটা ছিল, সে চমকে গিয়ে লাফ মারল নীচে। তাকেও গুলি করলাম অন্য ব্যারেলের গুলি দিয়ে। সে-ও পড়ে গেল। কিন্তু কী সাংঘাতিক এই আফ্রিকান হায়নাগুলো, প্রায় বুনো

কুকুরেরই মতো, চারধার থেকে লাফিয়ে ট্রেলারে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল একের পর এক।

বন্দুকের দু-ব্যারেলেই গুলি শেষ। এবার আমি থার্টি ও সিক্স রাইফেলটা তুলে নিয়ে ট্রেলারের উপর উঠে দাঁড়ালাম, যাতে তিন দিকেই ভালো করে দেখা যায়। ওরা না গেলে ঋজুদার পায়ের দিকে যেতে পারছি না। হায়নার চোয়ালের মতো শক্ত চোয়াল কম জানোয়ারের আছে। হাঙরের মতো তারা হাড় কেটে নিতে পারে কামড়ে। ঋজুদার গোড়ালির একটু উপরে কামড়ে ছিল হায়নাটা।

হায়নাগুলো লাফাচ্ছে আর ট্রেলারে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধাক্কা মারছে ট্রেলারে। ট্রেলারটা কেঁপে উঠছে বারবার।

প্রথমে কয়েকবার গুলি বাঁচাবার জন্যে আমি ব্যারেল দিয়েই বাড়ি মারলাম ওদের মুখে মাথায়। কিন্তু সামলানো যাচ্ছে না। ওরা ক্রমাগত লাফাচ্ছে। ঋজুদার পায়ের রক্তের গন্ধ পেয়ে এসেছে ওরা। একটাকে ঠেকাই তো আর একটা উঠে পড়ে। যখন কিছুতেই ঠেকাতে পারছি না, তখন বাধ্য হয়ে গুলি করতে লাগলাম। থার্টি ও সিক্স-এর বোল্ট খুলি, আর গুলি করি। দেখতে দেখতে ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেল। আমার মাথায় খুন চেপে গেছিল। মানুষের সহ্যশক্তির একটা সীমা থাকে। সেই সীমা এরা পার করিয়ে দিয়েছিল। তখনও আরও দুটো হায়না আস্ত ছিল, তাদের বিক্রম তখনও কমেনি। মৃত সঙ্গীদের শরীরের উপর দিয়ে লাফিয়ে উঠতে কী মনে করে, তারা থেমে গিয়ে টাটকা রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের সঙ্গীদেরই খেতে শুরু করল। ট্রেলারের চারধারে অনেকগুলো মরা হায়না, হাঁ করে পড়ে আছে। সে-দৃশ্য দেখা যায় না, ওদের গায়ের দুর্গন্ধে ওখানে টেকাও অসম্ভব। আমি এক লাফে ট্রেলার থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করে গাড়িটাকে আধ মাইলটাক দূরে নিয়ে গেলাম। তারপর দৌড়ে নেমে গেলাম ঋজুদার কাছে।

ঋজুদা, আশ্চর্য, পাইপ খাচ্ছিল।

আমি যেতেই বলল, 'কানের কাছে যা কালীপুজোর আওয়াজ করলি, তাতে তো ওয়েস্টার্ন ছবির হিরোরাও শুনলে লজ্জা পেত।'

ঋজুদা কথা বলছে দেখে খুব খুশি হয়ে আমি বললাম, 'ধ্যুত।' তারপরই বললাম, 'কতখানি কামড়েছে?'

ঋজুদা বলল, 'মার্কুরিয়োক্রোম আর ডেটল লাগা। ব্যাটা মাংসই খুবলাতে গেছিল। ভাগ্যিস চেঁচিয়েছিলাম। বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। তুই না উঠলে আমাকে জ্যান্তই খেত।'

আমি বললাম, 'দেখি পা-টা দাও।'

ঋজুদা বলল, 'একে কম্বল, তারপরে ফ্লানেলের ট্রাউজার, তার নীচে মোজা; ব্যাটা সুবিধা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। টর্চ দিয়ে দেখ তো রুদ্র।'

আমি টর্চ দিয়ে দেখে ওষুধ আর ডেটল লাগিয়ে বললাম, 'কলকাতায় ফিরে তোমার ডান পায়ের জন্যে একটা পুজো দিয়ো।'

ঋজুদা হাসল। তারপর আমাকে শুধোল, 'গুলি কতগুলো আছে?'

বললাম, 'রাইফেলের গুলি তিনটে, বন্দুকের দুটো।'

'হুঁ। আমার ডান পকেট থেকে পিস্তলটা বের কর তো। এ যাত্রায় আমার দ্বারা তোর আর কোনো সাহায্যই হবে না। পারলে আমি তো নিজেই গুলি করতে পারতাম হায়নাটাকে। আমি পারলাম না। পারি না...'

বলেই থেমে গেল।

আমার ভীষণ কষ্ট হল।

পিস্তলটা লোডেড ছিল। আটটা গুলি আছে এতে। কোমরের বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নিলাম আমি। যে ক-টা গুলি ছিল, বন্দুক এবং রাইফেলে লোড করে সেফটি ঠিক করে রাখলাম।

বললাম, 'দেখো, আমি কিন্তু আর একটুও ঘুমোব না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও এবারে সকাল অবধি।'

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, 'তুই তো কম ক্লান্ত নোস। ছেলেমানুষ।'

বলেই বলল, 'সরি, উ আর নট। আই অ্যাপলোজাইজ।'

আমি হাসলাম। কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'ঘুমোও ঋজুদা।'

ভোর হল। বনে-জঙ্গলে ভোর মানেই দ্বিধা আর অনিশ্চয়তার অবসান।

আমি তাড়াতাড়ি ঋজুদার জন্যে শুধু একটু কফি করে দিলাম। খাবার সব শেষ।

ঋজুদা আমার দিকে একবার তাকাল কফির কাপটা হাতে নিয়ে। হ্যাভারস্যাকে হেলান দিয়ে উঠে বসতে গেল, কিন্তু পারল না। দেখলাম জ্বরটা আবার বেড়েছে। প্রায় বেহুশ।

আমিও একটু কফি খেয়ে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করে, কম্পাস দেখে, বেয়ারিং ঠিক করে নিয়ে চললাম গাড়ি চালিয়ে। কোথায় যাচ্ছি জানি না, এই চলার শেষে কী আছে তাও জানি না। জানি না, বড়ো রাস্তায় গিয়ে পড়তে পারব কি না। কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে, আজকের মধ্যেও যদি ঋজুদাকে হাসপাতালে নেওয়া না যায়, তাহলে বাঁচানোই যাবে না আর।

সকাল সাড়ে-আটটা নাগাদ চোঁ চোঁ আওয়াজ করে গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল। তেল শেষ হল বোধ হয়। মিটার সেই কথাই বলছে। গাড়ি থামিয়ে ট্রেলারে গেলাম।

জেরিক্যান ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি জেরিক্যানের তলাটা ফুটো। কবে ফুটো হয়েছে, কেমন করে হয়েছে তা এখন জানার উপায় নেই। ভুষুন্ডা ইচ্ছে করেই প্যাক করার সময় হয়তো খালি টিন ভরেছিল।

এখন আর কিছু করার নেই। গাড়ি আর চলবে না। ট্রেলারের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। জেরিক্যানটা নামিয়ে দেখি একটা খুব বড়ো আগামা গিরগিটি দৌড়ে গেল পায়ের সামনে দিয়ে। এই গিরগিটিগুলো দারুণ দেখতে। নীল শরীর, লাল গলা, আর মাথাটাও খুব সুন্দর। টেডি আমাকে চিনিয়েছিল।

গাড়িটা থেমে থাকায় ঋজুদা বলল, 'কী হল রুদ্র?'

আমি বললাম, 'তেল শেষ হয়ে গেল ঋজুদা।'

'ঃও।' ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, 'তোমাকে একা রেখে আমি একটু দেখে আসব? দূরে যেন মনে হচ্ছে গোরু চরছে।'

ঋজুদা বলল, 'বাইনোকুলার দিয়ে ভালো করে দেখ।'

বাইনোকুলার দিয়ে দেখে মনে হল, গোরুই। আফ্রিকাতে তো নীল গাই নেই। দূর থেকে ভুলও হতে পারে। হয়তো কোনো হরিণ এখানকার বা বুনো মোষ। এখানের গোরুদের রং লাল ও কালো। গায়ে লোমও অনেক।

ঋজুদা বলল, 'সাবধানে যাবি। আমার জন্যে চিন্তা করিস না। জলের বোতলটা সঙ্গে নিয়ে যা।'

আমি কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে ঋজুদাকে দিয়েদিলাম। বললাম, 'একা থাকবে, সঙ্গে রাখো।'

ঋজুদা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নিল।

কপালে হাত দিয়ে বললাম, 'এখন কেমন আছ?'

ঋজুদা হাসল কষ্ট করে। তারপর বলল, 'ফাইন।'

ফাইনই বটে, ভাবলাম আমি। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে, জলের বোতলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

হাঁটছি তো হাঁটছিই, যতই হাঁটছি ততই যেন গোরুগুলো দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। আশ্চর্য। তা ছাড়া গোরুদের কাছে কোনো রাখাল দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। গোরুগুলো সত্যিই গোরু না গুগুনোগুম্বার, বা ওগরিকাওয়া বিবিকাওয়া, তা বোঝা গেল না। সেই নির্জন, নিস্তব্ধ, হু-হু হাওয়া, ঘাসবনে ভরদুপুরেও মনে নানান আজগুবি চিন্তা আসে। নিজেকে এত অসহায় লাগতে লাগল ঋজুদার কথা ভেবে যে, বলার নয়। বারোটা বাজে। আমাদের ল্যান্ড-রোভার আর ট্রেলার দেখাই যাচ্ছে না অনেকক্ষণ হল। সঙ্গে যদিও কম্পাস এনেছি তবু দিক

হারাবার ভয় করছে। এ যে সমুদ্র। বেরিয়েছিলাম পৌনে ন-টায়, সোয়া তিন ঘণ্টা ক্রমাগত হেঁটেও গোরুদের কাছে পৌঁছোনো গেল না, কাউকে দেখাও গেল না। আশ্চর্য।

আমার গা ছমছম করতে লাগল। পিছু ফিরলাম আমি।

ক্লান্ত লাগছিল। তিন দিন হল বিশেষ কিছুই খাইনি। ঘুমও প্রায় নেই। শরীরে যেন জোর পাচ্ছি না আর। সবচেয়ে বড়ো কথা, মনটাও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছে। তাহলে কি আমাকে আর ঋজুদাকে এইখানেই শকুন, শেয়াল আর হায়নার খাবার হয়ে থেকে যেতে হবে? পরে যদি কেউ এদিকে আসে তাহলে হয়তো আমাদের গাড়ি ল্যান্ড-রোভার আর কঙ্কাল দেখতে পেয়ে, গাড়ির কাগজপত্র নেড়েচেড়ে আমাদের কথা জানতে পারে! অবশ্য যদি হাতি কি গণ্ডার কি বুনোমোষে ওগুলো অক্ষত রাখে।

আরও ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর দূর থেকে ট্রেলারসুদ্ধু ল্যান্ড-রোভারটাকে একটা ছোট্ট পোকার মতো মনে হচ্ছিল। আরও এগোবার পর দেখতে পেলাম কতগুলো পাখি গাড়িটার কাছে উড়ছে। ছোটো ছোটো কালো পাখি।

আমি এবার বেশ জোরে যেতে লাগলাম। আরও ঘণ্টা খানেক লাগবে পৌঁছোতে। পাখিগুলো আস্তে আস্তে বড়ো হতে লাগল। আরও কিছুদূর যাওয়ার পরই বুঝতে পারলাম সেগুলো শকুন।

শকুন? কী করছে অতগুলো শকুন ঋজুদার কাছে? ঋজুদা কি...?

আমি যত জোরে পারি দৌড়োতে লাগলাম। রাইফেলটা হাতে নিয়ে আর একটু এগিয়েই আমি রাইফেলটা উপরে তুলে একটা গুলি করলাম। ভাবলাম, শব্দে যদি উড়ে পালায়।

টেডি বলেছিল, যদি জীবন্ত কোনো লোককে শকুন তিন দিকে ঘিরে থাকে, তবে সে মারা যায়। আমাকে আর ঋজুদাকে শকুনরা দু-দিন আগে চার দিকে ঘিরেছিল।

শকুনগুলো উপরে উঠে ঘুরতে লাগল। অনেকগুলো। তারপরই আবার নেমে এল নীচে। আর একটু এগিয়েই আবার গুলি করলাম। কিন্তু এবারেও চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল না একটাও।

কাছে গিয়ে দেখি, গাড়ির ছাদে শকুন, ট্রেলারের উপর চার-পাঁচটা শকুন এবং ট্রেলারের তিন পাশে অন্তত দশ-বারোটা বিরাট বড়ো বড়ো তীক্ষ্ণ ঠোঁটে আর বিশ্রী গলার শকুন।

ওরা যেন ঝুঁকে পড়ে সকলে মিলে ঋজুদার নাড়ি দেখছে। নাড়ি থেমে গেলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে ঋজুদার উপর।

আমার গায়ে কাঁটা দিল। শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। আর সহ্য করতে না পেরে মাটিতে বসা একটা বড়ো শকুনের দিকে রাইফেল তুললাম। গুলিটা শকুনটাকে ছিটকে ফেলল কিছুটা দূরে। আমি দৌড়ে গিয়ে ওটাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলাম। গাড়ি তো আর চলবে না। গাড়ির কাছে মরে পড়ে থাকলে আমাদেরই মুশকিল।

সঙ্গীর হাল এবং আমার রণমূর্তি দেখে বোধ হয় একটু ভয় পেল ওরা। উড়ে গিয়ে সব জমায়েত হল মৃত সঙ্গীর কাছে।

কানের এত কাছে রাইফেলের আওয়াজেও উঠল না ঋজুদা। আমি দৌড়ে গিয়ে ডাকলাম, 'ঋজুদা, ঋজুদা।'

ঋজুদা কথা বলল না কোনো। মুখের উপর চাপা দিয়ে রাখা টুপিটা সরিয়ে দেখলাম, চোখ বন্ধ। একেবারেই অজ্ঞান। গায়ে ভীষণ জ্বর।

রাইফেলের গুলি আর রইল না। এখন থাকার মধ্যে শটগানের দুটো গুলি মাত্র। প্রয়োজন হলেও ঋজুদাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারব না। আমি সত্যিই জানি না, এবার কী করব। আমার বড়োই ভয় করছে।

এদিকে বেলা পড়ে এসেছে। খিদে-তেষ্টা সবই পেয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুরই হুঁশ নেই যেন।

আমার একার জন্যেই একটু জল গরম করে কফি করলাম, আর কিছুই নেই। কফি খেয়ে, লম্বা রাতের জন্যে তৈরি হতে লাগলাম। ঋজুদার একেবারেই জ্ঞান নেই। কিন্তু নাড়ি আছে। খুব অস্পষ্ট ধুকপুক আওয়াজ হচ্ছে। কিছু খাওয়ানোই গেল না। ব্যাগ থেকে ব্র্যান্ডি-ওষুধটা নিয়ে একটু ঢেলে দিলাম জোর করে দাঁত ফাঁক করে। কিন্তু খেতে পারল না, কষ বেয়ে গড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুছে দিলাম।

অন্ধকার হয়ে এল। তারা ফুটল একে একে। চাঁদও উঠেছে সূর্য যাবার আগেই। আমি বসে আছি ট্রেলারের উপর। ভাবছিলাম রাইফেলের গুলিগুলো শকুনদের উপর নষ্ট করলাম মিছিমিছি। আজ রাতে যদি হায়নারা আসে? অথবা আরও হিংস্র কোনো জানোয়ার?

কাল রাতের কথা মনে হতেই আমার বুক কেঁপে উঠল। আজ আর ঘুমোব না। ঘুমোলে হয়তো ঋজুদাকে টেনে নিয়েই চলে যাবে ওরা। যে করেই হোক আমাকে আজ সারারাত জেগে থাকতে হবে।

রাত এগারোটা বাজল। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলাম, মাথায় টুপি দিয়ে। বড়ো শীত বাইরে, ঋজুদার গায়ে ভালো করে কম্বল মুড়ে দিয়েছি। মাথার উপরে টেডির ওভারকোটের তাঁবুও খাটিয়ে দিয়েছি। রক্তে, ধুলোয়, শিশিরে কম্বলটার অবস্থা যাচ্ছেতাই হয়ে গেছিল। তাই আমার কম্বলটা দিয়েছি আজ।

আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, ঋজুদা আমাদের বাড়ি এসেছে কলকাতায়। মা ঋজুদার জন্যে পাটিসাপটা পিঠে করেছেন, আর কড়াইশুঁটির চপ। মায়ের কী একটা কথায় ঋজুদা খুব হাসছে। মা-ও খুব হাসছেন। আমিও। মায়ের শোবার ঘরের আলোগুলো জ্বলছে। মা সোফাতে বসে, আমি আর ঋজুদা খাটে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেছে ঋজুদা। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ভীষণ ঘুমোচ্ছিলাম আমি। কে যেন আমার ঘুম ভাঙাল গায়ে হাত দিয়ে। তাড়াতাড়ি চমকে উঠে, হাতে-ধরা বন্দুকটা শক্ত করে ধরেই আমি চোখ খুললাম। দেখি, ট্রেলারের তিন পাশে পাঁচ জন সাত ফুট লম্বা মাসাই যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে বল্লম ও কোমরে দা। ওদের বলে মোরান।

আমি ঘোর কাটিয়ে বললাম, 'জাম্বো!'

ওদের মধ্যে এক জন বোধ হয় সোয়াহিলি জানে। সে বলল, 'সিজাম্বো!'

বলেই, সকলেই প্রায় একই সঙ্গে পিচিক পিচিক করে থুতু ফেলল। বর্শার সঙ্গে পা জড়িয়ে অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি ঋজুদাকে দেখিয়ে বাংলায় বললাম, 'এঁকে বাঁচাতে পার ভাই?'

তারপর বোঝবার জন্যে ঋজুদার পা-টা খুলে ওদের দেখলাম। পেটে হাত দিয়ে বললাম খাবারও নেই।

ওরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। আবার পিচিক পিচিক করে থুতু ফেলল।

হঠাৎ আমার মনে হল, নাইরোবি সর্দারের দেওয়া হলুদ গোল পাথরটার কথা। ঋজুদা আমাকেই রাখতে দিয়েছিল সেটা। তাড়াতাড়ি আমি পকেট হাতড়ে সেটা বের করে ওদের দেখালাম। বললাম, 'নাইরোবি সর্দার দিয়েছে। নাইরোবি। নাইরোবি।' দু-বার বললাম।

ওরা পাথরটা হাতে নিয়ে, ভালো করে দেখে, সকলে একসঙ্গে কীসব বলে উঠল।

দু-জন মাসাই দুটো হাত পাশে ঝুলিয়ে রেখেই সোজা উপরে লাফিয়ে উঠল তিন-চার ফুট। তারপর হাতের মধ্যে থুতু ফেলে দু-হাতে থুতু ঘষে আমার মুখটা দু-হাতে ধরল। বোধ হয় আদর করে দিল।

প্রথম দিন নাইরোবি সর্দার এমন করাতে আমার বড়ো ঘেন্না হয়েছিল। ওডিকোলোন ঢেলে শুয়েছিলাম। আজ এই রাতে কিন্তু বড়ো ভালো লাগল। বড়ো ভালোমানুষ ওরা, ভারি সহজ, সরল।

দেখতে দেখতে দুটো বল্লমের মধ্যে একজনের লাল কম্বল কায়দা করে বেঁধে একটা স্ট্রেচার-মতো করে ফেলল ওরা। তারপর ঋজুদাকে তার উপর শুইয়ে, কম্বল দিয়ে ঢেকে, দু-জনে কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে ইঙ্গিতে বলল, চলো।

ঋজুদার পিস্তলটা একজন আমার হাতে দিল। আমি কোমরে রাখলাম সেটা। বন্দুকটা হাতে নিলাম।

ওরা শনশন করে হাঁটতে লাগল।

ভিজে চাঁদের আলোর মধ্যে সেই ধু-ধু ঘাসের বনে সাত ফুট লম্বা লাল পোশাকের মাসাইদের গুগুনোগুম্বার বা ওগরিকাওয়া বিবিকাওয়া বলে মনে হচ্ছিল আমার।

এরাও কি আমাদের সঙ্গে ভুষুন্ডার মতো বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

যারা ঋজুদাকে বইছিল তারা আগে আগে প্রায় দৌড়ে চলল।

মোরানদের মধ্যে যে সর্দার গোছের, সে আবার পিচিক করে থুতু ফেলে আমাকে কী যেন দুমদাম বলল। মানে বুঝলাম না।

যুদ্ধ করলেই আহত হয় কেউ কেউ। ওরা যোদ্ধার জাত। জড়িবুটি, তুকতাক এবং বনজ ভেষজ দিয়ে আহতর চিকিৎসা ওরা নিশ্চিয়ই জানে। জানে কি না আমি জানি না। এই মুহূর্তে আমি জানি যে, আমি ভীষণ খুশি। এত কিছুর পরে, এত ঘটনার পরে, এই মন খারাপ-করা নির্জনতার মধ্যে মানুষের মুখ দেখে।

হাড়গোড় আর পাথরের গয়নাপরা, লাল-হলুদ রঙে মুখে-কপালে আঁকিবুঁকি কাটা, টাটকা-রক্ত-খাওয়া কতগুলো স্বাধীন সাহসী, বড়ো মনের মানুষদের পিছনে পিছনে ছোট্ট শহুরে মনের ছোট্ট ভীরু আমি ছোটো ছোটো পা ফেলে চলতে লাগলাম।

দূর থেকে ওদের ড্রামের শব্দের মতো গুম গুম করে সিংহ ডেকে উঠল। বারবার ডাকতে লাগল। আর একটা বড়ো প্যাঁচা আমাদের মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে, উড়ে উড়ে, সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। ডাকতে লাগল, কিঁচি কিঁচি কিঁচর...

গুগুনোগুম্বারের দেশের দু-জন দৈত্যের মতো মানুষের কাঁধের উপর আমার ঋজুদার ঠান্ডা, নিথর শরীরটা কাঁপতে কাঁপতে, দুলতে দুলতে যেন সেই নীলচে চাঁদের আলোয় ভেসে উড়ে চলল এই আদিম আফ্রিকার কুয়াশা-ঘেরা রহস্যময় দিগন্তের দিকে।

1st Blurb

বুদ্ধদেব গুহ শিকারের গল্প লেখেন। তাঁর লেখায় অরণ্যের অন্তরঙ্গ ছবি আঁকা হয়, অনুপম ভাষাশৈলীতে। বনের ছবি শুধু নয়, তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও করেন তিনি। বনের গাছপালা, ভূপ্রকৃতি, মানুষজন এমনকী বন্যপ্রাণী সম্পর্কেও তাঁর গভীর দরদ ফুটে ওঠে রচনার ছত্রে ছত্রে। ঋজুদা হয়ে ওঠে বাঙালি কিশোর পাঠকদের প্রিয় চরিত্র। ভটকাইকে চেনে না এমন গল্প-পড়ুয়া বাংলায় কমই আছে। ঋজুদা দেশের বিভিন্ন অরণ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন; শুধু দেশের কেন বিদেশেরও।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির অনুরোধে ঋজুদা গিয়েছিল সেরেঙ্গেটির বন আর গোরোং গোরো আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে চোরাশিকারিদের দৌরাত্মের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করার উদ্দেশ্যে। এক গভীর চক্রান্তে সেই দিগন্ত বিস্তারী ঘাসবনে তারা পথ হারাল। তারা কি রক্ষা পেল, নাকি সেই চক্রান্তের শিকার হয়ে গেল?

ঋজুদার গল্প ছাড়াও আরও অনেক ধরনের অনেক গল্প গাঁথা রইল এই সংকলনের দু-মলাটের মধ্যে, যা পড়তে বসে কিশোর পাঠকেরা তাদের জরুরি কাজও ভুলবে।

2nd Blurb

বুদ্ধদেব গুহ জন্ম জুন ১৯৩৮, কলকাতায়। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যাট, গুণী সংগীত শিল্পী, চিত্রকলাতে তাঁর নৈপুণ্য প্রশংসনীয় এবং সফল সাহিত্যকার। বুদ্ধদেব অরণ্যভিত্তিক কাহিনি রচনা করেন নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, ফলে পটভূমি ও চরিত্রনির্মাণে তাঁকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না। তাঁর রচনায় বনবাসী মানুষ এমনকী জন্তুজানোয়ারের প্রতি গভীর দরদ ফুটে ওঠে। কর্মসূত্রে অথবা ভ্রমণের আকর্ষণে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরেছেন, দেখেছেন ইংল্যান্ড-সহ ইউরোপের প্রায় সকল দেশ। কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, থাইল্যান্ড ও পূর্ব আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্রও। সাহিত্যরচনার জন্য পেয়েছেন বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার-সহ নানা পুরস্কার। ছোটোদের জন্য তাঁর প্রথম বই 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে', তারপরে লিখেছেন 'বনবিবির বনে', 'নিনিকুমারীর বাঘ', 'ল্যাংড়া পাহান', 'রু-আহা', 'অ্যালবিনো', 'টাঁড় বাঘোয়া' ইত্যাদি।

Table of Contents

Title Page	2
Copyright Page	3
সূচি	4
প্রকাশকের কথা	6
সম্পাদকের কথা	7
গল্প	10
ঋজুদার সঙ্গে অচানক মার-এ	11
ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গিবনে	37
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলমহলে	83
ঋজুদার সঙ্গে সিমলিপালে	98
ডিমেংকারি	108
লাওয়ালঙের বাঘ	125
করণপুরার টাঁড়	135
সাধের গাডোয়াল	140
গিদাইয়া	153
অশান্ডিমারুর দূত	159
যব খলিল খাঁ ফাকতা উড়াতে থে	165
ম্যাথস	170
আমি	188
উপন্যাস	196
গুগুনোগুম্বারের দেশে	197